

A satellite dish and a satellite in space. The satellite has solar panels and a central body with various instruments.

ইসলাম ও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি



মুফতী জিয়াউর রহমান ফারুকী

প্রত্যেকটি সচেতন মুসলিমের বইটি পড়া উচিত

ইসলাম ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি

মূল:

মুফতি জিয়াউর রহমান ফারুকী

অনুবাদ ও সংযোজন:

মাহমুদ আযহার

প্রকাশনায়

অভিনন্দন প্রকাশনী

বাংলাবাজার, ঢাকা।

ইসলাম ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি

মূল:

মুফতি জিয়াউর রহমান ফারুকী

অনুবাদ ও সংযোজন:

মাহমুদ আযহার

প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী-২০১৬

সত্ত্ব: সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

অভিনন্দন প্রকাশনী

বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্য: ২৩০.০০

দুটি কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালায়। সালাত ও সালাম প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এর উপর বর্ষিত হোক। সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরদিনের। আল্লাহ তায়ালা দেখবেন কে সত্যের পথে থাকে আর কে মিথ্যার আধারে হারিয়ে যায়। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে কে কে এগিয়ে আসে আর কে মিথ্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ইবলিস তার মিশনে অতি তৎপর। ছলে, বলে-কৌশলে মানুষের মগজে কুবুদ্ধি এটে দিয়ে সরে পড়ে। এর মাশুল দিতে হয় সহজ সরল সত্যের অনুসারীদেরকে। সত্যের আওয়াজ চিরবুলন্দ। তবুও কেন যেন মিথ্যার অপতৎপরতা সত্যের অনুসারীদের জন্য বাধা বাধা মনে হয়। তবে তা অচীরেই নিশেষ হয়ে যাবে। বাকি রবে একমাত্র আল্লাহর ধীন 'ইসলাম'।

তাগুতের তৎপরতা দেখলে বড় অবাক হতে হয়। তবে আশ্চর্য লাগে তাদের অলসতা ও অসচতেনতা দেখে, যারা বলে আমরা সত্যের অনুসারী। অথচ তাদের পূর্বসূরীরা ছিল সদা জাগ্রত। শক্তি, সাহস, সম্মান ও গৌরবের অধিকারী। সত্যের অনুসারী চিরবিজয়ী এই মুসলিম জাতিকে সর্বহারা করার নেপথ্যে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, এ বইয়ে তার কিছুটা ধারণা পাবেন বলে বিশ্বাস, পাঠকের প্রতি। ধারণা পাবেন, কিছু মুসলিম রাষ্ট্রে পর্দার আড়ালের থাকা সংস্থাগুলোর সামর্থ ও তৎপরতা। কিন্তু মুসলিম দেশের তুলনায় আজ-আহ-তাগুত ও কুফুরের দৌরাত্ম আকাশচুম্বী। মুসলিমদের শক্তিশারা করার সবপথ তারা অনুশীলন করেছে, একং করেছে। লক্ষ্য করুন, 'এক অমুসলিম নেতার বক্তব্য'-

“ইসলাম জীবন ঘনিষ্ঠ ধর্ম। স্বভাবজাত ও বাস্তবতার ধর্ম। এর সৌন্দর্য জনসাধারণ জেনে ফেললে অথবা এর প্রকৃত ধারকবাহক পর্যন্ত তারা পৌঁছে গেলে আমাদের সর্বনাশ হবে। তারা হারানো কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও সম্মান ফিরে পাবে। আমাদের সাম্রাজ্যবাদী লালসার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। ইসলামের 'ন্যায়পরায়নতা' যদি প্রকাশ পায় তবে আমাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, দস্যুবৃত্তি, মিথ্যাচার, অনাচার ও অন্যায় ভোগবিলাসের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। অতীতের নমুনা যদি তারা একবার জাগাতে পারে তবে দুনিয়া তাদের পায়ে পড়ে চূষ্মন করবে। আমাদেরকে লাথি মেরে খেদাবে।”

দেখুন, বুঝে শুনে সে কিভাবে ইবলিসের দায়িত্ব পালন করছে! মুসলিম দেশে গোয়েন্দা প্রেরণের সময় আরো বলেন, “সাবধান! কর্তব্যে অবহেলা করবে না। মনে রাখবে, তোমাদের সফলতার উপর জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করছে। তাই তোমরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে।”

“মুসলমানদের দুর্বল জায়গাগুলো খুঁজে বের করবে। ঐ পথে আমরা তাদের দেহে প্রবেশ করব এবং তাদের জোড়াগুলো বিচ্ছিন্ন করে দিব। মূলত শত্রুকে পরাজিত করার এটাই পথ।”

এ ছিল ব্রিটিশ কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুসলিম দেশে প্রেরিত এক ইংরেজ গোয়েন্দার প্রতি অফিসারের নির্দেশ। এখন তো আরো সহজ হয়ে গেছে। হুমকি, প্রলোভন ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্য থেকেই এজেন্ট বানিয়ে তাদের কাজ হাসিল করে। ধ্বংস হোক সেসব ব্যক্তি যারা মুসলিম নাম ধারণ করে ইসলাম ও মুসলিম জাতির ক্ষতিসাধনের চেষ্টায় লিপ্ত।

সর্বশেষ ইসলামী খেলাফত ধ্বংসের ষড়যন্ত্র নিয়ে বরং ইসলামী শক্তিকে নির্জিব করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সারাংশ নিম্নে তুলে ধরা হলঃ- যে কর্মসূচী নিয়ে গোয়েন্দারা ছদ্মবেশে বা এজেন্টের মাধ্যমে কাজিত লক্ষ্যে পৌছতে অবিরাম চেষ্টা চালায়। কর্মসূচীর মধ্যে মুসলিম জাতিকে মৌলিকভাবে শিক্ষা, শক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে দুর্বল করে রাখার বিষয়কে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

শিক্ষাঃ

- ইংরেজী শিক্ষার উপর বৃত্তি, উপবৃত্তি, উপহার, নোবেল পুরস্কার ইত্যাদি প্রদান করে ইসলামী শিক্ষার এমনকি মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বাস্তব সম্যক শিক্ষাকেও গুরুত্বহীন করে তোলা।
- অনৈসলামিক শিক্ষাকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে মুসলিম সমাজে বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা।
- মুসলিম সমাজে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিতে পশ্চিমা ধ্যানধারণা লোকের অনুপ্রবেশ ঘটানো।
- ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রকাশনা ও বিদ্বানদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অবশেষে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

(আশ্চর্য হল, ওরা মুসলিমদের সম্পদ অন্যায় ও জোর পূর্বক লুণ্ঠন করে মুসলিম সমাজে বিনা মূল্যের প্রতিষ্ঠান চালু করে। দাতব্য চিকিৎসালয়, সেবা সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে বড় বদান্যতার পরিচয় দেয়!(!) মুসলিম সমাজও তাদেরকে সম্মানের নজরে দেখতে থাকে। অথচ সে লক্ষ্য করে না, মুসলিম দেশগুলো থেকে যে পরিমান সম্পদ ওরা লুণ্ঠন করেছে তার এক শতাংশও এটা নয়।)

শক্তিঃ

- নেতৃত্ব শূন্য করা।
- সামরিকভাবে মুসলিম সৈন্যদলকে দুর্বল করার জন্য ইংরেজ সেনাদের অলৌকিক ক্ষমতার প্রচার করা।
- সামান্য মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে আপষের মাঝে বিরোধের বীজ বপন করা।
- ইসলাম পরকালীন ধর্ম। রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে এর কোন আগ্রহ নাই বলে প্রচার করা।
- ভাষা, বর্ণ ও অঞ্চলভেদে মুসলিম শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করা। কখনোই এক হতে না দেয়া। যতটুকু শক্তি আছে তা নিজেদের মাঝে ব্যয় করার জন্য পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বি বানিয়ে দেয়া, যাতে আমাদের প্রতি চোখ তুলে তাকানোর সুযোগটাও না পায়।
- শক্তি অর্জন, ক্ষমতা দখল, জিহাদ, ক্বিতাল এসব কোন ভালকাজ নয়। বরং এটা 'সন্ত্রাস' বলে প্রচার করে মুসলমানদেরকে পার্থিব প্রতিষ্ঠা থেকে সম্পূর্ণ নিরুৎসাহিত করা। এক কথায় আল্লাহর যমিনে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব পালন থেকে বান্দাকে দূরে রাখার শয়তানী ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন করা। (অথচ একজন সাধারণ ব্যক্তিও এটা বুঝে যে, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে স্বজাতিকে রক্ষা করার জন্য লড়াইয়ে লিপ্ত স্বাধীনতাকামী সাধারণ মুসলিমদেরকে 'সন্ত্রাসী' বলা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বৈ কিছুই নয়।)

অর্থঃ

- পার্থিব জীবনের কাজ কর্ম থেকে বিমুখ এবং দুনিয়া সম্পর্কে অসচেতন করার লক্ষ্যে যত পস্থা আছে তা অবলম্বন করা।

স্বাস্থ্যঃ

- মেডিক্যাল জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। সুস্থতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার দয়ার উপর নির্ভরশীল। এ চমৎকার কথার আড়ালে মুসলিমদেরকে চিকিৎসা বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য জ্ঞান ও পরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে রাখা।

সংস্কৃতিঃ

- মুসলমানদের অবদান, কীর্তি, আবিষ্কার ও গবেষণাকে চাপা দিয়ে অমুসলিমদের আবিষ্কারকে বড় করে প্রচার করে মুসলিম শিশুদের মস্তিষ্কে পরনির্ভরশীল করে তোলা।
- মুসলিম মনীষীদের সম্পর্কে নোংরা কল্প-কাহিনী রটিয়ে এই জাতিটিকে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধশূন্য করা এবং চরম হীনমন্যতায় লিপ্ত করা।
- মিডিয়াকে ব্যবহার করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধকে ধাপে ধাপে নিশ্চিহ্ন করা।
- অশ্রীতা, বেহায়াপনা ও ব্যাভিচারের বিস্তার ঘটাতে হবে। সেহেতু জুয়া, বিলাসিতা ও খেলাধুলায় যুবকদেরকে বেতন, ভাতা, উপটোকন ও পুরস্কার দিয়ে চরমভাবে উৎসাহিত করতে হবে।
- যুবকদের হাতে মাদক সহজলভ্য করতে হবে।
- নারী অধিকারের নামে নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে আনতে হবে।

এছাড়াও নানাহ এজেন্ডা রয়েছে তাদের। যা বাস্তবায়ন করার জন্য অগণিত অর্থ, লোকবল, সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করে। আহ, আমরা সত্যের জন্য কী করছি?

আমার এ ক্ষুদ্র চেষ্টা ইসলাম ও মুসলিম জাতির কল্যাণে ব্যবহৃত হোক। হে আল্লাহ! তুমি আমার এ ক্ষুদ্র কাজকে একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে নাও। ঘুমন্তকে জাগ্রত হওয়ার তাওফীক দাও। আমাদেরকে তোমার দ্বীনের জন্য ব্যবহার কর। আমীন। যে আমীন বলবে তাকেও। হুম্মা আমীন।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
-------	--------

প্রথম পর্ব

গোয়েন্দা/গুপ্তচর বা গুপ্তচরবৃত্তি.....	১১
গোয়েন্দাবৃত্তি (SECREC Y).....	১৬
সূচনা ইতিহাস.....	১৬
ইসলামে গুপ্তচরবৃত্তি.....	১৮
এক নজরে ইন্টেলিজেন্স ও আন্তর্জাতিক গোপন এজেন্সিসমূহ.....	২০
গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তালিকা.....	২৩
জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা.....	৪৫
গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা.....	৪৭
Cold war বা ম্লায়ুযুদ্ধ.....	৪৯
কৃত্রিম উপগ্রহ ও গোপন নজরদারি পদ্ধতি.....	৫৬
অত্যাধুনিক গোয়েন্দা প্রযুক্তি.....	৫৭
অত্যাধুনিক গোয়েন্দা প্রযুক্তি স্টেলথ টেকনোলজি.....	৫৮
আকাশ থেকে নজরদারি.....	৫৮
স্যাটেলাইট.....	৫৯
স্যাটেলাইটের ইতিহাস.....	৬০
স্যাটেলাইটের প্রকারভেদ.....	৬১
মহাকাশে স্যাটেলাইটের সংখ্যা.....	৬২
ড্রোন.....	৬৩
ডেটা ইনফরমেশন.....	৬৪
নজরদারি ক্যামেরা.....	৬৫
চ্যানেল ও কম্পিউটার.....	৬৬
হ্যাকিং.....	৬৬
ভ্রমণ টিকেট.....	৬৭

অর্থ স্থানান্তর.....	৬৭
গোয়েন্দাগীরীর কর্মবিন্যাস ও সংগঠনিক পদ্ধতি	৬৭
গোয়েন্দাগিরির পরিভাষা.....	৭৮
আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাসংস্থা ফ্রিম্যাসন	৮২
ফ্রিম্যাসনবাদ ও ইয়াহুদী	৮৪
ফ্রিম্যাসনবাদের স্তর সমূহ.....	৮৫
হিন্দুী অব ওয়ার্ল্ড	৮৬
রোটারী ক্লাব.....	৮৭
রোটারী আন্দোলন সূচনা	৮৮
রোটারী ইন্টারন্যাশনাল	৯০
ম্যাসুনী-ইহুদী সম্ভ্রাসী গোষ্ঠী.....	৯০
গ্লাডো.....	৯৩
মোসাদ, ইসরাইল	৯৬
মোসাদের সদস্য হওয়ার শর্তাবলী.....	৯৭
সদস্য হওয়ার পরে দীক্ষা.....	৯৮
প্রতিষ্ঠা.....	৯৯
ইসরাইল প্রতিষ্ঠা	৯৯
মোসাদ ব্যতীত অন্যান্য গোপন সংগঠন	১০০
(Shin Beth) শিনবেথ, ইসরাইল.....	১০০
মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স, ইসরাইল.....	১০০
গেস্টা পো, হিটলারের শাসনামলে জার্মানির গোয়েন্দা সংস্থা	১০২
এন.এস.এ, যুক্তরাষ্ট্র	১০৮
এফ.বি.আই, যুক্তরাষ্ট্র	১০৯
এফ. বি. আই-এর হেডকোয়ার্টার	১১২
এফ.বি.আই.এর গুরুত্বপূর্ণ বিভাগসমূহ.....	১১৩
উদ্দেশ্য :.....	১১৪
সি.আই.এ, যুক্তরাষ্ট্র	১১৫
সি.আই.এ প্রতিষ্ঠা পটভূমি	১১৬
সদস্য ও ব্যয়ের হিসাব	১২০
গোয়েন্দা সংখ্যা ও বাজেট.....	১২০
সি.আই.এর কর্মকাণ্ড ও মালিকানাধীন সম্পত্তি	১২১

কর্মতৎপরতা.....	১২১
এফ.এস.বি, রাশিয়া.....	১২৪
কে.জি.বি, রাশিয়া.....	১২৫
এম.এস.এস, চীন.....	১২৯
আই.এস.আই, পাকিস্তান.....	১৩১
সি.আই.....	১৩৪
আইএস. আই কেন?.....	১৩৫
‘র’, ভারত.....	১৪৩
ভারতের ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম.....	১৪৫
রিসার্চ এণ্ড এনালাইসিস উইথ ‘র’.....	১৪৭
‘র’ এর কর্মপদ্ধতি (MODUS OPERANDI).....	১৪৮
ভারত ও ‘র’এর মূলনীতি এবং পলিসি.....	১৫২
চাণক্যের কূটিলতা.....	১৫২
চাণক্যের মূলনীতির উপর আমল.....	১৫৩
এসআইএস বা এমআইসিক্স, যুক্তরাজ্য.....	১৫৬
এম.আই.সিক্স ও এনথ্রাক্স এর প্রস্তুতি.....	১৫৯
ব্লাক ওয়াটার.....	১৫৯
পাকিস্তানের ব্লাক ওয়াটার.....	১৬২
ডাইরেকশন জেনারেল ডি লা সিক্রেতে এক্সটেরিয়র, ফ্রান্স.....	১৬৯
বি এন ডি, জার্মানি.....	১৭০
ডি.জি.এফ.আই, বাংলাদেশ.....	১৭১
এন.এস.আই, বাংলাদেশ.....	১৭৩
গোয়েন্দা নজরদারীতে আপনি.....	১৭৭
আই.আর.ও. আই.আই.এম, ইরান.....	১৭৯

দ্বিতীয় পর্ব

শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি:.....	১৮১
গোয়েন্দা বৃত্তির নাজায়েয দিক.....	১৮১
গোয়েন্দাবৃত্তির জায়েয দিক.....	১৮৩
ইসলামী মূলনীতির আলোকে গোয়েন্দাবৃত্তি সওয়াব অর্জনের মাধ্যম.....	১৮৪
ইন্টেলিজেন্স-এর ইসলামী কাঠামো.....	১৮৭
হজরত হাতেব ইবনে আবী বালতা’আ এর ঘটনা.....	১৮৯

তদন্তের আদেশ.....	১৯০
একটি ফিক্‌হী মাসআলা	১৯২
মুসলমান কাফেরদের সহযোগী হিসাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করতে পারে?	১৯৩
গুপ্তচরের বিধান	১৯৪
গোয়েন্দাফোবিয়া বা গোয়েন্দাভীতি রোগ	১৯৯
তথ্যপঞ্জী	২০৭

প্রথম পর্ব

গোয়েন্দা-গুপ্তচর, গুপ্তচরবৃত্তি

গুপ্তচর: সাংবাদিক, রহস্যবিদ, তত্ত্ববিশ্লেষক।

গুপ্তচরবৃত্তি: সাংবাদিকতা, রহস্য উদ্‌ঘাটন করা, এক দেশের সরকারী গোপন তথ্য অন্যদেশের সরকারকে অবগত করা। গোপনে তথ্য সংগ্রহ করা, দৃষ্টির আড়ালে থেকে সংবাদ আহরণ করা।

গুপ্তচরবৃত্তি একটি বিজ্ঞান। স্নায়ু নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা। বুদ্ধির খেলা 'দাবা'। যার একটি গুটি চালনার পূর্বে খেলোয়াড়কে হাজারবার চিন্তা করতে হয়। সর্বোত্তম গোয়েন্দা সে যে শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় কাজ সম্পাদন করে। যার কোন ক্ষুদ্র কাজও এ কথা প্রমাণ করতে পারে না যে, সে অসতর্ক।

এই খেলায় খেলোয়াড়কে কখনও না দেখে গুটি চালাতে হয়। যদি চাল সঠিক হয় তবে তো ভালো। আর যদি ভুল হয় তবে জানবাজি রাখাও লাগতে পারে। সামান্য ভুলেও এতে অসামান্য মাশুল দিতে হয়।

এই খেলায় অংশগ্রহণকারী কোন এক সাথীর ভুল সকলকে ডুবিয়ে মারতে পারে। তাই এতে ভুল করার কোন অবকাশ নেই।

মোটকথা, গোয়েন্দা হল-কৌতুহলী, অনুসন্ধিৎসু, রহস্য উদ্‌ঘাটনকারী, যে ভেদ খুঁজে বের করে, গোপন খবর তালাশ করে, যে ভিতরগত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়। আরবীতে বলে جاسوس جاسوس।

ইসলামী পরিভাষায় ফুকাহায়ে কেলাম গোয়েন্দা বা গোয়েন্দাগীরির কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেননি। অর্থ স্পষ্ট হওয়াতে তার কোন প্রয়োজনও নেই।

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, تجسس হল- কোন ব্যক্তি যা গোপন রাখতে চায় তা তালাশ করা। গুপ্তচরকে বলে جاسوس। আবার তাকে عين ও বলে। অর্থাৎ চক্ষু, গুপ্তচর সর্বক্ষণ তথ্য সংগ্রহের আশায় দৃষ্টি দিয়ে থাকে বিধায় যেন তা সমস্ত শরীর চক্ষুতে পরিনত হয়েছে।

গোয়েন্দা হচ্ছে একজন পেশাদার অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি কোন পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য অথবা নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত গুপ্তচর হতে পারেন। সাম্প্রতিককালে গোয়েন্দাকে ব্যক্তিগত গোয়েন্দা বা ব্যক্তির আপতঃদৃষ্টি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক আইনে গোয়েন্দার সংজ্ঞা এরূপ, যে গোপনে অথবা ছদ্মবেশে শত্রুদেশের তথ্য সংগ্রহের জন্য কাজ করে যাতে শত্রুর গতিবিধি, যুদ্ধপরিস্থিতি, সামরিক সক্ষমতা ও তৎপরতা জানিয়ে নিজ দেশকে সহায়তা করতে পারে। তথ্য সংগ্রহ করা কখনও স্বশরীরে হয়, আবার কখনও যুদ্ধের সময় দূরে থেকে। কখনও গোপনে যেমন, মানবাধিকার কর্মী, ত্রাণ কর্মী, সেচ্ছাসেবক, দাতব্য বা সেবা সংস্থার কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, এনজিও কর্মী, ধর্মপ্রচারক ইত্যাদির ছদ্মবেশে। এরা অধিকাংশ সময় কোন না কোন গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করে, যদিও বাহ্যিকভাবে পরিচয় থাকে ভিন্ন। আর এটাই অধিকাংশ গোয়েন্দা বা এজেন্টের পরিচয়। আর কখনো প্রকাশ্যে, যেমন, সংবাদিক, কলামিস্ট, টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি।

গোয়েন্দার প্রধান কাজই হচ্ছে, কোন গুরুতরভাবে লুকায়িত অপরাধ বা অমিমাংসিত ঐতিহাসিক অপরাধের ঘটনাপ্রবাহ তদন্ত স্বার্থে তুনমূল পর্যায়ে থেকে সংগ্রহ করে সংবাদের পিছনের সংবাদ জনসম্মুখে তুলে ধরা। এছাড়া গোয়েন্দা হিসাবে একজন ব্যক্তি 'ডিটেকটিভ' হিসাবেও সকলের কাছে পরিচিতি পেয়ে থাকেন।

বৈশিষ্ট্যাবলী

সাধারণ অর্থে যিনি গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন, তিনি গোয়েন্দা নামে পরিচিত। সাধারণত: একজন সফল ও স্বার্থক গোয়েন্দাকে নিম্ন বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয়।

- অপরাধও রহস্যজনক কর্মকাণ্ড মনো:বিশ্লেষনের মাধ্যমে প্রমাণ করবেন।
- রহস্যমূলক কর্মকাণ্ডে সর্বক্ষণ সম্পৃক্ত থেকে তীক্ষ্ণ ও শানিত মেধা প্রয়োগ করবেন।
- উপস্থিত বিচার-বুদ্ধি যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে কাজিত ব্যক্তি বা বস্তুকে জনসম্মুখে উপস্থাপন করবেন।
- নির্দোষ ব্যক্তি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত বা দোষী না হন এবং প্রকৃত দোষীকে আইনে সোপর্দ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- অপরাধী বা ঘটনার ছোট্ট কু, সংকেত বা চিহ্নের সাহায্যে অপরাধের গতি প্রকৃতি ও অবস্থান চিহ্নিত করবেন।

প্রেক্ষাপট

কিছু কিছু পুলিশ অধিদপ্তরে গোয়েন্দা পদে সরাসরি লোক নিয়োগ দেয়া হয় না। গোয়েন্দাকে ঐ পদে নিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট কিছু শর্তাবলী পূরণ করতে হয়। তন্মধ্যে লিখিত পরীক্ষা একটি অন্যতম মানদণ্ড। পুলিশ কর্মকর্তাকে এ যোগ্যতা অর্জনের মধ্যমেই কেবল গোয়েন্দা পদে নিয়োগ করা হয়।

ব্রিটিশ আইন অনুসারে পুলিশ গোয়েন্দাকে কমপক্ষে দু'বছর পোশাকধারী বা উর্দি পরিহিত কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরী করতে হয়। এর ফলে তিনি অপরাধী তদন্ত অধিদপ্তর যোগদানের জন্য আবেদন করার যোগ্যতা অর্জন করেন। গোয়েন্দা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য যুক্তরাজ্যের পুলিশ বাহিনীতে চাকুরীর পাশাপাশি অপরাধ তদন্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে জাতীয় তদন্ত পরীক্ষায় অবশ্যই কৃতকার্য হতে হয়।

অনেক পুলিশ অধিদপ্তরে গোয়েন্দা হিসেবে স্নাতক উত্তীর্ণ সাধারণ শিক্ষার্থীদেরকে পোষাকবিহীন অবস্থায় সরাসরি নিয়োগ দেয়া হয়। অনেকের মতে, গোয়েন্দাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। গোয়েন্দাদের মাঝে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের গুনাবলী, সক্ষমতা, যোগ্যতার অধিকারী হতে হয় যা পোষাক বা উর্দিধারী পুলিশ কর্মকর্তা থেকে পৃথক।

গোয়েন্দাকে তার অবস্থান ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। তার মধ্যে তদন্ত কাজে নীতিবোধ, চর্চা এবং প্রক্রিয়া রয়েছে। সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, অপরাধ আইন ও প্রক্রিয়া, প্রচলিত আইনে গ্রেফতার, অনুসন্ধান ও মালামাল জব্দ, ওয়ারেন্ট ও প্রমাণ, পুলিশ বিভাগে রক্ষিত নথিপত্র ও প্রতিবেদন সম্পর্কে ধারণা। আদালতে প্রমাণ বা সাক্ষ্য হিসাবে পুলিশ বিভাগের নীতিমালা, চর্চা ও উদ্দেশ্য এবং পুলিশ বিভাগের পদ্ধতি ও স্বাক্ষর অন্যতম। সাধারণত উভয় ক্ষেত্রেই পুলিশ কর্মকর্তা ও গোয়েন্দাকে প্রশ্নমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু গোয়েন্দাকে আরো বেশী প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি ও মোকাবেলা করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়।

বেসরকারী পর্যায়ে গোয়েন্দা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিবন্ধনের মাধ্যমে অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু এর জন্যে তাকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং অপরাধীর অতীত ইতিহাস সম্পর্কেও সম্যক অবগত হতে হয়। কয়েকটি রাজ্যে শ্রেনীকক্ষে প্রশিক্ষণ, সঠিকভাবে ও দক্ষতার সাথে অস্ত্র পরিচালনা সহ অভিজ্ঞতার প্রয়োজনকে গুরুত্ব প্রদান করে।

সংস্থা

প্রশিক্ষিত ও গোয়েন্দাদেরকে একত্র করে গঠিত গোয়েন্দা শাখা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে সামরিক বাহিনী কিংবা পুলিশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা, অভ্যন্তরীণ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষায় এ শাখার গুরুত্ব অপরিসীম। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্যান্য দল কিংবা বিভাগের তুলনায় সবচেয়ে বড় ও মর্যাদা সম্পন্ন শাখা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে গোয়েন্দা শাখা।

লুকায়িত অমিমাংসিত বা গোপনীয় অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে গোয়েন্দা শাখাকে বিশেষায়িত করে অনেকগুলো স্তরে বিভাজন করা হয়। সেগুলো হল, নরহত্যা, দস্যুতা, বা ডাকাতি, সংগঠিত অপরাধ, নিখোঁজ, প্রতারণা, মাদকদ্রব্য, যৌন হয়রানী, কম্পিউটার অপরাধ, অভ্যন্তরীণ, সহিংসতা, নজরদারী ইত্যাদি।

পরিচয়

একজন ব্যক্তি যখন গোয়েন্দা হিসাবে কর্মরত থাকেন তখন তিনি একটি আইডেন্টি কার্ড সঙ্গে রাখেন। প্রয়োজনে কেউ তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রশ্নবিদ্ধ করলে নিজ পরিচয় প্রদান করেন। সাধারণত: গোয়েন্দা বা ডিটেকটিভ পদবীধারী ব্যক্তির নামের পূর্বে ডিটেকটিভ যা সংক্ষেপে ডিট det নামে পরিচিতি পায়।

কার্যধারা

মাঠপর্যায়ে

গোয়েন্দা কার্য পরিচালনার জন্য একজন গোয়েন্দাকে বিভিন্ন ধরনের ব্যাপক ও বিস্তৃত চিন্তাধারার অধিকারী হতে হয়। নিত্য নতুন কলা কৌশল-ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় তাকে। এ ছাড়াও অধিকাংশ মামলা কার্য সম্পূর্ণকরনের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর তদন্তকার্য পরিচালনার পাশাপাশি যদি গোয়েন্দা কার্যক্রমে চরদের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা হয়। তাহলে অতি দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি করা সম্ভবপর। চরগন ব্যক্তির সাথে তাদের মধ্যকার কতাবার্তা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিনি তা কোথাও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন না।

পরবর্তীতে গোয়েন্দারা পর্যাপ্ত প্রমাণ সংগ্রহ এবং তথ্য সংরক্ষণের উপরই সম্ভাব্য ব্যক্তি বা ইঙ্গিত বস্তুর অবস্থান নিশ্চিত করেন।

ফৌজদারী তদন্তের কার্যকলাপগুলো খতিয়ে দেখতে বা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে পুলিশ। ফৌজদারী তদন্তে দ্রুতবেগে গাড়ী চালানো,

চৌর্যবৃত্তি, হত্যাকাণ্ড, জালিয়াতি, প্রতারণা ইত্যাদি বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত। যখন পুলিশ তদন্ত কার্যের সমাপনী ঘোষণা করেন তখন তারা কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন।

কোন কারনে ফৌজদারী তদন্তে একজন গোয়েন্দার মনে যদি সন্দেহজনক কোন কিছুর উদ্বেক হয় তাহলে তিনি স্বাক্ষর প্রমানাদি সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এর মাধ্যমেই তিনি আদালতের সম্মুখে পর্যাপ্ত স্বাক্ষর প্রমানাদি উপস্থাপন করেন।

ময়না তদন্ত

সাধারণত মৃতদেহের শারীরিক বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য জানার জন্য ময়না তদন্তের প্রয়োজন পড়ে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায়ই ময়না তদন্তের ব্যবস্থা রয়েছে। ময়না তদন্তের মাধ্যমেও একটি মামলা সুচারুরূপে নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব যা গোয়েন্দাদের কার্যক্রম এবং তদন্তের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ও হাতিয়ার হিসেবে গন্য করা হয়।

আইন অনুযায়ী ফরেনসিক বিজ্ঞান। এমন একটি পদ্ধতি যা বিস্তারিত ও বিজ্ঞান সম্মত ভাবে যে কোন ব্যক্তির প্রশ্নের ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করা সম্ভব হয়ে থাকে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে অপরাধ অথবা দেওয়ানী মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভবপর।

অতীত ইতিহাস

অনেক ক্ষেত্রে গোয়েন্দারা সরকারী এবং ব্যক্তিগত নথিপত্র ঘেটে অপরাধ বা রহস্য সম্পর্কীয় বিষয়কে পটভূমিকায় নিয়ে ও তথ্য সংযোগ করে অগ্রসর হন। পুলিশ বাহিনীর গোয়েন্দারা শুধু নথিপত্র কিংবা ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা আঙ্গুলের ছাপের সাহায্যে অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করে থাকেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ গুরুতর অপরাধী থেকে শুরু করে সামান্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্যও ব্যক্তিগত নথি খুলে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

এর ফলে, গোয়েন্দারা অপরাধীর গ্রেফতারী সংক্রান্ত বিবরণ, ব্যক্তিগত তথ্যাবলী, ছবি ইত্যাদির সাহায্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তির গতিবিধি অনুসন্ধান সহ গতিবিধি নজরদারী করতে পারেন। এছাড়াও যদি অপরাধীরা মোটর সাইকেলের মালিক হন তাহলে ড্রাইভিং লাইসেন্সের তথ্যাবলীও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ওয়ারেন্ট সাথে নিয়ে পুলিশের গোয়েন্দারা ক্রেডিট কার্ডের রেকর্ড এবং ব্যাপক বিবৃতির মতো বিষয়গুলোও অনুসন্ধান করে থাকেন। হোটেলের নিবন্ধন তথ্য, ক্রেডিট প্রতিবেদন, আনসার মেশিনের বার্তা এবং ফোনের কথোপকথনও এর অন্তর্ভুক্ত।

অবদান

দেশ বা জাতির স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে গোয়েন্দা বা গোয়েন্দা দল প্রয়োজনে জীবনবাজী রেখে নিজ রাষ্ট্রের নিদর্শনা ও সহায়তায় অন্য দেশে অবস্থান করেন যা আইনের পরিভাষায় গোয়েন্দাগিরি বা গুপ্তচরবৃত্তি নামে পরিচিত।

আধুনিক বিশ্বের গোয়েন্দা তৎপরতার উপরই একটি দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্বার্থ লুকিয়ে রয়েছে। কখনো তারা সাফল্য পান এবং নিজ রাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় তথ্য কিংবা উপকরণ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রেরণ করে দেশের স্বার্থ রক্ষা করে থাকেন। আবার ব্যর্থতায় তাদের জীবনবাজী ঘটে অথবা সময় সময় গোয়েন্দাগিরীর অভিযোগে দু'দেশের মধ্যকার পারস্পরিক চমৎকার ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট হতে দেখা যায়। সৌভাগ্যবশত দেশগুলোর পারস্পারিক বন্দী বিনিময় চুক্তির আওতায় কদাচিৎ কেউ কেউ মুক্তি লাভ করেন। গোয়েন্দা দক্ষ করে তুলতে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে কিংবা প্রশিক্ষণের জন্য উন্নত দেশে প্রেরণ করা হয়। অপরাধী সনাক্তকরনে তারা বহুবিধ নিত্যনতুন কৌশল ও পন্থা গ্রহণ করেন।

গোয়েন্দাবৃত্তি (SECRECY)

যুদ্ধ কিংবা স্বাভাবিক অবস্থায় গুপ্তচরবৃত্তির উপকার ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ব্যক্তিগতভাবে মানুষের স্বভাব হল অপরের তথ্য জানতে চেষ্টা করা। আশপাশের খবর রাখা। এ কারণেই এক জাতি অন্য জাতির সম্পর্কে অবগত থাকে। আজও জনসাধারণের উপর নজরদারী ও শত্রুদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত থাকার জন্য প্রত্যেকটি দেশ গোয়েন্দাগিরি প্রতিষ্ঠান দাড় করায়।

সূচনা ইতিহাস

মানব সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে গোয়েন্দাবৃত্তি চলমান। মানুষের স্বভাবের ভিতর আল্লাহর পক্ষ থেকে অপরের সম্পর্কে জানার আগ্রহ দিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করে সকল সৃষ্টিকে তার খেদমতে নিয়োজিত করেছেন। অন্য সকল বস্তুর উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন। মানুষ এই কর্তৃত্ব বল পেয়ে একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। অন্যের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে যুদ্ধের।

যুদ্ধে জয়লাভের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল-অস্ত্র ও তা ব্যবহার পদ্ধতি জানা। উপযুক্ত সময়ে অস্ত্র ব্যবহারের কমাও দেয়া। আর এটা পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভব না। তেমনিভাবে শত্রু সম্পর্কে অবগতি লাভ না করে কার্যকরী পরিকল্পনাও গ্রহণ করা অসম্ভব।

আর এজন্যই প্রয়োজন শত্রু সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করা। শত্রুর সংখ্যা, সামর্থ্য, শক্তি, অস্ত্র, অবস্থান, গতিবিধি ইত্যাদি জানার পরেই তবে কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব। তখনই বিজয় নিশ্চিত হয়। এজন্য বলা হয় শত্রুদের তথ্য সংগ্রহ যুদ্ধে বিজয়ের পূর্বশর্ত।

এ কারণে যুগে যুগে সচেতন দল বা গোষ্ঠি, ব্যক্তি বা সমাজ, দেশ ও জাতি-সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রতিপক্ষের গোপন তথ্য আহরণের জন্য চর নিযুক্ত করেছেন।

দুনিয়াতে এমন কোন প্রাক সভ্যতা বিগত হইনি যেখানে কোন না কোন পদ্ধতিতে গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত ছিল না। দুনিয়ার ইতিহাসে এমন কোন বাদশাহ যায়নি যে গোয়েন্দাগিরির দ্বারা উপকার লাভ করেনি। বরং এ কথাই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, রোমের প্রাক সভ্যতা, মিসরের ফেরআউনদের পুরাতন ইতিহাস, মেসোপটেমিয়া-এশকোরাজ হোক বা ক্রসেড যুদ্ধের যুগ হোক, কিংবা গীর্জার রাজত্ব। মুসলমানদের উন্নতি অধিপতনের প্রত্যেকটি স্থানে গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান তৎপর দেখা যায়।

পৃথিবীর যে ভূখণ্ডে আমরা বসবাস করি এখানের সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত গোয়েন্দা বিষয়ক 'দুই'টি আদর্শিক প্রতিষ্ঠান (school of thought) পরিলক্ষিত হয়:

১. চীনের সুন সু (Suntzu) এর দর্শন।

২. ২৩০০ বছর পূর্বে লিখিত কোটিল্য ওরফে চানক্য এর অর্থশাস্ত্র (রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক গ্রন্থ, রাষ্ট্রশাসন-শত্রুদমন-রাজস্ব-দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন-পৌর প্রশাসন প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত। অর্থনীতি বিষয়েও আলোচনা আছে)।

অর্থশাস্ত্র আজ থেকে ২৩০০ বছর পূর্বে কোটিল্য এর লিখিত ডকুমেন্টারী যা মূলত রাজার দিকনির্দেশনার জন্য লিখেছিল। ১৫০ অধ্যায় সম্বলিত এই ঐতিহাসিক ডকুমেন্টারীতে সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষকে ধ্বংস ও কাবু করা, শত্রুকে পরাজিত করা, শত্রুরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নস্যাৎ করা, রোগ ব্যাধির বিস্তার, বিষপান করানো, প্রতারণা, ধ্বংসযজ্ঞ ও সন্ত্রাসবাদের পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সে যুগের ক্ষমতাসীনকে বলা হয়েছে-অনিয়ম, দুর্নীতি, অসভ্যতা, বর্বরতা, অমানবিক কাজ ব্যতীত রাজত্ব টিকবে না। বরং এর আতংক ও ভয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোও প্রভাবিত থাকবে এবং তারা তোমার রাষ্ট্রকে শুষ্ক আদায় করতে বাধ্য হবে।

কোটিল্য ওরফে চানক্য এ সকল অমানবিক কার্যক্রমকে বাদশাহর জন্য বৈধ ও অত্যাবশ্যিক বলে সাব্যস্ত করেছে। চীনের সমর বিশারদ সুন সু (suntzu) খৃষ্টপূর্ব ৫১০ তে রণকৌশল বিষয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আর্ট অব ওয়ার পিগফা (Art of

war pingfa) রচনা করে। এরপর কোটিল্য এর লিখিত গ্রন্থ অর্থশাস্ত্রকে এ বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পুরাতন হিন্দু সভ্যতার বই কাদাম্বার (Qadambeer) লেখক বানা (Bana) অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে লিখেছে: অর্থশাস্ত্র এমন রাজনীতি শিক্ষা দেয়, যার ভিত্তি অত্যাচার ও নির্মমতার উপর। যে সরকারী আমলাদেরকে শুধু প্রতারণাই শিক্ষা দেয়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসের মত গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাসও পুরানো। পৃথিবীতে যখনই বিভিন্ন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে তখনই গুপ্তচরবৃত্তির প্রয়োজন ও গুরুত্ব বেড়ে গেছে। প্রতিটি রাষ্ট্রই শত্রুর পরিকল্পনা সম্পর্কে সতর্ক থাকার লক্ষ্যে গুপ্তচরবৃত্তির সহযোগীতা নেয়া শুরু করেছে। আগের যুগে গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যম শুধু মানুষই ছিল। পরবর্তীতে যখন বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় বিভিন্ন প্রযুক্তি আবিষ্কার হতে শুরু হল তখন গুপ্তচরবৃত্তির যন্ত্রও আবিষ্কার হয়েছে এবং ইনফরমেশন টেকনোলজির নানান শাখার উদ্ভব হয়েছে।

ইসলামে গুপ্তচরবৃত্তি

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে একটি উদ্দেশ্যে নিয়ে সৃষ্টি করেছেন। “তিনি সকল উদ্দেশ্যে থেকেও পবিত্র”। তবে এটা সম্পূর্ণই মানুষের স্বার্থে। মানুষ তাকে চিনবে, মানবে, পুরস্কার লাভ করবে। তাই জীবন ব্যবস্থা স্বরূপ ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলামের উপর চলা সহজ করতে যুগে যুগে নবী-রাসূল ও কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তারা ছড়িয়েছেন সত্যের আলো, গুনিয়েছেন সফলতার পয়গাম, প্রতিষ্ঠা করেছেন শান্তির সমাজ। কিন্তু মিথ্যা, অন্ধকার আর বাতিল-শয়তানের অনুকরণে বাধা হিসেবে দাড়িয়েছে। প্রতিরোধ করতে-করতে হয়েছে কিতাল। লড়াই। মহাসত্যের যুদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَكَايْنٍ مِنْ بَنِي قَائِلَ مَعَهُ رِبُّونَ كَثِيرٌ

আল্লাহর পথে অনেক নবী এবং সাধকরা যুদ্ধ করেছেন...

তেমনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদ ^{পাশাখান আল্লাহর রাসূল ও মহাসাধক} এর ক্ষেত্রেও একই দৃশ্য। আল্লাহ তায়ালা তাকে নবুওয়াতী দিয়েছেন। কিতাব দিয়েছেন। ইসলামকে সব মতবাদের উপর বিজয় করতে আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু শয়তান ও তার চেলারা বসে থাকেনি। বাধার পাহাড় এনে সামনে হাজির করেছে। কুরাইশ, ইয়াহুদী ও তখনকার পরাশক্তিগুলো নবীজীকে শাস্ত ও স্বাভাবিকপন্থায় হকের দাওয়াত দিতে দেয়নি। তার উম্মতকেও দিবে না। আল্লাহ তায়ালা

এরশাদ করেন-

وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

তারা তো সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদেরকে ধীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়।

একত্ববাদের দাওয়াতই ছিল তাদের চোখের শূল। ষড়যন্ত্র করে তাকে তার দাওয়াতকে, তার অনুসারীদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে। তাই তো তাদের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হয়েছে, ষড়যন্ত্রের মূল চাবিকাঠি ‘শক্তি’ ভেঙ্গে দিতে হয়েছে। শক্তির মূল উৎস ‘সম্পদ’ আহরনের মাধ্যম ‘বাণিজ্য’কে বাধাগ্রস্ত করতে হয়েছে। ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্নভিন্ন করতে হয়েছে। আল্লার পক্ষে থেকে কিতালের আদেশ এসেছে, এখনও চলছে, কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

মুহাম্মাদ ^{পাঠায়াত্} বিশ্বনবী-আবার সেনাপতি, সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি। যুদ্ধের প্রস্তুতি ও কৌশল স্বরূপ তার বিচক্ষণতা ছিল অতুলনীয়। তার প্রতিটি কাজ ও কথা এর প্রজ্জ্বল সাক্ষী।

আসুন, আমরা শত্রু সম্পর্কে অবগতি লাভের ক্ষেত্রে নবীজীর কিছু মোবারক পদক্ষেপ লক্ষ্য করি-

নবীজী এর এক ঐশি বুদ্ধির প্রমাণ বদরের দিন হযরত আলী, যুবায়ের ইবনে আওয়াম, সা’দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. কে বদরের দিকে পাঠিয়েছেন খবর সংগ্রহ করতে। তারা দুইজন গোলামকে ধরে নিয়ে আসেন। নবীজী তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কাদের? তার বলল, আমরা কুরাইশদের রাখাল। পানির খোঁজে এসেছি। জিজ্ঞেস করলেন, তারা সংখ্যায় কত? তারা অস্পষ্ট জবাব দিল, ‘অনেক বেশী’। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, দিনে কয়টি উট যবেহ করা হয়? তারা বলল, কোন দিন নয়টি, কোনদিন দশটি। নবীজী বললেন, তাদের সংখ্যা ৯০০ থেকে ১০০০ মাঝে।

কখনও তিনি সাহাবাদেরকে প্রেরণ করেছেন শত্রুর অবস্থা জেনে আসার জন্য। হজরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, নবীজী বদরের দিন ১০ জন সাহাবীকে শত্রুদের তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছেন। বুখারী, মুসনাদে আহমদ।

হযরত আব্বাস রা. মক্কা থেকে কুরাইশদের সকল তথ্য নবীজীর কাছে প্রেরণ করতেন। তাই তো তিনি যখন হিজরতের আকাংখা ব্যক্ত করলেন, তখন রসূল ^{পাঠায়াত্} এরশাদ করলেন, “তোমার মক্কা অবস্থান করা সকলের জন্য কল্যাণকর”।

যখন হাওয়াজেন ও সাকীফ গোত্র মদীনাতে আক্রমণ করতে ইচ্ছা করল, নবীজী তখন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী হাদরাদ আল আসলামী র. কে তাদের

কাছে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। (সীরাতে ইবনে হিসাম ১)

খন্দক যুদ্ধে হযরত নুআঈম ইবনে মাসউদ রা. কে শত্রুদের মাঝে ফাটল ধরনের জন্য পাঠিয়েছেন। সে এক আশ্চর্য ঘটনা। দ্বিতীয় পর্বে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম রা. কে তাদের খবর সংগ্রহ করার জন্য পাঠান।

শত্রু দল সম্পর্কে যেমন রসূল ^{পাদশাহ আলহাজ্ব ইসলামাবাদী} তথ্য সংগ্রহ করতেন তেমনি নিজের সামরিক সংকল্পও গোপন রাখতেন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, নবীজী সে যুদ্ধেই গেছেন সেখানে ‘তাওরিয়া’ করেছেন। ‘তাওরিয়া’ অর্থ তার গতিবিধি দেখে গুপ্তচর কিংবা নিজের সাথীরাও বুঝতে পারতেন না তিনি এবার ঠিক কোথায় আক্রমণ করবেন।

শুধু যুদ্ধের সময়ই তিনি ^{পাদশাহ আলহাজ্ব ইসলামাবাদী} শত্রুদের খবর নিতেন এমন নয়। বরং স্বাভাবিক অবস্থায়ও তিনি শত্রুদের অবস্থার প্রতি নজর রাখতেন। উহুদ যুদ্ধের পরক্ষণেই হযরত আলী রা. কে শত্রুদের প্রতি প্রেরণ করেন। দেখতে বলেন, তাদের অবস্থা কি? (সীরাতে ইবনে হিসাম ১)

এভাবে খলীফাতুর রসূল হযরত আবু বকর রা., হযরত উমার রা. এবং অন্যান্য খলীফা ও শাসকরা গোয়েন্দা বিভাগকে যথেষ্ট তৎপর রেখেছিলেন।

আলী বিন সুফয়ানের কথা কে না জানে! সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর বিজয় সিরিজে আলী বিন সুফয়ানের গোয়েন্দা কার্যক্রমই মৌলিক অবদান রেখেছে বলে সকলের কাছে প্রতীয়মান। যখনই এ বিভাগটি বেখবর হয়ে গেছে তখন থেকেই মুসলিম সেনাবাহিনী পরাজয়ের গ্লানি আশ্বাদন করেছে।

এক নজরে ইন্টেলিজেন্স ও আন্তর্জাতিক গোপন এজেন্সিসমূহ

ইতিহাস স্বাক্ষী, ইন্টেলিজেন্স-সাহসী, দেশপ্রেমিক, স্বীয় উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আগ্রহী ব্যক্তিদের পেশা। জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের স্বার্থে এর একেকজন সদস্য যারপর নাই ভয়ংকর ও কষ্টকর পরিস্থিতি মাথা পেতে সয়ে নেয়। সারা জীবন সাধনায় থেকে সকল কুটিল ও জটিল অবস্থার সফল মোকাবেলা করতে হয়। কষ্ট সহ্যের এমন পরিস্থিতিতেও তাকে থাকতে হয় অপরিচিত-একাকী। অজানা এক ছায়া, অদৃশ্য এক ভয় সর্বদা তার সাথে চলতে থাকে। কখনও এটা বাস্তবরূপ নিয়ে তার জীবন ধ্বংস করে দেয়। তার কবরের উপর না থাকে কোন চিহ্ন আর না কোন ভাস্কর্য। কিন্তু বাস্তবতা হল এসব লোকের কোরবানী ও আত্মোৎসর্গই জাতীর ভাগ্য বদলে দেয়। তাদের নাম এমন এক অদৃশ্যমান সূচীতে লিপিবদ্ধ হয় যা জাতীয় ভাগ্যাকাশের

তারকা হয়ে জ্বলজ্বল করতে থাকে।

এই শাখার প্রত্যেক কর্মকর্তা এমন মর্দে মুজাহিদ হয়ে থাকে যারা স্বীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে শতভাগ অন্তর্দৃষ্টি রাখে। একজন দক্ষ হস্তশিল্পীর ন্যায় আপন যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মূল্যবান রত্নভাণ্ডারকে চৌকস ও সতর্কতার সাথে ব্যবহার করে ভাজে ভাজে লুকায়িত সব বিপদসঙ্কুল বাস্তবতাকে খুঁজে বের করে। আপন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে কোন প্রলোভনের শিকার হয় না। আবেগ কখনও তাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। পাগলের ন্যায় এক ধ্যান ও ধাক্কাই চলতে থাকে।

তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্ট তৈরী করে ইন্টেলিজেন্স এর কাছে হস্তান্তর করা পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রেই উল্লেখযোগ্য পেশা হিসেবে মনে করা হয়। প্রতিটি রাষ্ট্রেই ছোট হোক অথবা বড়, শক্তিশালী বা দুর্বল-আপন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তারা গোয়েন্দা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং এ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ তৈরী করে। প্রতিরক্ষা, জাতীয় নিরাপত্তা, বহিরাষ্ট্রের গোপন পরিকল্পনা, শক্তি ও প্রযুক্তি সেক্টরের রহস্য ও ভেদ জানা এবং তাদের প্রতি গোপন নজরদারির জন্য এ ধরনের তীক্ষ্ণানুভূতি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা কার্য হাছিল করে। এ জন্য দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় উত্তম থেকে উত্তম হেকমতে আমলী-কর্মকৌশল তৈরী করার কাজে শত্রু ও মিত্রের তৎপর কর্মীদের পরিচিতি জরুরী।

প্রতিটি রাষ্ট্র নিজ দেশের ভেতরগত বিষয়ের ওপর নজরদারী ও বহিরাষ্ট্রের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া অথবা নিজেই গোপন লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা এবং রাজনৈতিক ও সামরিক উদ্দেশ্যে হাছিলের উদ্দেশ্যে গোয়েন্দা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। ছোট রাষ্ট্রগুলোর গোয়েন্দা কার্যক্রম দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বড় রাষ্ট্রগুলো সমগ্র পৃথিবীব্যাপী গোয়েন্দা জাল বিস্তার করে রেখেছে। এর মধ্যে নামকরা ও প্রসিদ্ধ হল, যাদেরকে গোয়েন্দা সশ্রী বলা হয় তারা হল, পাকিস্তানের আই.এস.আই.(I.S.I), আমেরিকান সি.আই.এ (C.I.A), রাশিয়ার কে.জি.বি (K.G.B), ইসরাইলের মোসাদ (MOSAD), ভারতের 'র' (R), ব্রিটেনের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ইত্যাদি। হিটলারের গেস্টাপো সন্ত্রাসবাদের প্রতীক হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সকল যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করে। এমনকি কঠোরতা ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের কোন দিকই বাদ পড়ে না, অথচ তারা দাবী করে আমরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করছি। কঠোরতাকে দাফন করছি, সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন করছি।

বর্তমানে জল, স্থল, আকাশপথ সব খানেই গোয়েন্দা কার্যক্রম চলমান। সামদ্রিক যুদ্ধ জাহাজ, সাবমেরিন ও শত্রুর তৎপরতার ওপর নজর রাখে। এর মধ্যেও

গোয়েন্দাগিরির ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান। এ ছাড়া শূন্য থেকে গোয়েন্দাগিরির জন্য বিমান তৈরী হয়ে গেছে। এরই মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হল বিমান, যা পাইলট ব্যতীত চালিত হয় (ড্রোন)

বর্তমান যুগ ইলেক্ট্রনিক যুদ্ধের যুগ (Electronic war)। এক সময় এফ ১৬ (F16) কে সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিমান মনে করা হত। যাতে মিসাইল স্থাপন করা সহ গোয়েন্দা নজরদারির ব্যবস্থাপনাও ছিল। আমেরিকান গোয়েন্দা বিমানের মধ্যে রয়েছে এফ ১৬ (F.16), আই ইউ এক্স, নিমরড ইত্যাদি।

গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তালিকা

বর্তমান বিশ্বের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর
একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা

অ

অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলীয় গুপ্তবাহী সংস্থার তালিকা

- Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) - অস্ট্রেলীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা
- Australian Secret Intelligence Service (ASIS) - অস্ট্রেলীয় গোপন গোয়েন্দা পরিষেবা
- Defence Intelligence Organisation (DIO) প্রতিরোধ গোয়েন্দা সংস্থা
- Defence Imagery and Geospatial Organisation (DIGO)
- Defence Signals Directorate (DSD) - প্রতিরোধ সংকেত পরিচালকবর্গ
- Office of National Assessments (ONA) জাতীয় নির্ধারণের কার্যালয়

অস্ট্রিয়া

Heeresnachrichtenamt (HNA) - সেন্যবাহিনী গোয়েন্দা কার্যালয়

- Abwehramt (AWA) - সামরিক প্রতিরক্ষামূলক কার্যালয়
- Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) - সংবিধান এবং পাল্টা-সন্ত্রাসবাদের সুরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যালয়
- Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) - সংবিধান এবং পাল্টা-সন্ত্রাসবাদের সুরক্ষার জন্য দেশ কার্যালয়

আ

আফগানিস্তান

- National Directorate of Security (NDS) - জাতীয় নিরাপত্তার পরিচালকবর্গ আলবেনিয়া
- State Intelligence Service (SHISH) - রাষ্ট্র গোয়েন্দা পরিষেবা আলজেরিয়া
- Département du Renseignement et de la Sécurité (DRS) - গোয়েন্দা এবং নিরাপত্তার দপ্তর
- Direction du Contre Espionnage (DCE) - পাল্টা গুপ্তচরবৃত্তির পরিচালকবর্গ
- Centrale de la la sécurité de l'armée - সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা
- Direction centrale de la sécurité extérieur (DCSE) - বহিঃনিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় পরিচালকবর্গ
- Département analyse et documentation (ADD) - বিশ্লেষণ এবং নথিকরণ দপ্তর আর্জেন্টিনা
- Secretaría de Inteligencia (SI) (Secretariat of Intelligence) (former SIDE)
- Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) (National Intelligence School)
- Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) (Directorate of Judicial Surveillance)
- Servicio Federal de Lucha contra el Narcotráfico (SEFECONAR) (Federal Counternarcotics Service)
- Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) (National Intelligence System)
- Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) (National Directorate of Criminal Intelligence)
- Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) (National Directorate of Strategic Military Intelligence)
- Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (Federal Penitentiary Service Intelligence)
- Inteligencia de la Policía Federal Argentina (Argentine Federal Police Intelligence)

- Inteligencia de la Policía Bonaerense (SIPBA) (Buenos Aires Police Intelligence)
- Inteligencia de la Gendarmería Nacional Argentina (SIGN) (Argentine National Gendarmerie Intelligence)
- Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina (SIPN) (Argentine Naval Prefecture Intelligence)
- Inteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (Airport Security Police Intelligence)
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) (Financial Intelligence Unit)
- Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (J-2) (Intelligence Department of the Joint General Staff of the Armed Forces)
- Central de Reunión de Inteligencia Militar (CRIM) (Military Intelligence Collection Center)
- Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) (Army Intelligence Service)
- Servicio de Inteligencia Naval (SIN) (Naval Intelligence Service)
- Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) (Air Force Intelligence Service)

আর্মেনিয়া

- National Security Service (NSS)- জাতীয় নিরাপত্তা পরিষেবা

আজারবাইজান

- Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi (MTN) - জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়
- Daxili İşlər Nazirliyi (DIN) - অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ব

বাহামা দ্বীপপুঞ্জ

Security and Intelligence Branch (SIB)

- Defence Force Intelligence Branch (DFIB)
- Financial Intelligence Unit (FIU)

বাংলাদেশ

- National Security Intelligence (NSI) - জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা

- Directorate General of Forces Intelligence (DGFI) - ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স
- Directorate of Military Intelligence (Dte. Mil. Int.) - সামরিক গোয়েন্দার পরিচালকবর্গ
- Directorate of Naval Intelligence (DNI) - নেভাল ইন্টেলিজেন্ট পরিচালকবর্গ

Office of Air Intelligence

- Criminal Investigation Department (CID)
- Special Branch (SB) স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ
- Rifles Security Unit (RSU)
- Rapid Action Battalion (RAB) - র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন

বার্বাডোস

- Financial Intelligence Unit (FIU)

বেলজিয়াম

- Staatsveiligheid / Sûreté de l'État (SV/SE) (State Security Service)
- Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid / Service Général du Renseignement et de la Sécurité (ADIV/SGRS) (General Information and Security Service)

বতসোয়ানা

- Directorate of Intelligence Security (DIS)

বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা

- Obavještajno Sigurnosna Agencija (OSA)
- Državna Agencija za Istrage i Zaštitu (State Investigation and Protection Agency, SIPA)

ব্রাজিল

- Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) - ব্রাজিলীয় গোয়েন্দা সংস্থা

ব্রুনাই

- Internal Security Department (Domestic)
- Brunei Research Department (International)

বুলগেরিয়া

- Nacionalna razuznavatelna sluzhba (NRS) (National Intelligence Service) - overseas intelligence gathering service under presidential supervision
- Nacionalna sluzhba sigurnost (NSS) - national counter-intelligence service under Ministry of Interior supervision
- Komitet za darzhavna sigurnost (KDS) (Committee for State Security) - former regime's counter-intelligence service

ক

কানাডা

- Canadian Security Intelligence Service (CSIS)
- Communications Security Establishment (CSE)
- Canadian Forces Intelligence Branch (DND)
- Criminal Intelligence Service Canada (CISC)
- Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)
- Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
- Canada Border Services Agency (CBSA)

কলম্বিয়া

- Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) (Administrative Department of Security)
- Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIPOL)
- Agencia Central de Inteligencia (ACI) (Central Intelligence Agency (of Colombia))

কোস্টারিকা

- Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) (Intelligence and National Security Department)

ক্রোয়েশিয়া ক্রোয়েশিয়া

- Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) (Security and Intelligence Agency)
- Vojna sigurnosno-obavještajna agencija (VSOA) (Military Security and Intelligence Agency)

কিউবা

- Dirección General de Inteligencia (DGI) (General

Directorate of Intelligence)

- Revolutionary Armed Forces Intelligence

চ

চীন

- Ministry of State Security (MSS)

চিলি

- Ministry of Interior
 - Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) (National Intelligence Agency)
 - Dirección de Inteligencia de Carabineros (DIPOLCAR) (Carabineros Intelligence Department)
 - Jefatura de Inteligencia Policial of the Policía de Investigaciones de Chile (Police Intelligence Department)
- Ministry of National Defense
 - Dirección de Inteligencia de la Defensa (DID) (Defense Intelligence Department)
 - Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) (Army Intelligence Department)
 - Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) (Air Force Intelligence Department)
 - Dirección de Inteligencia de la Armada (Navy Intelligence Department)

চেক প্রজাতন্ত্র

- Security Information Service (BIS)
- Úřad pro zahraniční styky a informace (UZSI) (Office for Foreign Relations and Information)
- Vojenské zpravodajství (Military Intelligence)

D-E

ডেনমার্ক

- Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Danish Security and Intelligence Service)
- Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (Danish Defence Intelligence Service)

গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র

- Agence nationale de renseignements

ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র

- Direccion Nacional de Inteligencia (DNI) (National Directorate of Intelligence)

ইকুয়েডর

- Consejo de Seguridad Nacional (COSENA)
 - Secretaria del Consejo de Seguridad Nacional
 - Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
 - División de Investigación Criminal
 - Sección de Inteligencia
 - Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
 - Escuela de Inteligencia Militar (Esin)
 - Arma de Inteligencia Militar

মিশর

- Al-Mukhabarat al-'Ammah (Egyptian General Intelligence Directorate)
- Mukhabarat el-Harbeya (Military Intelligence)
- Mabathith Amn al-Dawla al-'Ulya (State Security Investigation Bureau)

ইস্তোনিয়া

- Kaitsepolitseiamet (KAPO) (Security Police Board)
- Riigi Teabeamet (Intelligence Service)

ইথিওপিয়া

- Beherawi Mereja na Deheninet Derijit(Hizib Dehininet) (National Intelligence and Security Service)

F-G

ফিজি

- Fiji Intelligence Services

ফিনল্যান্ড

- Suojelupoliisi (Supo) (Security Police, literally Protection Police)

- Viestikoelaitos (VKoeL) (*Finnish Intelligence Research Establishment*, the signals intelligence agency of the Finnish Army, literally Signals Test Facility)
- Puolustusvoimien Tiedustelukeskus (PVTK) (*Defence Intelligence Center*)

ফ্রান্স

: List of intelligence agencies of France

- Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) (General Directorate of External Security)
- Direction Centrale du Renseignement Intérieur (DCRI) (Central Directorate of Interior Intelligence)
- Direction du Renseignement Militaire (DRM) (Directorate of Military Intelligence)
- Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense (DPSD) (Directorate of Protection and Defense Security)

জর্জিয়া রাষ্ট্র

- Foreign Intelligence Service of Georgia
- Counter-intelligence Department
- Military Intelligence Department

জার্মানী

List of intelligence agencies of Germany

- Verfassungsschutz (Protection of the Constitution)
 - Bundesamt für Verfassungsschutz (BFV) (Federal Office for the Protection of the Constitution)
 - Landesämter für Verfassungsschutz (LFV) (State Offices for the Protection of the Constitution)
- Bundesnachrichtendienst (BND) (Federal Intelligence Service)
- Militärischer Abschirmdienst (MAD) (Military Protective Service)

গ্রিস

- Ethniki Ypiresia Pliroforion (NIS) (Hellenic National Intelligence Service)

ঘানা

List of intelligence agencies of Ghana

- National Security Council (Centre of National Security)
- Bureau of National Investigations (BNI) (Internal Intelligence Agency)
- Research Department, Ministry of Foreign Affairs (External Intelligence Agency)
- Criminal Investigations Department (CID) (Ghana Police)
- Military Intelligence (MI) (Ghana Armed Forces)

H-I

হংকং

- Criminal Intelligence Bureau (CIB) of the Hong Kong Police Force
- Joint Financial Intelligence Unit (JFIU) of the Hong Kong Police Force and the Customs and Excise Department

হাঙ্গেরি

- Információs Hivatal (IH) (Information Office)
- Katonai Biztonsági Hivatal (KBH) (Military Security Office)
- Katonai Felderítő Hivatal (KFH) (Military Reconnaissance Office)
- Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) (National Security Office)
- Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) (National Security Special Service)

আইসল্যান্ড

- Greiningardeild Ríkislögreglustjóra (GRLS) (National Security Agency) (formerly *Eftirgrennslandeild Lögreglunnar* and *Útlendingaeftirlitið*)
- Greiningardeild Varnarmálastofnunar Íslands (GVMSÍ) (Military Intelligence Service) (formerly: Icelandic Intelligence Service (IIS))
- Skattrannsóknarstjóri Ríkisins (National Tax Investigation Police)

ভারত

List of Indian Intelligence agencies

- Internal Security
 - Intelligence Bureau
 - Joint Intelligence Committee

- Central Bureau of Investigation
- Criminal Investigation Department
- All India Radio Monitoring Service
- External Intelligence
 - Research and Analysis Wing
 - Aviation Research Centre
 - National Technical Research Organisation
 - Radio Research Center
 - Electronics and Technical Services
- Defence Intelligence
 - Directorate of Military Intelligence - সামরিক গোয়েন্দার পরিচালকবর্গ
 - Defence Intelligence Agency
 - Directorate of Naval Intelligence
 - Directorate of Air Intelligence
 - Image Processing and Analysis Centre
 - Directorate of Signals Intelligence
 - Joint Cipher Bureau
- Economic Intelligence
 - Directorate of Revenue Intelligence
 - Economic Intelligence Council - অর্থনৈতিক গোয়েন্দা পরিষদ
 - Directorate of Income Tax Investigation
 - Narcotics Control Bureau
 - Central Economic Intelligence Bureau
 - Directorate of Economic Enforcement
 - Directorate of Anti-Evasion

ইন্দোনেশিয়া

- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Badan Intelijen Strategis (BAIS)

ইরান

- Ministry Of Intelligence (MOIS)

ইরাক

- General Security Directorate (Iraq) (GSD)
- Iraqi National Intelligence Service (INIS)

প্রজাতন্ত্রী আয়ারল্যান্ড

- G2 (Military Intelligence)
- Special Detective Unit (formerly Special Branch) of the Garda Síochána
- National Surveillance Unit (NSU) of the Garda Síochána

ইসরাইল

Israeli Security Forces

- ha-Mossad le-Modiin u-le-Tafkidim Myukhadim (Mossad) (Institute for Intelligence and Special Operations)
- Sherut ha-Bitakhon ha-Klali (Shabak or Shin Bet) (General Security Service)
- Agaf ha-Modi'in (Aman) (Military Intelligence)

ইতালি

- Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI): Agency for Internal Information and Security (domestic intelligence agency).
- Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE): Agency for External Information and Security (external intelligence agency).
- Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS): Department of Information for Security (classified data management, personnel training for both AISI and AISE).
- Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR): Inter-ministerial Committee for the Security of the Republic (a joint intelligence supervision committee).

J

জামাইকা

- Jamaica Defence Force Intelligence Unit
- National Intelligence Bureau (NIB)

জাপান

- Cabinet Secretariat
 - Cabinet Intelligence and Research Office (Naikaku Joho Chosaitu)

- Cabinet Satellite Intelligence Center (CSICE)
- Ministry of Defense
 - Bureau of Defense Policy
- Defense Intelligence Division (DID)
 - Defense Intelligence Headquarters (DIH)
 - Military Intelligence Command (JGSDF)
 - Fleet Intelligence Command (JMSDF)
 - Air Intelligence Wing (JASDF)
- National Police Agency
 - Security Bureau (SB)
 - Tokyo Metropolitan Police Department Public Security Bureau
- Ministry of Foreign Affairs
 - Intelligence and Analysis Service (IAS)
- Ministry of Justice
 - Public Security Intelligence Agency (PSIA)

জর্দান

- Da'irat al-Mukhabarat al-'Ammah (GID) (General Intelligence Department)

K-M

কেনিয়া

- National Security Intelligence Service (NSIS) - জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা পরিষেবা

•

কোরিয়া

- National Intelligence Service (NIS)

লাতভিয়া

- Satversmes aizsardzības birojs (SAB) (Bureau of Constitutional Defense)

লিবিয়া

- Jamahiriya el-Mukhabarat

লিথুয়ানিয়া

- Valstybes Saugumo Departamentas (Apie VSD) (State Security Department)

- Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas (AOTD) prie Krašto apsaugos ministerijos (Apie AOTD) (Second Investigation Department under Ministry of National Defence)

লুক্সেমবার্গ

- Service de Renseignement de l'Etat (State Intelligence Service)

ম্যাসেডোনিয়া প্রজাতন্ত্র

- Agencija za razuznavanje (Intelligence Agency) IA

মালয়েশিয়া

- Malaysian Special Branch, a Special Branch
- Royal Intelligence Corps, an intelligence agency

মালদ্বীপ

- Maldives National Defence Force (Special Assessment Unit)
- মালদ্বীপ জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী
- Maldives Police Service (Internal Intelligence Department)

মেক্সিকো

- Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) (National Security and Investigation Center)
- Agencia Federal de Investigación (AFI) (Federal Investigation Agency)

মলদোভা

- Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) (Information and Security Service of the Republic of Moldova)

মঙ্গোলিয়া

- General Intelligence Agency of Mongolia (GIA)

মন্টিনিগ্রো

- National Security Agency (ANB)

মরোক্কো

- Direction de la Surveillance du Territoire (DST) (Directorate of Territorial Surveillance)
- Direction Generale pour l'Etude et la Documentation (DGED) (Directorate of Research and Documentation)

N

নেদারল্যান্ডস

- Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (General Intelligence and Security Service)
- Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) (Military Intelligence and Security Service)
- Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst-Economische Controledienst (FIOD-ECD) (Fiscal Intelligence and Investigation Service-Financial Control Service)
- Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) (Police Criminal Intelligence Unit)
- Nationale Signals Intelligence Organisatie (NSO) (National Signals Intelligence Organization)
- Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) (Social Intelligence and Investigation Service), used for investigations in the social security system

নিউজিল্যান্ড

Mainarticle

- Government Communications Security Bureau
- Security Intelligence Service

নাইজেরিয়া

- State Security Service (SSS)
- National Intelligence Agency (NIA)

নরওয়ে

- Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) (National Security Authority)
- Politiets sikkerhetstjeneste (PST) (Police Security Service), formerly Politiets overvåkningstjeneste (POT) (Police Surveillance Agency)
- Etterretningstjenesten (NIS) (Norwegian Intelligence Service)
- Forsvarets sikkerhetstjeneste(FOST) - Norwegian Defence Security Service (NORDSS)

P

পাকিস্তান

List of Pakistani Intelligence agencies

- Inter-Services Intelligence (ISI)
- Intelligence Bureau (IB)
- Military Intelligence (MI)
- Naval Intelligence (NI)
- Federal Investigation Agency (FIA)
- Central Intelligence/Investigation Agency (CIA)
- Special Branch (SB)

পানামা

Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional (CSPDN)
(security, defense and intelligence main government entity)

- Direccion Nacional de Informacion Policial (DNIP)
(National Police intelligence)
- Policia Tecnica Judicial de Panama (PTJP)
- Direccion de Investigacion e Informacion Policial (DIIP)
- Direccion de Investigacion Judicial (DIJ)
- Direccion General de Analisis e Inteligencia Estrategica
(DGAIE)[১]
- Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (SENIS)[২]

পেরু

- Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) (National
Intelligence Service)

ফিলিপাইন

- Police Intelligence Unit, Philippine National Police
- Military Intelligence Group
- Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines
(ISAFP)
- National Intelligence Coordinating Agency (NICA)
- National Bureau of Investigation (NBI)
- Naval Intelligence and Security Force (NISF)
- Counter-Intelligence Group (CIG)
- Special Staff Directorate
- Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)

পোল্যান্ড

- Agencja Wywiadu (AW) (Foreign Intelligence Agency)
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) (Internal Security Agency)
- Służba Wywiadu Wojskowego (SWW) (Military Intelligence Service)
- Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) (Military Counter-intelligence Service)
- Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) (Central Anticorruption Bureau)

পর্তুগাল

- Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) (Intelligence System of the Portuguese Republic)
- Serviço de Informações de Segurança (SIS) (Security Intelligence Service)

R

রোমানিয়া

- SRI (Romanian Intelligence Service)
- SIE (External Intelligence Service)
- SPP (Protection and Security Service)
- STS (Special Telecommunications Service)
- DGIA (Directorate General of Defence Intelligence)
 - Direcția de Informații Militare - DIM (Directorate of Military Intelligence)
 - Direcția de Siguranță Militară - DSM / J2 (Directorate of Military Security)
- DGIPI (Directorate General of Information and Internal Protection - Ministry of the Interior)

রাশিয়া

- Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti (FSB) (Federal Security Service, is active within the country and deals with national security and counter-espionage)
- Federalnaya Sluzhba Okhrany (FSO) (Federal Bodyguard Service - corps of bodyguards for government officials; responsible for their personal security)

- Federalnoye Agentstvo Pravitelstvennoy Svyazi i Informatsiyi (FAPSI) (Federal Agency of Government Communications and Information - dissolved)
- Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravlenie (GRU) Genshtaba (Main Intelligence Directorate of General Staff - external military intelligence service, subordinate to the Army)
- Sluzhba Vneshney Razvedki (SVR) (Foreign Intelligence Service - external non-military intelligence service, subordinate to President alone)

S

সৌদি আরব

- Al Mukhabarat Al A'amah (General Intelligence Directorate)

সার্বিয়া

- Civilian agency
 - Bezbednosno Informativna Agencija (BIA) Security Information Agency (under Government and Parliamentary control)
 - Služba za istraživanje i dokumentaciju (SID) Service for inquiry and documentation (Ministry of Foreign Affairs)
- Military agency
 - Vojno-bezbednosna agencija (VBA) Military security agency (Ministry of Defence), successor of Kontraobaveštajna služba, KOS (Counter-intelligence service)
 - Vojno-obaveštajna agencija (VOA) Military intelligence agency (Ministry of Defence)
 - Uprava za izvidjačko-obaveštajne poslove (J-2) Reconnaissance and intelligence department (General staffs HQ)

সিঙ্গাপুর

- Internal Security Department (ISD)
- Security and Intelligence Division (SID)

স্লোভাকিয়া

- Slovenská informačná služba (SIS) (Slovak Information Service)

- Vojenské spravodajstvo (Military Intelligence)
 - Vojenská spravodajská služba (VSS) (Military Intelligence Service)
 - Vojenské obranné spravodajstvo (VOS) (Military Defence Service)
- Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) (National Security Bureau)

স্লোভেনিয়া

- Slovenska Obveščevalno-Varnostna Agencija (SOVA) (Slovenian Intelligence and Security Agency)

দক্ষিণ আফ্রিকা

- National Intelligence Agency (NIA)
- South African Secret Service (SASS)
- South African National Defence Force Intelligence Division (SANDF-ID)
- Crime Intelligence Division, South African Police Service

সোমালিয়া

- National Security Service (NSS)

স্পেন

- Centro Nacional de Inteligencia (CNI) (National Intelligence Centre)
- Centro Superior de Información de la Defensa (CESID)
- Cuerpo Nacional de Policía (CNP)
- Brigada de Investigación Tecnológica (BIT)
- Comisaría General de la Información (CGI)
- Civil Guard (Servicio de información de la Guardia Civil)
- Spanish Army (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas)
- Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) (National Coordination Centre for Counter-Terrorism)
- Customs Service (Servicio de Vigilancia Aduanera)

শ্রীলঙ্কা

- Civil
 - State Intelligence Service (SIS)
- Military
 - Directorate of Military Intelligence

সুদান

- Jihaaz Al Amn Al Watani Wal Mukhaabaraat (National Security and Intelligence Service)

সুইডেন

- Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) (Military Intelligence and Security Directorate)
- Säkerhetspolisen (SÄPO) (Security Service)
- Kontoret för särskild inhämtning (KSI) (Office for Special Acquisition)
- Försvarets Radioanstalt (FRA) (Defence Radio Establishment)
- Underrättelsekontoret (UNDK) (Intelligence Office)
- Säkerhetskontoret (SÄKK) (Security Office)

সুইজারল্যান্ড

- Strategischer Nachrichtendienst (SND) (Strategic Intelligence Service)
- Dienst für Analyse und Prävention (DAP) (Analysis and Prevention Service)
- Militärischer Nachrichtendienst (MND) (Military Intelligence Service)
- Luftwaffennachrichtendienst (LWND) (Air Force Intelligence Service)

সিরিয়া

Air Force Intelligence Directorate

- General Security Directorate
- Political Security Directorate
- Military Intelligence Service

T

প্রজাতন্ত্রী চীন

- General Strategy
 - National Security Bureau, National Security Council
- Civil
 - Ministry of Justice Investigation Bureau (MJIB)
 - National Police Agency, Ministry of Interior

- Semi-military
 - Coast Guard Administration
- Military
 - All Service Units
 - Military Police Command, Ministry of National Defense
 - Military Intelligence Bureau, General Staff Headquarters, Ministry of National Defense
 - Military Security General Corps, General Staff Headquarters, Ministry of National Defense
 - Political Warfare General Bureau, Ministry of National Defense
 - Single Branch Units
 - Staff Department of Intelligence (S2), Army Command
 - Staff Department of Intelligence (S2), Navy Command
 - Staff Department of Intelligence (S2), Air Force Command

থাইল্যান্ড

- Sahmnakkhaogrong-hangshaat (NIA) (National Intelligence Agency)
- Armed Forces Security Center
- Department of Special Investigations
- Internal Security Operations Command (ISOC)
- Crime Suppression Division (CSD)

তুরস্ক

- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) (National Intelligence Organization)
- Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) (Gendarmerie Intelligence and Counter-Terrorism Bureau)
- Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı (Police Intelligence Bureau)
- Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı (Joint Chief of Staff Intelligence Bureau)
- Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı (Army Intelligence Bureau)
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı (Naval Intelligence Bureau)
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı (Air Force Intelligence Bureau)

তুর্কমেনিস্তান

- Committee for National Security (KNB)

U

ইউক্রেন

- Central Intelligence Directorate– Holovne Upravlinnya Rozvidky (HUR)
- Foreign Intelligence Service of Ukraine– Sluzhba Zovnishniyi Rozvidky Ukrayiny (SZR or SZRU)
- National Bureau of Investigation (NBI)
- Security Service of Ukraine– Sluzhba Bezpeky Ukrayiny (SBU)

যুক্তরাজ্য

- Tasking and strategic direction
 - Joint Intelligence Committee (JIC)
- National Agencies
 - সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস (এসআইএস বা এমআই৬)
 - Security Service (colloquially MI5)
 - Government Communications Headquarters (GCHQ)
 - JARIC (National Imagery Exploitation Centre) (formerly MI4)
 - Special Branch - Each police force has their own Special Branch
- Military all source analysis and direction
 - Defence Intelligence Staff (DIS)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সম্প্রদায়

Office of the Director of National Intelligence

- Independent Agencies

Central Intelligence Agency (CIA) - কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
 - Air Force Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Agency (AF ISR) AIA
 - আর্মি সিআইডি (সিআইডি)

- Military Intelligence [৩]
- Defense Intelligence Agency (DIA)
- Marine Corps Intelligence Activity [৪]
- National Geospatial-Intelligence Agency (NGA)
- National Reconnaissance Office (NRO)
- National Security Agency (NSA)
- Naval Criminal Investigative Service (NCIS)
- Office of Naval Intelligence (ONI)
- United States Department of Energy
 - Office of Intelligence and Counterintelligence
- United States Department of Homeland Security
 - United States Secret Service
 - Coast Guard Intelligence [৫]
 - Office of Intelligence and Analysis
- United States Department of Justice
- Federal Bureau of Investigation (FBI), Directorate of Intelligence - ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন
 - Drug Enforcement Administration, Office of National Security Intelligence (DEA)
- United States Department of State
 - Bureau of Intelligence and Research (INR)
- United States Department of the Treasury
 - Office of Terrorism and Financial Intelligence

উজবেকিস্তান

- Milliy Havfsizlik Hizmati, Служба национальной безопасности (CHB) (National Security Service) জাতীয় নিরাপত্তা পরিষেবা
- V-Z

ভ্যাটিকান সিটি

- Section for Relations with States

ভেনিজুয়েলা

Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) - গোয়েন্দা এবং প্রতিরোধ পরিষেবার পরিচালকবর্গ

- General Counterintelligence Office

ভিয়েতনাম

- Tổng cục 2 tình báo quân đội (TC2) - সামরিক গোয়েন্দার দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিশন

জিম্বাবুয়ে

Central Intelligence Organisation (CIO) - কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা

জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা

জাতীয়
গোয়েন্দা
সংস্থা

আফগানিস্তান: এনডিএস. আলবেনিয়া: এসএইচআইএসএইচ.
আলজেরিয়া: ডিআরএস. আর্জেন্টিনা: এসআই. অস্ট্রেলিয়া.
এএসআইএস. আজারবাইজান: এমএনএসএ, বাহরাইন:
এনএসএ. বাংলাদেশ:এন এসআই. বেলারুশ: কেজিবিআরবি.
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা: ওসএ ব্রাজিল: এনবিআইএন, ব্রুনাই:
বিআরডি, ক্যামেরুন: বিএমএম. কানাডা: সিএসআইএস, চাদ:
এএনএস. চিলি: এএনআই, চিন: এম এসএস, Côte d'Ivoire:
এনএসসি. Croatia: এসওএ. কিউবা: ডিআই Czech Republic:
বিআইএস. ডেনমার্ক: এফই. Djibouti: BSRG. Egypt:
GIS. France: DGSE. Gambia: NIA. Germany: BND. Greece:
EYP. Hungary: IH. India: RAW. Indonesia: BIN. Iran:
VEVAK. Iraq: GSD. Ireland: G2. Israel: মোসাদ. Italy:
AISE. Japan: PSIA. Jordan: GID. Kazakhstan:
NSC. Kyrgyzstan: SNB. Kuwait: KSS. Latvia:
SAB. Lithuania: VSD. Lebanon: GDGS. Libya:
MJ. Macedonia: DSCI. Malaysia: KRD. Maldives:
NSS. Mexico: CISEN. Montenegro: ANB. Morocco:
DGST. Mozambique: SISE. Netherlands: AIVD. New
Zealand: EAB. Nigeria: NIA. Pakistan: ISI. Papua New
Guinea: NIO. Philippines: NICA. Poland: AW. Portugal:
SIED. Qatar: QSS. ROC: NSB. Romania: SIE. Russia:
SVR. Saudi Arabia: GIP. Serbia: BIA. Sierra Leone:
CISU. Singapore: SID. Slovakia: SIS. Slovenia:
SOVA. Somalia: NSS. South Africa: SASS. South Korea:
NIS. Spain: CNI. Sri Lanka: SIS. Sudan:
JAWM. Switzerland: NDB. Syria: GSD. Tajikistan:
MoS. Togo: NIA. Tunisia: TIA. Turkey: MIT. Turkmenistan:
KNB. Uganda: ISO. Ukraine: SZRU. United Arab Emirates:
UAEI. United Kingdom: SIS. United States:
সিআইএ. Uzbekistan: MHH

স্থানীয়
গোয়েন্দা
সংস্থা

Argentina: SIDE • Australia: ASIO • Bangladesh: SB • Belarus: KGB RB • Brazil: ABIN • Canada: CSIS • Chile: ANI • China: MSS • Croatia: SOA • Denmark: PET • Egypt: AI • Watani • Estonia: KAPO • Finland: SUPO • France: DCRI • Germany: BfV • Greece: EYP • Hungary: AH • India: IB • Iran: NAJA • Ireland: NSU • Israel: Shin Bet • Italy: AISI • Latvia: DP • Lithuania: STT • Macedonia: IA • Japan: NPA • PSIA • Netherlands: NCTb • New Zealand: NZSIS • Nigeria: SSS • Norway: PST • Oman: ISS • Pakistan: IB • Philippines: NBI • Poland: ABW • Portugal: SIS • ROC • MJIB • Romania: SRI • Russia: FSB • Serbia: BIA • Singapore: ISD • South Africa: NIA • South Korea: SPO • Sri Lanka: SIS • Sweden: SÄPO • Switzerland: NDB • Syria: GSD • Turkey: KDGM • Ukraine: SBU • United Kingdom: MI5 • United States: FBI

সামরিক
গোয়েন্দা
সংস্থা

Australia: DIO • Bangladesh: DGFI • Brazil: DIE • Canada: Int Branch • People's Republic of China: MID • Croatia: VSOA • Egypt: DMISR • Denmark: FE • Finland: FMIS • France: DRM • DGSE • Germany: MAD • Hungary: KNBSZ • India: DMI • Israel: MID • Italy: CII • Macedonia: MSSI • Mexico: CISEN • Netherlands: MIVD • Pakistan: MI • Philippines: ISAFP • Poland: SKW, SWW • ROC • MND • Romania: DGIA • Russia: GRU • Serbia: VOA, VBA • Singapore: MIO • Slovakia: VSS • Slovenia: OVS • South Korea: DSC • Sri Lanka: DMI • Sweden: MUST • Switzerland: MND • Syria: MI • AFID • Ukraine: HUR • MO • United Kingdom: DIS • United States: DIA • Kazakhstan: NSC •

Signals
intelligence
agencies

Australia: DSD • Brazil: 2ª Sch/EMD • Canada: CSE • People's Republic of China: SIGINT • Croatia: OTC • Finland: FIRE • France: DGSE • Germany: BND • India: JCB • Israel: 8200 • Japan: DIH • Netherlands: AIVD • New Zealand: GCSB • Pakistan: JSIB • Russia: GRU/Spetsviaz • South Africa: NCC • Sweden: FRA • Switzerland: NDB • Syria: MI • Ukraine: Derzhspetsviazok • United Kingdom: GCHQ • United States: NSA • Kazakhstan: NSC •

সূত্র: উইকিপিডিয়া

৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত

গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা

ডি.আই.এ ডাইরেক্টর অব সাইন্স এণ্ড টেকনোলজীর দক্ষ কর্মকর্তাগণ তথ্য হস্তগত করার এমন সব অস্পৃশ্য পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে যার উদ্দেশ্য হল চীনের মিসাইলের প্রোগ্রামের তথ্য জানা। এক প্রস্তাব অনুযায়ী এ বৈঠকের কাজ ছিল এমন একটি উড়োজাহাজ তৈরী করা যা খুলে বড় দুইটি স্যুটকেসের মধ্যে রাখা যাবে। এরপর এজেন্ট স্যুটকেস দুটি কোন কায়দায় নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করাবে। এরপর ওখানে আপন গোয়েন্দা কাজ হাছিল করে উড়োজাহাজটিকে জোড়া লাগিয়ে তাকে উড়িয়ে পার্শ্ববর্তী কোন বন্ধুদেশে ল্যাণ্ড করাবে। অন্যদের কথাতো দূরে থাক স্বয়ং গোপন সার্ভিসের চীফ এই স্কীমের ব্যাপারে কিছু করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আর এভাবেই তাদের এই স্কীম ড্রইং বোর্ডের উপর মৃত্যু মুখে আপতিত হয়েছে।

এজেন্সির টেকনিশিয়ানগন গোপন তথ্য সংগ্রহ করার যন্ত্রও আবিষ্কার করেছে। সি.আ.এ-এর টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা নিম্ন নতুন সিস্টেম আবিষ্কার করার জন্য এ কারনে বাধ্য হয় যে, তারা অন্যদের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে অটল থাকতে চায়। তাদের গবেষণাগুলোকে গোয়েন্দা কাজে সহায়ক যন্ত্র আবিষ্কারের জন্যই অনুমোদন দেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে দূর্ভাগ্যবশত পলিসি আবিষ্কারকদের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে যন্ত্র বানানো হয় না। বরং সি.আই.এ ও অন্যান্য গোয়েন্দা ঘরানার লোকদের প্রয়োজনের তাগিদেই তৈরী করা হয়। মার্কিন সরকার এক্ষেত্রে অপারগ, কিছুই করতে পারে না। প্রযুক্তির কল্যাণে পূর্বের গোয়েন্দা কার্যক্রম যান্ত্রিক যুগে পর্দা পণ করেছে। যার ফলে এ জগতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তা হল, এখন কৃত্রিম গ্রহের যুগে গোপন তথ্য সংগ্রহ ও অন্যদের যোগাযোগের মাঝে হস্তক্ষেপ করার যন্ত্রের মাধ্যমে অনেক বেশী তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে। মার্কিনদের বিশেষ শত্রুদের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে এসব যন্ত্রগুলোর অনেক বড় অবদান রয়েছে। আকাশ থেকে শত্রুর অবস্থান ও শক্তি অনুমানকারী প্রোগ্রামগুলো চীন রাশিয়ার ক্ষেপনাস্ত্রের প্রোগ্রাম, সেনাবাহিনীর গতিবিধি, সামরিক প্রস্তুতি বিষয়ক অনেক তথ্য সরবরাহ করে।

তারাই উত্তর ভিয়েতনামকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভিতর প্রবেশ করিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়াকে উত্তর কোরিয়ার সামরিক প্রস্তুতি সংক্রান্ত অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছে। এই সুব্যবস্থার কারনেই আমেরিকা মধ্য এশিয়ার

অধিকাংশ দেশ সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকে। যেহেতু দিন দিন যান্ত্রিক তথ্য-উৎপাদন পদ্ধতি উৎকৃষ্ট হয়ে চলেছে সে কারণে উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রগুলিতে সনাতন পদ্ধতিতে গোয়েন্দাগিরি পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। সনাতন পদ্ধতি আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

একারণে আমেরিকার বার্ষিক ব্যয় আকাশচুম্বি হয়ে গেছে। প্রায় ছয়শত বিলিয়ন ডলার। যদিও সনাতন পদ্ধতিতে গোয়েন্দা কার্যক্রম চালালে অনেক কম করতে তা সম্ভব হত। অধিকন্তু যান্ত্রিক উপকরণের খরচ আকাশচুম্বি হওয়া সত্ত্বেও এর দ্বারা নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। বরং তা প্রস্তুত থেকে নিয়ে বিশ্লেষণ ও ফলাফল বের করা পর্যন্ত সকল দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে বড় একটি দলের প্রয়োজন। বিশাল ব্যয় ও ব্যাপক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। যার মাধ্যমে যান্ত্রিক তথ্য উদ্ধার, মনিটরিং ও স্ক্যানিংয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করা হয়। লাগাতার কয়েক বছর সাধনার পর সি.আই.এ-এর বিজ্ঞানীরা গোয়েন্দা বিমান আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে। এটাই সর্বপ্রথম কর্মক্ষম পরিপূর্ণ কৃত্রিম উপগ্রহ যার মাধ্যমে আকাশ থেকে ফটোগ্রাফির মাধ্যমে শত্রুর অবস্থান, গতিবিধি ও শক্তির সঠিক অনুমান করা যায়। শত্রু থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার জন্য অসাধারণ প্রযুক্তি ও সেন্সর সম্পন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্র যেমন দিগন্ত পর্যন্ত দেখতে সক্ষম রাডার এবং বুলন্ত কৃত্রিম উপগ্রহের (স্যাটেলাইট) অনেক অবদান রয়েছে। এসব গবেষণা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্য পরীক্ষার ব্যয়ভারের অধিকাংশ পেন্টাগন বহন করে। অনেক প্রোগ্রামকে সি.আই.এ ও পেন্টাগনের যৌথ অপারেশনে পরিবর্তন করা হয়েছে। অথবা মিলিটারী সার্ভিস তা নিয়ে নিয়েছে। কেননা আমেরিকানরা একে বাধ্যতামূলক মনে করে।

যান্ত্রিক গুপ্তচরবৃত্তিতে আমেরিকার সর্বপ্রথম রেডিও প্রোগ্রামগুলোতে হস্তক্ষেপ ও কোড ব্রেকিং বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন হয়। যাকে যোগাযোগ সংক্রান্ত গুপ্তচরবৃত্তি কমেন্ট বলে।

যদিও সেক্রেটারী অব স্টেট হেনরী স্যামসন ১৯২৯ সালে এ কারণে স্টেট ডিপার্টমেন্ট এর গোয়েন্দা সেকশনকে বন্ধ করে দেয় যে, অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা একে অপরের চিঠি পাঠ করে না। কিন্তু কমেন্টকে দ্বিতীয়বার চালু করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গোয়েন্দা তৎপরতায় তার অবদান অনস্বীকার্য। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এর কার্যক্রম ঝিমিয়ে পড়লেও শীতল যুদ্ধের (Cold war) সময়ে বেশ সক্রিয় ছিল বলে জানা যায়।

Cold war বা স্নায়ুযুদ্ধ

(Cold war বা স্নায়ুযুদ্ধ । একে শীতলযুদ্ধও বলে । এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রসমূহ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রসমূহের মধ্যকার টানপড়নের নাম । ১৯৪০ দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৮০ দশকের শেষ পর্যন্ত প্রায় ৫ দশক ব্যাপি সময়কালে এই দুই শক্তিশালী দেশের মধ্যকার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রাজনৈতিক মতনৈক্য আন্তর্জাতিক রাজনীতির চেহারা নিয়ন্ত্রণ করত । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশসমূহ ছিল গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পক্ষে আর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্র দেশসমূহ ছিল সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রপন্থী । স্নায়ু যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মিত্র ছিল যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, জাপান ও কানাডা । আর সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে ছিল পূর্ব ইউরোপের অনেক রাষ্ট্র যেমন, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, পূর্ব জার্মানি ও রোমানীয়া । স্নায়ুযুদ্ধের কিছুকাল যাবত কিউবা এবং চীন সোভিয়েতদের সমর্থন দেয় । যে সমস্ত দেশ দুই পক্ষের কাউকে সরকারীভাবে সমর্থন করত না তাদেরকে নিরপেক্ষ দেশ বলা হত । তৃতীয় বিশ্বের নিরপেক্ষ দেশগুলো জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অংশ ছিল । অবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাটকীয় পরিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধের সমাপ্তি হয় । এ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাকে ইংরেজীতে Cold war কথাটি দিয়ে সর্বপ্রথম সূচিত করেন মার্কিন সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান । ১৯৪৭ সালে তার একই শিরোনামের বইতে । আজ ২০১৬ তে এসে বিশ্ব নতুন করে আবার স্নায়ুযুদ্ধের চেহারা দেখতে যাচ্ছে । একদিকে রাশিয়া, ইরান, বাশার আল আসাদ (আহলাকাহুলাহ ওয়া যুমরতাহ) অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের জোট দেশগুলো । এতে জড়িয়ে পড়েছে কিছু মুসলিম নামধারী শাসকও)

১৯৫২ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট একটি গোপন অধ্যাদেশের মাধ্যমে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি (NSA) কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, তারা শত্রু-মিত্র সকলের যোগাযোগের মধ্যে অনুপ্রবেশ করবে এবং তাদের গোপন অফিসিয়াল ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে । সাথে সাথে নিজেদের কোড সংরক্ষণের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে । শুরুতে NSA প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাখা হয়েছিল । কিন্তু অতি অল্প সময়ে তা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের রূপ ধারণ করে ।

ওয়াশিংটনে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাস সমূহে যেসব তথ্য আপন দেশের রাজধানী থেকে এসে পৌঁছে সেগুলো মেরীল্যান্ড ও ভার্জিনিয়াতে স্থাপিত

শ্রবণযন্ত্র দ্বারা খুব সহজেই শোনা যায়। কিন্তু পৃথিবীর অন্য জায়গার যোগাযোগ এত সহজে শোনা যায় না। NSA গোটা দুনিয়ায় হাজার হাজার ভিন্ন চৌকিকে সহায়তা করে। সাধারণত এগুলো আমেরিকার অন্যান্য এজেন্সির চৌকি হয়ে থাকে। সাধারণত NSA বৈদেশিক বিষয়ে যে সকল এজেন্সি থেকে সহায়তা নেয় তার মধ্যে স্থল সেনা এজেন্সি, নেভি সিকিউরিটি এজেন্সি, এয়ার সিকিউরিটি এজেন্সি অন্যতম। সেনাবাহিনীর এই তিনটি শাখাই NSA এর সাথে নীতিগত সম্পর্ক রাখে। তারা যে সকল তথ্য সংগ্রহ করে তা ওয়াশিংটনের অদূরে মেরীল্যান্ড ফোর্ট মিডলে অবস্থিত NSA এর হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেয়।



এনএসএর সদরদপ্তর, ফোর্ট মিডল, মেরীল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র

ন্যাশনাল সিকিউরিটির সর্ববৃহৎ বিরোধপূর্ণ বিমানবন্দর সম্পর্কে সিনেটের একটি সাব কমিটি যারা আমেরিকা কর্তৃক বহির্বিশ্বের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতিগুলো গবেষণা করে, এক প্রতিবেদনে জানায় যে, এই গোপন বিমানবন্দরটি হেল স্যালাজির শাসনামল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যার বিনিময়ে তাকে হাজার মিলিয়ন ডলার সামরিক ও আর্থিক সহায়তা স্বরূপ দেয়া হয়েছে। অথচ কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যের এ ব্যাপারে কোন জ্ঞানই ছিল না।

এই সাব কমিটির প্রধান স্টুর্ট সাই ক্লিগন NSA এর আরেকটি গোপন জায়গার সন্ধান পায় যেখান থেকে সামুদ্রিক নিয়ন্ত্রণ ও দিক নির্দেশনার কাজ করা হত। যা কংগ্রেসের কারো জানা ছিল না। এই দুই বন্দরে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা থেকে আগত সংবাদ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। বন্দর স্থাপনের জন্য আমেরিকাকে স্থানীয় প্রশাসনের অনেক দায়িত্ব নিতে হয়েছে এবং অনেক প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে হয়েছে।

গুরুত্রে NSA পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ ও চীনের বিরুদ্ধে কিছুটা সাফল্য অর্জন করলেও পরবর্তীতে সে দেশের উন্নত গোয়েন্দা সংস্থার সাথে প্রতিযোগিতা করে আর পারেনি। এখন এরা বড় বড় টার্গেটের কোন তথ্য

সংগ্রহ করতে সক্ষম নয়। বরং অন্যান্য ছোট ও অনুন্নত সংস্থার ন্যায় কমগুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহই তার কাজ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়া, চীন ইত্যাদি দেশের গোপনতথ্য আহরণ করার কথা তো চিন্তা করাই যায় না। এ জন্য আমেরিকাকে স্যাটেলাইট সিস্টেমের উপর ভরসা করতে হয়।

NSA তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ফলপ্রসূ গোয়েন্দা সংস্থা হিসাবে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে কিছু বন্ধুপ্রতিম দেশও রয়েছে। NSA বিশ্বের সবথেকে বড় কম্পিউটার ও Cryptanalysts এর ব্যাংক। অন্যদের কোড ও দাণ্ডরিক ভাষা অনুবাদ করতে তাদের কোন সময়ই ব্যয় হয় না। ১৯৬০ সালে NSA এর দুই ধূর্ত গোয়েন্দা ভেলিম মার্টিন ও ব্যারনন ম্যাচল রাশিয়ায় পালিয়ে যায় এবং এ তথ্য প্রকাশ করে যে, NSA এর জন্য প্রায় চল্লিশটি দেশের কোড সিস্টেম পড়তে কোন সমস্যা হয় না। গোয়েন্দাদ্বয় আরো বলেন, NSA এর আরেকটি সফলতা হল তারা বিভিন্ন দেশকে Cryptograph ও Encoding এর মেশিনে সরবরাহ করে। যার মাধ্যমে সে দেশের তথ্য সরাসরি তাদের হস্তগত হয়। এ তথ্যগুলো গোয়েন্দাদ্বয় মস্কোতে এক প্রেস কনফারেন্সে প্রকাশ করে।

‘ব্রেক’ যান্ত্রিক উপকরণের মাধ্যমে গোপনতথ্য সংগ্রহের একটি পরিভাষা যা শুধু শব্দের অর্থ উদ্ঘাটন নয় বরং অন্য দেশের যোগাযোগ স্থাপনকারী ব্যক্তির ভুলও জানতে পারে। কয়েক বছর পূর্বে ওয়াশিংটনে কোন এক দেশের দূতাবাসে এক গোপন যোগাযোগ স্থাপনকারী ক্লার্কের নিযুক্তি হয়। দ্রুত আপন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সে স্পষ্ট ভাষায় একটি তথ্য প্রদান করে। পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে ঐ কথাটিই কোড শব্দের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করে। উভয় কথাটি NSA এর হাতে পৌঁছে যায়। এতে করে তাদের সে দেশের কোড বুঝতে আর কোন সমস্যা হত না। কোড বাক্যকে পূর্বের কথাগুলোর সাথে মিলিয়ে শব্দগুলো আগে পরে করার মাধ্যমে NSA তাদের ভাষা বুঝতে পারত।

নষ্ট হয়ে যাওয়া কিংবা যোগাযোগ স্থাপনকারী পুরাতন যন্ত্র মেরামত করা NSA এর জন্য একটি প্লাস পয়েন্ট। এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন দেশের নষ্ট বা বিকল যন্ত্র থেকে তাদের ভাষা উদ্ঘাটন করে থাকে।

ক্লার্কের আরেকটি পদ্ধতি হল, ভিন্ন দেশের গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর হামলা করা। আইনস্টাইন অপারেশন ক্লিভ এর মাধ্যমে অন্যদেশের কোড বুক অথবা গোপন লেখার পদ্ধতি চুরি করা। যোগাযোগ স্থাপনকারী ক্লার্ককে ঘুষ দিয়ে অথবা কোন দূতাবাসের রেডিও রুমের বৈদ্যুতিক তরঙ্গযন্ত্র গোপন করে

এই হামলা করার জন্য সিআই এর এক বিশেষ স্টাফ ইউনিটকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। হামলায় সফল হলে আহরিত তথ্য NSA এর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

NSA এর ব্যবসায়িক ও কূটনৈতিক তথ্য গোপন ভিত্তিতে জানার একটি ফলাফল এই যে, এতে তারা অধিকাংশ সময় মার্কিন সাধারণ নাগরিক ও কংগ্রেসের সদস্য কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের প্রেরিত তথ্যও NSA জেনে যায়। যা তাদের পেরেশানির কারন হয়ে দাড়ায়। এ সকল তথ্যের ব্যপারে NSA তে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। যদিও অন্যান্য তথ্যও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যার জন্য তাদের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যস্থার আশ্রয় নিতে হয়। উদাহরন স্বরূপ কোন সিনেটর ওয়াশিংটনে অবস্থিত কোন বৈদেশিক দূতাবাসে উপস্থিত হয়ে সে দেশের দূতের সাথে কোন কথা বলে। পরবর্তীতে দূত সে কথা আপন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে পাঠিয়ে দেয়। এটাও NSA জেনে ফেলে। তাহলে ধারণা করুন তথ্যটি কত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭০ সালে এধরনের একটি ফাঁদে পড়ে যায়। তখন মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা বিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছিল। স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক উচ্চপদস্থ অফিসার এক আরব কনস্যুলেটের সাথে দেখা করে কিছু আলোচনা করে। উক্ত আরব কূটনৈতিক অতিদ্রুত আপন দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের কাছে কথাগুলো পৌছে দেন। উক্ত আরব কনস্যুলেটের কথা শুনে মনে হল, স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফিসার ঘটনাক্রমে আমেরিকার স্বার্থ বিরোধী কথা বলে ফেলেছে। বুঝতে ভুল করেছে ফলে তাকেও কিছুও ভুল কথা বলে ফেলেছে। তাকে যা বলা হয়েছিল সে সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হয়নি। যা হোক স্টেট ডিপার্টমেন্টের জন্য উচ্চকক্ষের জন্য খুবই পেরেশানি দেখা দিল।

কিভাবে তাদের অবস্থান সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়া হল! এতে স্টেট ডিপার্টমেন্টের অফিসারের যোগ্যতাও সকলের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হল। আশ্চর্যের কথা হল সি.আই.এর কর্মতৎপরতাও অন্যান্য এজেন্সি মনিটরিং করে।

ভুলক্রমে যদি কোন তথ্য অপরের হাতে পৌছে যায় তখন খোদ সরকারের মাঝেই ঝগড়া-বায়ু শুরু হয়ে যায়। বিশেষ করে যখন সব থেকে নাজুক পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ে আলোচনা চলছিল। যাতে পরিচালনা পর্ষদ খুব চিন্তাভাবনা করে গোপনে আতাত করতে সক্ষম হয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে প্রাইভেট হাউসের সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবে এমন হয় যে, NSA কে বিশেষ দিক-নির্দেশনা দেয়া হয় যে, তথ্য একমাত্র পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা তার সমপর্যায়ের কর্মকর্তাকে জানানো যাবে যাতে পরিপূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা সম্ভব হয়। ফেডারেল ব্যুরো অব ইন্ভেস্টিগেশন

F.B.I ও N.S.A এর মত ওয়াশিংটনে অবস্থিত সকল দূতাবাসের ফোনালাপ রেকর্ড করে। এর মধ্যে আমেরিকানদের তথ্যও থাকে। F.B.I এর এজেন্ট CHESAPEAKE AND POTAMAC TELEPHONE COMNAY

এর সাহায্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফোনালাপ রেকর্ড করে। বিশেষত যখন কোন রাষ্ট্র আমেরিকা সম্বন্ধীয় কোন কথা বলে তা খুব গুরুত্বের সাথে রেকর্ড করা হয় অথবা সে দেশের কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা হলেও তা রেকর্ড রাখা হয়।

গুপ্ত জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য করে বিদেশী দূতাবাসের ফোনালাপ রেকর্ড করা বৈধ। এক্ষেত্রে F.B.I কে স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে অনুমোদন আনতে হয়।

যেহেতু স্টেট ডিপার্টমেন্ট F.B.I কে একথা বলে রেখেছে যে, সর্বদা তারা রেকর্ডের জন্য যন্ত্র প্রস্তুত রাখতে পারে। সে হিসাবে বলা যায় যে, সে সর্বদা রেকর্ড করার অনুমতি দেয়।

রেকর্ড করা এসব কথার ক্ষেত্রে এটা লেখা হয় না যে, এটা ওয়ার টেম্পের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বরং এটা লেখা হয় যে, এগুলো এমন যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছে যা পূর্বে নির্ভরযোগ্য ছিল।

সি.আই.এর যোগাযোগ ক্লার্ক আমেরিকান দূতাবাস ও ওয়াশিংটনের সকল তথ্যের রেকর্ড স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও সি.আই.এর কাছে রাখে। প্রত্যেক দূতাবাসে গোয়েন্দা সংস্থার জন্য ভিন্য একটি কোড রুম তৈরী করা ব্যয়বহুল বিধায় সিআইএর এক কর্মকর্তাকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের পরিচলনা কমিটির মধ্যে নিযুক্ত করা হয়। সে স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তার বেশে সিআইএর যোগাযোগে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের পর্যবেক্ষণ করে। যদিও নীতিগতভাবে কোন যোগাযোগ স্থাপনকারী ক্লার্কের এ কাজ নয় যে, সে স্টেটের কোড খবরগুলো পড়বে। কিন্তু যে কোন কোড ক্লার্ক আপন চাকরিকে সফল বানাতে চায় সে খুব দ্রুত জেনে যায় যে, তার প্রোমিশন সি.আই.এর হাতে। তাই সে স্থানীয় চীফ স্টেটকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে।

দীর্ঘদিন যাবত স্টেট ডিপার্টমেন্ট এ কথা জেনে আসছে যে, তাদের কোন অতি গোপনীয় তথ্যও সিআইএর থেকে নিরাপদ নয়। তবে তাদের সান্তনার বানী হল, সিআইএ তা পড়বে না।

১৯৬৮ সাল। যখন ইরানে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত অ্যারমন মেয়র ও ইরানে সি.আই.এর স্টেশন চীফের মাঝে ঝামেলা হল তখন মেয়র ওয়াশিংটনে স্টেট ডিপার্টমেন্টে নিরাপত্তা মাধ্যমগুলো একটির মাধ্যমে তথ্য পাঠাল যাকে “রোজার” বলে। কিন্তু সি.আই.এ এমন এক পস্থা অবলম্বন করল যে, তারা সকল তথ্য ও ওয়াশিংটন থেকে প্রেরিত জবাবের উদ্ধার করতে সক্ষম হলেন।

সি.আই.এর ডাইরেক্টরের কাছে তার নকল পৌঁছে গেল। যার উপরে এই সতর্কবানী লেখা ছিল যে, বিষয়টি যেন গোপন থাকে। কেননা স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানে না যে এটার নকল সি.আই.কে দেয়া হয়েছে। প্রযুক্তির অবদানে বর্তমানে সব থেকে অত্যাধুনিক গুপ্তচরবৃত্তি পদ্ধতি হল কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে শূন্য থেকে ভূপৃষ্ঠের ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করা এবং বৈদ্যুতিক পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য আহরণ করা। এর অধিকাংশ উপগ্রহ উত্তর দক্ষিণ কক্ষপথে ঘূর্ণয়মান। কেননা রাশিয়া ও চীন তাদের প্রধান টার্গেট। এগুলো খুব দ্রুত ভূপৃষ্ঠের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। পরবর্তীতে উৎক্ষেপিত উপগ্রহগুলোও আপন আপন কক্ষপথে চলছে।

সকল কৃত্রিম উপগ্রহ NATIONAL RECONNAISSANCE OFFICE (NRO) এর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রনে চালানো হয়। এটা বিমান বাহিনীর অফিসেরই একটি অংশ।

NRO একাজে বাৎসরিক দশ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। ফান্ডের ব্যবস্থা মূলত প্রতিরক্ষা অধিদপ্তর করে থাকে। ফান্ড খরচ করার নীতি ও পদ্ধতি তৈরী করে COMMITTEE FOR RECONAISANCE EXECUTIVE.

এ কমিটিতে রয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্টেট সেক্রেটারী ফর ইন্টেলিজেন্স গোয়েন্দা সংস্থার কেন্দ্রীয় ডাইরেক্টর। জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক কাউন্সিলের সেক্রেটারী অফিসার। কৃত্রিম উপগ্রহের দ্বারা তথ্য সংগ্রহের প্রোগ্রাম সেট করে আমেরিকার গোয়েন্দা বোর্ড। যার প্রধান হলেন গোয়েন্দা সংস্থার ডাইরেক্টর এবং অন্যান্য এজেন্সির প্রধানরা।

গোয়েন্দা বোর্ডের এক বিশেষ কমিটি প্রতিটি উপগ্রহ থেকে তথ্য সংগ্রহ কার্য নির্ধারণ করে থাকে।

উপগ্রহগুলোর ক্যামেরার মধ্যে এমন শক্তিশালী লেন্স লাগানো হয় যা বহুদূর থেকে প্রতিটি বস্তুকে সুস্পষ্ট করে ধারণ করতে সক্ষম। কয়েক বছর যাবত এই ফটোগ্রাফীর কৃত্রিম উপগ্রহ চীন ও রাশিয়ার সামরিক প্রস্তুতি ও অন্যান্য সামরিক বিষয়ের তথ্য সরবরাহ করছে। এই উপগ্রহগুলো দরিদ্র/দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে তেমন একটা ব্যবহার করা হয় না। তবে বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলে ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ পাকিস্তানের পরমানু প্রোগ্রাম, আরব ইসরাইলের যুদ্ধ, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক ইত্যাদি।

কিছু বিশেষ প্রয়োজনে কৃত্রিম উপগ্রহগুলোতে রঙ্গিন ফটো তোলার ক্যামেরা ব্যবহার করা হয় এবং INFRAREO রশ্মির মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠ থেকে উদগত উষ্ণতা পরিমাপক যন্ত্র লাগানো থাকে, যাতে এ বিষয়ে অবগতি লাভ করা যায়

যে, এ এলাকা কার দখলে, এখানে কাজ করার কতটা সুযোগ আছে? এমনও অনেক কৃত্রিম উপগ্রহ আছে যাতে টেলিভিশনের ক্যামেরা স্থাপিত। যাতে অতিদ্রুত কর্মরত দক্ষ বিজ্ঞানীদের কাছে ফলাফল পৌঁছাতে সক্ষম হয়। তাদের কাজ হল এগুলো পড়া এবং ফিল্মগুলো বিশ্লেষণ করা। এতে আমেরিকা বহুত উপকার লাভ করেছে।

আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থার কাছে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যতীত শূন্য থেকে তথ্য সরবরাহ করার জন্য আরেক প্রকার উপ-গ্রহের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে যার মধ্যে ইলেক্ট্রনিক অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করে নানান কাজ নেয়া হয়। এগুলো মিসাইলের প্রোগ্রাম, রাডার ও অন্যান্য শক্তিশালী ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের সংখ্যা ও তথ্য সরবরাহ করে।

কখনও এসব ইলেক্ট্রনিক কৃত্রিম উপগ্রহের সম্পর্ক ভূপৃষ্ঠের কোন স্টেশনের সাথে হয়ে থাকে। আমেরিকা বা কোন বন্ধুরাষ্ট্রেও তা স্থাপন করা হয়। যেখান থেকে উপগ্রহটিকে টার্গেটের প্রতি পরিচালিত করা হয়। এবং তা থেকে সংগ্রহীত তথ্য ও সংখ্যা একত্র করে সরাসরি ওয়াশিংটনের গোয়েন্দা হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহ ১৯৬০ সাল থেকে ব্যবহার শুরু হয়। এর আগে হাওয়াই জাহাজই একাঙ্গে অনেক মূল্যবান সম্পদ মনে করা হত। এর দ্বারা NSA এর তথ্যের সাথে আরো তথ্য প্লাস হতে থাকে। কেননা তখন NSA আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থাকে সব থেকে ভাল তথ্য সরবরাহ করে।

স্যাটেলাইটের অবদানে আজ পূর্বের সব ধীরগতি ও দুর্বল পদ্ধতি একেজো বা কম ফলদায়ক সাব্যস্ত হয়েছে। পূর্বের পদ্ধতিগুলোর প্রয়োজন তুলনামূলক কমে গেছে। তবে স্যাটেলাইটের তথ্য যে একেবারে নির্ভুল হয় তা নয়। কেননা যন্ত্র কখনও অকাট্য তথ্য দিতে পারে না। যান্ত্রিক ত্রুটি বা আবহাওয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে এগুলি একেবারে নির্ভুল তথ্য দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে। যান্ত্রিক পদ্ধতি গোয়েন্দাগীরির পথে যতই উন্নতি আনুক না কেন তা একটি স্তর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। সামরিক তৎপরতা, শত্রুদের গতিবিধি, মিসাইল এর সংখ্যার তথ্য দিতে পারলেও এগুলো কোথায়, কেন, কখন ব্যবহার করা হবে তা বলতে পারেনা। পারেনা আরো অনেক কিছুর খবরদিতে।

১৯৬৮ সালে যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়ার সামরিক প্রস্তুতি আমেরিকার সামনে স্পষ্ট ছিল। কিন্তু তাদের কাছে এ তথ্য ছিলনা যে, প্রকৃতপক্ষে হামলা হবে কিনা? এধরনের তথ্য স্টেশনে বসে থাকা যে কোন ব্যক্তিই দিতে পারে। তবে প্রকৃত হামলার খবর কে দিবে? আমেরিকার এমন কোন লোক ছিল না বা

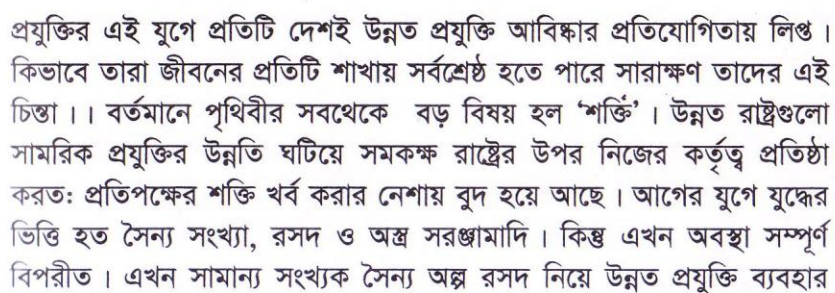
সি.আই.এর কোন ব্যক্তিকেও শত্রুদের মধ্যে ঢুকিয়ে তথ্য সংগ্রহের কোন সুযোগ ছিল না।

আমেরিকা জানত যে, ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু প্রকৃত খবর জানা ছিলনা। গোয়েন্দাদের প্রত্যক্ষ তথ্য সরবরাহ ছিল তাদের স্বাস্থ্য লাভের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু তা ছিল অনেক সময়ের ব্যাপার।

কৃত্রিম উপগ্রহ ও গোপন নজরদারি পদ্ধতি

যখন থেকে মানুষ নভচরণযুগে প্রবেশ করেছে তখন থেকেই নানানসব নিত্য নতুন আবিষ্কার ও গবেষণা সামনে আসছে। চন্দ্র অভিযানের পর মঙ্গল, বুধ ও শনির পালা এসেছে। নিঃসন্দেহে আধুনিক যুগ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আবিষ্কারের যুগ। আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা দিয়ে মানুষ অবাককরা আবিষ্কার করে চলেছে। এ কৃত্রিম উপগ্রহগুলো রেডিও টেলিভিশনের প্রোগ্রামগুলোকে দূরদূরান্তে পৌঁছে দিয়েছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে একে অপরকে একেবারে কাছে এনে ছেড়েছে। যদিও সে হাজার মাইল দূরে।

নভমণ্ডলীয় প্রোগ্রাম সমূহে ঠিক তখন থেকেই উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যখন শীতলযুদ্ধের (Cold War) যুগে আমেরিকা ও রাশিয়া এ বিষয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিল। বিশ্ববাসী ধারণা করে রেখেছিল যে, এ ময়দানে এ দুটি দেশের কর্তৃত্বই বহাল থাকেবে। তবে প্রত্যেক কাজে যেমন ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকের চিন্তা করা হয় ঠিক এবিষয়েও পরাশক্তিগুলো উভয় দিক গবেষণা শুরু করল। এখনকার অবস্থা হল, আমেরিকা ও অন্যান্য পরাশক্তিগুলো নভমণ্ডলে কৃত্রিম উপগ্রহ ছেড়ে রেখেছে। যার মাধ্যমে তারা গোটা বিশ্বের উপর নজরদারী করছে। এখন প্রত্যেক দেশের জন্য এটা জানা অত্যাৱশ্যক হয়ে গেছে যে, কবে, কখন আমাদের দেশের উপর দিয়ে গুপ্তচর এই কৃত্রিম উপগ্রহ অতিক্রম করবে? ভারত এমন সময় এটম বোমা পরীক্ষা করেছিল যখন তার আকাশ দিয়ে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রদক্ষিণ করতছিল। যার কারণে আমেরিকা বা অন্যান্য দেশ তা সহজেই জেনে গেছে। যে সব দেশ সফলভাবে এই কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করে গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে আমেরিকা ও রাশিয়া অন্যতম। এ কারণে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কয়েকগুন আশংকায়ুক্ত হয়ে পড়েছে।



করে ভারীদলের উপর বিজয় লাভ করেছে। গোটা বিশ্বে এর প্রমাণ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। সবথেকে বড় উদাহরণ হল ইসরাঈল ও আরব রাষ্ট্রগুলো। ইসরাইল সৈন্য সংখ্যা আরব রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় অনেক কম। কিন্তু তার অত্যাধুনিক যুদ্ধ-সরঞ্জাম বড় বড় বিজয় এনে দিয়েছে। এ কারণে তারা আরব রাষ্ট্রগুলোতে জোরপূর্বক ভূমি দখল করে বাসস্থান তৈরী করেছে। এটাকেই প্রবাদ বাক্যে বলা হয় “যার লাঠি তার মহিম”।

প্রযুক্তির উৎকর্ষের এ যুগে সফলতা বা ব্যর্থতার ভিত্তি হল ‘গোয়েন্দাগিরি এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ব্যবহার করা।’ শত্রু সেনাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা, সঠিক সংখ্যা ও অস্ত্রের সক্ষমতা জানা ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ধরনের মূল্যবান তথ্য আহরনের জন্য বর্তমানে গুপ্তচরবৃত্তিকে যুদ্ধ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসাবে ধরা হয়। একারণেই বর্তমান যুগে উন্নত থেকে উন্নততর এবং অত্যাধুনিক আবিষ্কারের পিছনে গোটা বিশ্ব মরিয়া হয়ে ছুটছে।

নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির আলোচনা করা হল—

স্টেলথ টেকনোলজি (STEALTH TECHNOLOGI)

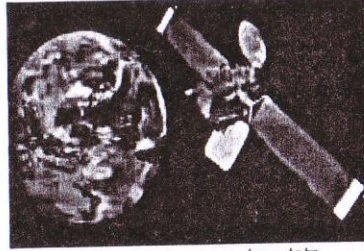
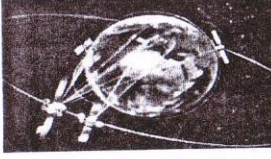
“শত্রুকে দেখ কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করনা” এই মূলনীতির উপর এমন সব অত্যাধুনিক বিমান আবিষ্কৃত হয়েছে যে, শত্রুর মাথার উপর দিয়ে উড়া সত্ত্বেও রাডারে তা ধরা পড়ে না। স্টেলথ টেকনোলজি এ মূলনীতির উপরই কাজ করে। এ টেকনোলজির অনেক বিমান তৈরী হয়েছে। এমনকি জল ও স্থলের বিভিন্ন ট্রাফিকে এটা ব্যবহৃত হয়। আকাশ থেকে গুপ্তচরবৃত্তি করাসহ জল ও স্থলেও এর দ্বারা গুপ্তচরবৃত্তি করা যায়। আমেরিকা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করেই আফগানিস্তানে বিমানের মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তি করেছিল।

আকাশ থেকে নজরদারি

বর্তমান যুগে (Space Technology) বিদ্যা অনেক গুরুত্ব বহন করে। প্রতিটি দেশই এ বিষয়ে সম্যক অবগত যে, পৃথিবীর পরাশক্তিগুলো আপন স্বার্থ হাসিলের জন্য আকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ ছেড়ে রেখেছে। উপগ্রহগুলো পৃথিবীর চার পাশ দিয়ে প্রদক্ষিণ করে এবং শত্রুদেশের নির্দিষ্ট জায়গার উপর নজরদারী করে তথ্য সংগ্রহ করে। এই গুপ্তচর কৃত্রিম উপগ্রহ শত্রু দেশের গোয়েন্দাগিরি পদ্ধতি জানার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অবদান রেখেছে। Space Technology এর মাধ্যমে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সেসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুব সহজেই সংগ্রহ করতে সক্ষম, জমিনে বিচরণ করে তা সংগ্রহ করতে হলে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার

প্রয়োজন হত। এজন্য রাশিয়া, আমেরিকা, চীন স্যাটেলাইট টেকনোলজি বিষয়ে গবেষণার জন্য অগনিত অর্থ ব্যয় করে থাকে। শুধু নাসা গোয়েন্দা উপগ্রহ অকেজো করার নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের পিছনে প্রতি বছর ৫০ হাজার মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে।

স্যাটেলাইট



স্যাটেলাইট হলো মহাকাশে উৎক্ষেপিত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত উপগ্রহ। স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গার খবর আমরা নিমেষেই পেয়ে যাই। স্যাটেলাইটের রকেট বা স্পেস শার্টলের কার্গো বে-এর মাধ্যমে কক্ষপথে পাঠানো হয়। পাঠানোর সময় রকেট নিয়ন্ত্রনের জন্য ব্যবহৃত হয় ইনার্শিয়াল গাইডেন্স সিস্টেম (আই.জি.এস) মেকানিক।

পৃথিবীর অভিকর্ষ পার হতে রকেটকে ঘন্টায় ২৫ হাজার ৩৯ মাইল গতিতে ছুটতে হয়। স্যাটেলাইট স্থাপনের সময় কক্ষীয় গতি ও তার জড়তার ওপর পৃথিবীর অভিকর্ষের যে, প্রভাব রয়েছে এর জন্য সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারলে স্যাটেলাইটের এ অভিকর্ষের টানে ফের ভূপৃষ্ঠে চলে আসতে পারে। এজন্য স্যাটেলাইটের ১৫০ মাইল উচ্চতাবিশিষ্ট কক্ষপথ প্রতি ঘন্টায় প্রায় ১৭ মাইল গতিতে পরিভ্রমণ করানো হয়। মূলত গতিবেগ কত হবে তা নির্ভর করে স্যাটেলাইটটি পৃথিবী থেকে কত উচ্চতায় রয়েছে, তার ওপর। পৃথিবী থেকে ২২ হাজার ২২৩ মাইল উপরে স্থাপিত স্যাটেলাইট ঘন্টায় ৭০০ মাইল বেগে পৃথিবীকে অতিক্রম করে। পৃথিবীর সঙ্গে স্যাটেলাইটও ২৪ ঘন্টা ঘুরে। তবে ভূ-স্থির বা জিও স্টেশনারি উপগ্রহগুলো এক জায়গাতেই থাকে। এগুলো আবহাওয়া ও যোগাযোগ সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর কক্ষপথে স্যাটেলাইট উপবৃত্তাকার পথে ঘুরে। সাধারণত ৮০০-১২০০ হাজার মাইল উচ্চতা বিশিষ্ট কক্ষে পথে বিভিন্ন ধরনের স্যাটেলাইট পাঠানো হয়। কাজের ধরনের উপর নির্ভর করে স্যাটেলাইটটি কত উচ্চতায় বসবে। যেমন উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গবেষণা, বন্যপ্রাণীর চরে বেড়ানো পর্যবেক্ষণ, আর্সেট্রোনমি এবং

পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করার জন্য সায়েন্স স্যাটেলাইটকে বসানো হয় ৩ হাজার থেকে ৬ হাজার মাইল উচ্চতায়। আবার গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জি.পি.এস) স্যাটেলাইট স্থাপন করা হয় ৬ হাজার থেকে ১২ হাজার মাইল উচ্চতায় এক এক ধরনের স্যাটেলাইটের বৈশিষ্ট্য ও গঠন প্রণালী একেক রকম। তবে সব স্যাটেলাইটের মধ্যে সাধারণ কিছু মিল আছে।

স্যাটেলাইটের শরীর ধাতু সংকরের ফ্রেম দিয়ে তৈরী। এক বলে বাস। এতেই স্যাটেলাইটের সব যন্ত্রপাতি থাকে। প্রত্যেক স্যাটেলাইটে থাকে সোলার সেল এবং শক্তি জমা রাখার জন্য ব্যাটারি। এর পাওয়ার সিস্টেম প্রসেসকে পৃথিবী থেকে সবসময় মনিটরিং করা হয়। স্যাটেলাইটে একটি আনবোর্ড কম্পিউটার থাকে। যা একে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিভিন্ন সিস্টেমকে মনিটর করে। স্যাটেলাইটের আরেকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল এর রেডিও সিস্টেম ও অ্যান্টেনা।

স্যাটেলাইটের ইতিহাস

কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশ ভ্রমণের ইতিহাস খুব একটা পুরানো নয়। বলতে গেলে একেবারেই নতুন। পাঠক জেনে অবাক হবেন যে, মহাকাশ যাত্রার প্রথম পদক্ষেপটির সূচনা হয়েছিল ১৯৫৭ সালে ৪ অক্টোবর। এ যাত্রার সূচনা করে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন। তারা স্পুটনিক-১ নামক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে। স্পুটনিক শব্দের অর্থ হল ভ্রমণসঙ্গী। একই বছরে ২ নভেম্বর স্পুটনিক-২ নামক আরেকটি উপগ্রহ তারা মহাকাশে পাঠায়। প্রথম মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহের নাম এক্সপ্লোরার-১। ১৯৫৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এটাকে মহাকাশে পাঠানো হয়। ভিস্টা-১ নামক সোভিয়েত কৃত্রিম উপগ্রহ মানুষ নিয়ে প্রথম পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। লোকটির নাম ছিল ইউরি গ্যাগারিন। সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল ভিস্টা-১ এ চড়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন। ১৯৬৩ সালে সোভিয়েত নারী ভেলেন্তিনা তেরেসকোভা স্টক-৬ নামক কৃত্রিম উপগ্রহে চড়ে {ভেলেন্তিনা তেরেসকোভা} মহাকাশে ঘুরে আসেন। ইন্টেলসেট-১ কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয় যোগাযোগ উপগ্রহ হিসেবে। রিমোটসেনসিং বা দূর অনুধাবনের জন্য পাঠানো প্রথম উপগ্রহের নাম ল্যান্ডসেট-১। ১৯৭২ সালে তা পাঠানো হয়। আন্তর্জাতিক যোগসূত্র স্থাপনের জন্য অ্যাপোলো সুয়োজ টেস্ট প্রজেক্ট নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয় ১৯৭৫ সালে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এ পর্যন্ত প্রায় সহস্রাধিক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে। মাত্র কয়েকশত কৃত্রিম উপগ্রহ বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হাজার হাজার অব্যবহৃত কৃত্রিম উপগ্রহ বা তার অংশবিশেষ মহাকাশে ধ্বংসাবশেষ হিসেবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

স্যাটেলাইটের কক্ষপথ

মহাকাশে স্যাটেলাইটগুলো যে ডিম্বাকার পথে ঘুরতে থাকে সে পথকে বলা হয় অরবিট বা কক্ষপথ। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা অনুসারে এই অরবিটটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। ১. নিম্ন কক্ষপথ, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ১২৪০ মাইল বা ২০০০ কিলোমিটার। ২. মধ্য কক্ষপথ, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ২০০০ কিলোমিটার থেকে ৩৬৭৮৬ কিলোমিটার পর্যন্ত। ৩. উচ্চকক্ষপথ, ভূপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৩৫৭৮৬ কিলোমিটার থেকে অসীম।

স্যাটেলাইটের প্রকারভেদ

নির্দিষ্ট কাজের ভিত্তিতে স্যাটেলাইটকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়।

ওয়েদার স্যাটেলাইটঃ

এটা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে পৃথিবীর আবহাওয়া সংক্রান্ত ফটো ধারণ করা হয়। যেমন. TIROS COSMOS এবং GEOS স্যাটেলাইট

কম্যুনিকেশন স্যাটেলাইটঃ এর মাধ্যমে সিগন্যাল বা তথ্যের আদান প্রদান করা হয়। ব্রডকাস্টিং স্যাটেলাইটও এর অন্তর্ভুক্ত। এক স্পেস কম্যুনিকেশনও বলে। এতে একটি অ্যান্টেনা সিস্টেম, একটি ট্রান্সমিটার তথা প্রেরকযন্ত্র, পাওয়ার সাপ্লাই ও রিসিভার তথা গ্রাহক যন্ত্র থাকে। এই সিস্টেমে আর্থ স্টেশন ট্রান্সমিটার থেকে মডুলেটেড মাইক্রোওয়েভ তথা সিগন্যাল ও উচ্চ কমপাক্টের বহনকারী তরঙ্গ পাঠানো হয় স্যাটেলাইটে। স্যাটেলাইট সেই মডুলেটেড ওয়েভকে বর্ধিত করে পৃথিবীতে স্থাপিত গ্রাহক স্টেশনে পাঠিয়ে দেয়।

জিওস্টেশনারী অরবিটে জিওস্টেশনারী স্যাটেলাইট

কোন স্যাটেলাইট যদি ৩৫৭৮৬ কিলোমিটার উচ্চতায় স্থাপিত হয় তখন স্যাটেলাইটটি পৃথিবীর সাথে সমবেগে আবর্তন করে অর্থাৎ স্যাটেলাইটটি এমনভাবে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে যেন পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরতে ২৪ ঘন্টা সময় লাগে। তাই পৃথিবীর সাপেক্ষে স্যাটেলাইটটিকে স্থির মনে হবে। তখন এ ধরনের স্যাটেলাইটকে বলা হয় ভূস্থির উপগ্রহ। আর এ কক্ষপথকে বলা হয় জিও স্টেশনারী অরবিস্ট বা ভূ-স্থির কক্ষপথ। এই কক্ষপথ কম্যুনিকেশনের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। কিন্তু এ কক্ষপথেরও একটি অসুবিধা আছে। তা হলো এ কক্ষপথে স্থাপিত একটি কম্যুনিকেশন স্যাটেলাইট সমগ্র পৃথিবীকে কভার করতে পারেনা পৃথিবীর বক্রতার কারণে। সমগ্র পৃথিবীকে কভার করতে হলে এই কক্ষপথে তিনটি স্যাটেলাইট স্থাপণ করতে হয়। যদি তিনটি স্যাটেলাইট পরস্পর থেকে ১২০ ডিগ্রি কোণে জিও স্টেশনারী অরবিটে অবস্থান করে তাহলে একই সাথে সমগ্র পৃথিবীকে কভার করা সম্ভব।

ন্যাভিগেশন স্যাটেলাইটঃ

এই স্যাটেলাইট বিমান ও সমুদ্রগামী জাহাজ ডিটেক্ট ও ন্যাভগেট তথা পথ নির্দেশনা করতে ব্যবহার করা হয়। যেমন, GPS NAVSTAR স্যাটেলাইট। এর জিপিএস হল স্যাটেলাইট ভিত্তিক নেভিগেশন সিস্টেম। জিপিএস সিস্টেম এমন একটি নেটওয়ার্ক যা ২৪টি স্যাটেলাইট নিয়ে গঠিত। যা নিরবিচ্ছিন্নভাবে তথ্য ও পৃথিবীর যে কোন অবস্থানের ছবি পাঠাতে সক্ষম যে কোন সময়ে, যে কোন অবহাওয়ায়।

আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইটঃ

এই স্যাটেলাইট পৃথিবী পৃষ্ঠে নিরীক্ষন করতে ও পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের ছবি তুলতে ব্যবহার করা হয়।

মিলিটারী স্যাটেলাইটঃ

এটা শুধু সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এর মূল কাজ হল নিউক্লিয়ার মনিটরিং, রাডার ইমেজিং, ফটোগ্রাফি ও শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ।

মহাকাশে স্যাটেলাইটের সংখ্যা

সর্বপ্রথম মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৫৭ সালে স্পুটনিক-পিএসরকেটের সাহায্যে স্পুটনি-১ স্যাটেলাইট। এরপর যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য রাষ্ট্রও পাঠাতে সক্ষম হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৫০টিরও বেশী দেশ থেকে কয়েক হাজার স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপন করা হয়েছে। তবে পৃথিবীর মাত্র ১০টি দেশ নিজস্ব প্রযুক্তিকে এবং নিজস্ব উৎক্ষেপনকেন্দ্র থেকে মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন করতে সক্ষম হয়েছে। দেশগুলো হল সোভিয়েত ইউনিয়ন (১৯৭০) যুক্তরাষ্ট্র (১৯৭১) ভারত (১৯৮০) জাপান (১৯৭০) চীন (১৯৭১) যুক্তরাজ্য (১৯৭১) ভারত (১৯৮০) ইসরাইল (১৯৮৮) ইউক্রেন (১৯৯২) ইরান (২০০৯) বর্তমানে মহাকাশে ঘূর্ণিমান স্যাটেলাইটের সংখ্যা ১০৭১ টি। এর ৫০ ভাগ উৎক্ষেপন করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আশার কথা হল, বাংলাদেশও স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন করতে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের স্পেস পার্টনার শিপ ইন্টারন্যাশনাল (এসপিআই) কোম্পানিকে পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এসপিআই এর কাজ হল, স্যাটেলাইট ডিজাইন ও এটির নির্মাণ কাজ তদারকী করা। গ্রাউন্ড স্টেশন তৈরী করে বাংলাদেশিদের প্রশিক্ষণ দেয়া ও কৃত্রিম উপগ্রহটি উৎক্ষেপনে সহায়তা করা। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে সফল

হলে টেলিফোন যোগাযোগ, টিভি, ও বেতার সম্প্রচারের মত কাজগুলো এই উপগ্রহ দিয়ে করা সম্ভব হবে এখন যা করা হচ্ছে অন্যদেশের ভাড়া করা উপগ্রহের মাধ্যমে। ভাড়া দিতে হচ্ছে ৪০ লাখ ডলার। বার্ষিক ৪০ হাজার ডলার। নিজস্ব উপগ্রহ উৎক্ষেপন সম্পন্ন হলে অন্যদেশকে ভাড়া দেয়া তো দূরের কথা বরং অন্যদের কাছে ভাড়া দিয়ে উপার্জন করা যাবে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা।

ড্রোন



মনুষ্যবিহীন যুদ্ধবিমান, যা যুদ্ধড্রোন বা ড্রোন হিসেবে পরিচিত। এক ধরনের মানুষবিহীন আকাশযান। এতে কোন চালকের প্রয়োজন হয় না।

এতে সংবেদনশীল যন্ত্র ও ক্যামেরা থাকে। ঐ ক্যামেরার মাধ্যমে গৃহীত ভিডিও চিত্র ভূমি থেকে বিমান নিয়ন্ত্রনকারী অপারেটরের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। আকাশ সীমায় পাহারা দেয়া, আবহাওয়া পর্যবেক্ষন, শত্রুদের বেতার ও রাডার সিস্টেমে ব্যাঘাত ঘটানো, আড়ি পেতে তথ্য যোগাড় করা থেকে শুরু করে প্রয়োজনে আরো ভূমিকা পালন করতে পারে এ বিমান।

এসব বিমান পাইলটবিহীন হওয়ায় পাইলটের মৃত্যুবুঝি থাকে না। তাই যে কোন পরিস্থিতিতে এ বিমান ব্যবহার করা যায়। পাইলট না থাকায় এতে ককপিট, অক্সিজেন সাপ্লাইসহ অনেক কিছুর প্রয়োজন হয় না। ফলে এতে অধিক অস্ত্র বহন করা যায়। ড্রোন ব্যবহার এখনো পর্যন্ত শুধু মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মুসলিম স্বাধীনতাকামী মাজলুম ব্যক্তিদেরকে সম্ভ্রাসী আখ্যা দিয়ে অব্যাহতভাবে আমেরিকাসহ নানান রাষ্ট্র মানবতার বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে।

যে সব দেশ বর্তমানে ড্রোন ব্যবহার করে তাদের মধ্যে আজারবাইজান, বোতসোয়ানা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, চিলি, চীন, সাইপ্রাস, মিশর, ফ্রান্স, জার্মান, জর্জিয়া, ইন্ডিয়া, ইরান, ইসরাইল, ইটালি, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস্, উত্তরকোরিয়া, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, রাশিয়া, স্পেন, তাইওয়ান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য অন্যতম।

ডেটা ইনফরমেশন

কিছুদিন পূর্ব থেকেই পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর আকৃতি সংগ্রহের একটি পদ্ধতি চালু হয়েছে। যা আন্তে আন্তে বৃহদাকার ধারণ করেছে। বাহ্যিকভাবে শিরোনামটি অনেক প্রভাবক, উপকারী ও প্রয়োজনীয় মনে হয়। যেমন: জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে স্বদেশের বাসিন্দাদের আকৃতি সংরক্ষণ করা। যেহেতু গোটা বিশ্বে বসবাসরত সকল মানুষের নাম, ঠিকানা, ছবি এবং আঙ্গুলের চাপ কোন না কোন জায়গায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। তাই কারো সম্পর্কে জানতে হলে এক টিপে তার বিস্তারিত তথ্য জানা সম্ভব। বলা হয়, এগুলো জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে করা হচ্ছে। মূলত টার্গেট নজরদারি। এজন্যই ‘নাদরা’ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অতি অল্প সময়ে এমন অবস্থা হবে যে কেউই নজরদারির বাইরে থাকতে পারবে না। সে যেখানেই থাক এক অদৃশ্য নজরদারির আওতায় পড়ে যাবে।

বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করার জন্য ইতোমধ্যে অনেক ডেটা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যার কাজ হল বিভিন্ন পণ্যের গ্রাহক, ব্যবহারকারীর নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার ও ইমেইল এড্রেস সরবরাহ করা।

নিজের কারবারকে স্বচ্ছ প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো এ সকল সার্ভে কোম্পানির ছক অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে। একে “কনজুমার সার্ভে” বলে। এভাবে হেলথ সার্ভে ও অন্যান্য সার্ভে প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব লাভ করেছে। ফলে এসব তথ্য সরাসরি ব্রাসেলসে পৌঁছে যায়। প্রিয় পাঠক! আপনার দৃষ্টিতে হয়ত কয়েকবার এধরনের সার্ভে ফরম পড়েছে। কিন্তু আপনি তাকে সাধারণ বিষয় মনে করে এড়িয়ে গেছেন। কেননা সাধারণত সামাজিক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ অবস্থান এ কাজগুলোকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা থেকে বিরত রাখে। তাই আপনি তাকে সাধারণ বিষয় মনে করে থাকেন। অথচ আপনি যাকে সাধারণ, তাই মনে করে সন্দেহ করেননি সে-ই আপনার তথ্য অন্যের কাছে সরবরাহ করছে।

যখন কোন ব্যক্তি বড় কোন স্টোরে প্রবেশ করে যেমন. এস্‌ড, টেসকো, সেঞ্জুরি ইত্যাদি শপিংমলে কেনাকাটার জন্য যায় তখন তাকে একটি লয়ালিটি কার্ড প্রদান করা হয়। যা আপনাকে ডিসকাউন্ট দেয়। এই কার্ডে আপনার কেনাকাটাসহ যাবতীয় তথ্য সংরক্ষিত হয়। যেমন ঠিকানা, ফোন নাম্বার, যা কেনাকাটা করেছেন তার নাম, যে ব্রাণ্ড পছন্দ করেছেন তার নাম ইত্যাদি ইত্যাদি। উক্ত শপিংমলে ক্রেতার সকল অঙ্গভঙ্গি ক্যামেরায় সংরক্ষিত থাকে। এই ক্যামেরার মাধ্যমে ক্রেতার পছন্দ অপছন্দও জানা যায়। কোন পণ্যটি ক্রেতা দেখা মাত্র হাতে তুলে দেখেছে আর কোনটি হাতেই তোলেনি, কোনটি ধরতে

ইতস্ততবোধ করেছে, কোনটি অপছন্দ হওয়ার কারনে অন্যটির দিকে হাত বাড়িয়েছে সব সংরক্ষিত করা হয়ে থাকে। সর্বশেষ ঐ কার্ডের তথ্যগুলো কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়। পশ্চিমা দেশগুলো প্রাচ্যের বাসিন্দাদের ডেটা তথ্য সংগ্রহ করার একটি অন্যতম মাধ্যম হল N.G.O (এনজিও) গুলো।

নজরদারি ক্যামেরা



গোটা বিশ্বে নজরদারির জন্য বিভিন্ন জায়গায় ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। এবং খুব দ্রুতগতিতে তা সর্বত্র বিস্তার লাভ করছে। বড় বড় রোড, চৌরাস্তা ইত্যাদিতে ক্যামেরার মেলা বসেছে। স্বাভাবিক ভাবে এত ক্যামেরা ব্যবহারের ফলাফল এটাই মনে করা হয় যে, এর দ্বারা অপরাধী সনাক্ত কাজে সহায়তা মিলবে, জনগনের জান-মাল সংরক্ষণ সহজ হবে, অযাচিত ড্রাইভিংয়ে বাধা প্রদান করা যাবে। কিন্তু এগুলোর মূল উদ্দেশ্য এটা নয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, নজরদারি করা। ঠিক এই উদ্দেশ্যেই পৃথিবীর দ্বিগুণে কৃত্রিম উপগ্রহ (স্যাটেলাইট) স্থাপন করা হয়েছে। স্যাটেলাইট আপন ক্যামেরার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের এক এক বর্গগজ জায়গার ছবি তুলে তার মধ্যে একটি সুই থাকলেও তা খুঁজে বের করে ফেলে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এটা ঘরের মধ্যে কি হচ্ছে তা জানতে সক্ষম হয়নি। ছাদের নিচের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানার জন্য ওদের সার্ভে ইনফরমেশন এর উপর ভরসা করতে হয়। আপনি ঘর থেকে বের হয়েছেন, আবার ফিরে এসেছেন এতক্ষণ আপনার উপর নজরদারি করা হয়েছে। পথঘাট-গলি, খেলার মাঠ, অফিস, ব্যাংক, হাসপাতাল, দোকান, মার্কেট, বাস, ট্রেন, লঞ্চ, বিমান, ইত্যাদিতে স্থাপিত ক্যামেরার মাধ্যমে মূলত আপনার উপর নজরদারি করা হয়। আপনার প্রত্যেকটি নড়াচড়ার প্রতি খবরগিরি করা হয়। এমনকি ইসলামিক সেন্টার, মসজিদ-মাদ্রাসায়ও এখন এসব ক্যামেরা স্থাপন করা শুরু হয়েছে। বহির্বিশ্বের ইসলামিক সেন্টারগুলোতে তো অনেক আগে থেকেই এগুলো ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ট্রান্সপোর্ট ক্যামেরা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে থাকে। যার সাইজ একটি বোতামের মত। এখন তো নজরদারির জন্য অতিসূক্ষ্ম ক্যামেরা বের হয়েছে। চশমা, জামার বোতাম, হেলমেট, টাই, কলম, ঘড়ি ইত্যাদিতে ক্যামেরা স্থাপন করা থাকে। কারো সাথে কথা বললে তার পুরো অবস্থাটা ভিডিও হয়ে যাবে। পূর্ব

থেকে জানা ছাড়া সহজে কেউ তা বুঝতে পারবে না। স্মার্ট মোবাইল ও ল্যাপটপের সামনের দিকে ছোট একটি ক্যামেরা রয়েছে যা অন করা ব্যতীতও নেট চালু থাকা অবস্থায় গোয়েন্দারা চাইলে আপনার চেহারা দেখতে পাবে।

চ্যানেল ও কম্পিউটার

আপনি যখন ঘরে আসেন তখন স্যাটেলাইট চ্যানেল সাবস্ক্রিপশন ও Pay as you watch (আপনি ভিজিট করে বিল পরিশোধ করবেন) এর মাধ্যমে উনারা জানতে পারেন যে, আপনি কোন চ্যানেল দেখতে আগ্রহী। আপনার টেলিফোন রেকর্ড এর মাধ্যমে তারা আপনার ও আপনার আত্মীয় স্বজন ও পরিচিতিদের জানতে পারেন। আপনার কম্পিউটারের কারণে জানতে পারে, আপনি কোন কোন ওয়াইসাইট ভিজিট করেন। কি ইমেইল পান, আপনার কম্পিউটারের লিঙ্ক কি? কিছু কিছু এমন সন্দেহভাজন শব্দ আছে (Key words) যেগুলোকে তারা কমিউনিকেশন সিস্টেমে সেট করে রেখেছে, যেমন: উসামা বিন লাদেন, আল কায়েদা ইত্যাদি। আপনি যদি এগুলো অনলাইনে লিখেন বা বলেন অটোমেটিক আপনাকে রেকর্ড করে রাখবে এবং আপনার উপর নজরদারী শুরু করবে। এমনকি আপনি যদি তা ফোনে উচ্চারণ করেন অথবা অন্যকে মেসেজ করেন তবুও আপনি নজরদারির আওতায় পড়ে যাবেন।

হ্যাকিং



হ্যাকিং বলা হয়, অবৈধ পন্থায় অন্যের একাউন্টে প্রবেশ করা। নকল পাসওয়ার্ড দিয়ে তথ্য চুরি করা। বিভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে অন্যের আইডিতে প্রবেশ করে হস্তক্ষেপ করা। আপনার ই-মেইল, ব্যাংক একাউন্ট, ব্লগ বা ওয়েবসাইট প্রতিটিরই একটি পাসওয়ার্ড আছে। কেউ যদি আপনার অজান্তে আপনার ব্যক্তিগত একাউন্টে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে তাকেই বলে হ্যাকিং। পাসওয়ার্ড জানার অথবা ভাঙ্গার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। যে কোন একাউন্টের পাসওয়ার্ড নাম ঠিকানা ওয়েব কোম্পানী বা অফিসের কাছে থাকে। দুর্নিতিগ্রস্থ কোন ব্যক্তির মাধ্যমে যদি কেউ আপনার নাম-ঠিকানা, পাসওয়ার্ড ও একাউন্ট নাম্বার

জেনে ফেলে তবে কেবল তারই পক্ষে সম্ভব আপনার একাউন্ট হ্যাক করা। এক কথায় পাসওয়ার্ড চুরি করে অথবা পাসওয়ার্ড ভেঙ্গে অবৈধ হস্তক্ষেপ করাকে হ্যাকিং বলে। যারা এটা করে তাদেরকে বলে হ্যাকার। যেমন: নকল চাবি দিয়ে তালা খোলা অথবা তালা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে মালামাল লুট করাকে ডাকাতি বলে। আর ব্যক্তিকে বলে ডাকাত। এ পন্থায় গোয়েন্দাদের কার্যক্রম অনেকটা ফলপ্রসূ দেখা যায়। এ পন্থা অবলম্বন করে গোয়েন্দারা অতি সংরক্ষিত তথ্যকেও হস্তগত করতে সক্ষম হয়।

ভ্রমণ টিকেট

আজকাল টিকেট করতে গেলে ব্যক্তিগত তথ্য দিতে হয়। ফোন নাম্বার লেখাতে হয়। দেশের ভেতর ভ্রমণেও পরিচয়পত্র দেখানো আবশ্যিক হয়ে আসছে। হজ্জ্ব অথবা উমরা কিংবা বিদেশ সফরে যাওয়া নিজে থেকে অদৃশ্য এক যান্ত্রিক গোয়েন্দার নজরদারির আওতায় রাখার নামান্তর। এ পদ্ধতি মূলত বিশ্ববাসীকে একই সময়ে নজরদারির আওতায় আনার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

অর্থ স্থানান্তর

রাজনৈতিক শক্তিগুলোর অর্থ স্থানান্তরের উপর কি পরিমাণ নজরদারি করা হয় তা একটি জরিপ দ্বারাই বোঝা যায় যে, বিদেশ থেকে কেউ যদি কোন ব্যক্তি বা দলের কাছে টাকা পাঠাতে চায় তবে নিউইয়র্ক থেকে ক্লিয়ারেন্স না পাওয়া পর্যন্ত সে তা পাঠাতে পারে না। দেশের ভিতরও টাকা পাঠাতে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এতে জনজীবনই শুধু সংকীর্ণ হচ্ছেনা, গোয়েন্দাদের কাজও সংকীর্ণ হয়ে আসছে।

গোয়েন্দাগীরির কর্মবিন্যাস ও সংগঠনিক পদ্ধতি

চাণক্য ছিল প্রসিদ্ধ মৌর্য বংশের উজীর। নন্দ সাম্রাজ্যের পতন ও মৌর্য বংশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পিছনে তার অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রক্ষনশীল ইতিহাস হিসেবে ৩০০ থেকে ৩১১ খৃষ্টপূর্ব সময়ে চাণক্য অর্থশাস্ত্র (Arth shashtera) গ্রন্থ রচনা করে। চাণক্য ওরফে কৌটিল্য স্বীয় গ্রন্থে গোয়েন্দা বৃত্তির সুবিন্যস্তকরণ ও কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত নকশা আঁকেন এবং গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য দুটি গ্রুপে বিভক্ত করেন।

১. ভেতরের গ্রুপ
২. বাহিরের গ্রুপ

১. ভেতরের গ্রুপ ।

ভেতরের গ্রুপকে দেশের আভ্যন্তরিন রাজনৈতিক অবস্থা, ভি.আই.পি.-দের কর্মতৎপরতা উপর কড়া নজরদারি করতে হয়। যাকে পরিভাষায় কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স (Counter intelligence) বলে।

২. বাহিরের গ্রুপ

বাহিরের গোয়েন্দা কার্যক্রমকে চাণক্য তিন ভাগে ভাগ করেন;

১. রাজনৈতিক

২. কূটনৈতিক

৩. সামরিক

ইন্টেলিজেন্স বলা হয় মূলত, তথ্য সংগ্রহ করাকে। আর গোয়েন্দাগিরি তথা Expinloge কে কেবল তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম মনে করা হয়। যে কোন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির মৌলিক কর্তব্য হল, স্বদেশের যাবতীয় সম্ভাব্য তথ্যগুলো সংগ্রহ করা এবং দেশের বিরুদ্ধে আশংকাজনক দেশীয় বা বাহিরের যে কোন অপতৎপরতার প্রতি কড়া নজর রাখা, এর বিরুদ্ধে প্রতিত্তোরমূলক গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালিত করা। এটা কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। এটাকে আপনি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির যারপর নাই ‘ভদ্র সংজ্ঞা’ বলতে পারেন। জীবনের পরিবর্তনশীল চাহিদা মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্ব পরিচালনার স্বপ্ন গোয়েন্দা প্রথাকে নৈতিকতা কিংবা কোন মূলনীতি বা নিয়মকানুনের বাইরে বের করে দিয়েছে। এ কারণে এখন অধিকাংশ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি সন্ত্রাসী হিংস্র সংগঠনের রূপ ধারণ করেছে। যে সব সংস্থা এতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তার মধ্যে ‘র’, ‘মোসাদ’, ‘সি.আই.এ’, ‘কে.জি. বি’ অন্যতম।

ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সংজ্ঞা জানার পর এখন আসুন, এর পরিভাষা গুলোর পর্যালোচনা করি, যা একজন খেলাড়ুর অন্যতম মাধ্যম হয়ে থাকে। এগুলো হল সে সব কোডওয়ার্ডস (Code words) যার দ্বারা একজন সাধারণ ব্যক্তির নজর থেকে বিষয়টি গোপন রাখা হয়। পাশ্চাত্যের কিংবা অন্যান্য দেশের শিক্ষিত লোকের জন্য যা কোন গোপনীয় বিষয় নয়। সর্ব প্রথম আমরা জেনে নেই এজেন্ট কাকে বলে।

গোটা দুনিয়ার ইন্টেলিজেন্স স্কুল সমূহে এজেন্টের সংজ্ঞা বলা হয়-

এজেন্ট (Agent):

কোন নারী বা পুরুষ, যে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণের পর দেশের টার্গেটের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দিকনির্দেশনা অনুযায়ী গোপন কার্যক্রম যথা গোয়েন্দাগিরি, অন্তর্ঘাত ইত্যাদি স্বয়ং সম্পাদন করবে অথবা অন্যের সহায়ক হবে। কোন এজেন্টকে যে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে এজেন্ট হ্যান্ডলার বলে।

এজেন্ট হ্যান্ডলার (Agent Handler):

নর বা নারী যে এজেন্টকে ভর্তি করে প্রশিক্ষণ দেয়, তাকে ব্রিফ করে, এজেন্টকে কোন পরিকল্পিত মিশনের উদ্দেশ্য রওয়ানা করায়, এজেন্টকে ডি ব্রিফ করে। তাকে বিনিময় দান করে, পারিশ্রমিক প্রদান করে। এর কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে।

এজেন্ট হ্যান্ডলার এজেন্টের থেকে অর্জিত তথ্য লিখে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির নিকট প্রেরণ করে। আপনি তাকে এজেন্সি ও এজেন্টের মাঝে সমন্বয়কারী আখ্যা দিতে পারেন। এজেন্সির জন্য এজেন্ট হ্যান্ডলারের কার্যক্রম সব থেকে বেশী মূল্যায়ন করা হয়।

হ্যান্ডলারের যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য:

হ্যান্ডলারের কি কি যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন, বিশেষজ্ঞরা তো অনেক কিছু বলেছেন। কোন কোন সময় একটি বিষয়কে অন্যটির উপর প্রাধান্যও দেওয়া হয়। মৌলিকভাবে কোন হ্যান্ডলারের ভেতর যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা নিম্নরূপ:

হ্যান্ডলারের মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলী:

দেশের টার্গেট তথা যেখানে সে নিজের এজেন্টের মাধ্যমে কাজ নিচ্ছে এবং Bascountry দেশের সম্পর্কে অবগতি, সেখানের প্রচলিত ভাষা, দৈনন্দিন জীবনাচার, পরিবেশ, সামাজিকতা, মানুষের চালচলন ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে খুব ভালভাবে জানা থাকা।

২. সর্বোত্তম হ্যান্ডলার হল সে, যার চেহারা, বেশভূশা আকর্ষণীয়। যে জেদী বা আত্মসংহারক নয়। উপযুক্ত স্থানে প্রয়োজন অনুসারে নিজের চেহারা বদলাতে পারে। নিশ্চিত করতে পারে নিজের অবস্থান।

৩. ঈমানদারী ও দিয়ানতদারী, ধার্মিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪. মানুষের সাথে মিশতে জানা। অপরিচিতকে দোস্ত বানানোতে দক্ষ হওয়া।

৫. অপরকে প্রভাবিত করার জন্য ব্যাপক পড়াশোনা ও বাহ্যিক সৌন্দর্যের অধিকারী হওয়া।

৬. এজেন্সির বিধি-বিধান ও দিক-নির্দেশনাকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য মনে করবে এবং নিজের সর্বোচ্চ যোগ্যতা ব্যয় করে তা পালন করার চেষ্টা করবে।

৭. প্রতিপক্ষকে জানতে এবং যাচাই করে দেখার যোগ্যতা ষোল আনা থাকা চাই। অধীনস্থ এজেন্ট যেন কোনভাবে ধোকা দিতে না পারে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে।

৮. সংগৃহীত তথ্যকে সামনে রেখে সংক্ষেপে সুন্দর রিপোর্ট লিখতে সক্ষম হতে হবে। যাতে কোন অসপষ্টতা না থাকে।

৯. তৎক্ষণাত্ সিদ্ধান্তে পৌছা, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া ও অস্পষ্টতা থেকে দূরে থাকা একান্ত কর্তব্য।

এ হল একজন হ্যান্ডলারের এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যা না থাকলে নয়। আপেক্ষিক যোগ্যতা তার ব্যক্তিত্বের মাঝে ভিন্ন রং এনে দিতে পারে।

হ্যান্ডলারের কর্তব্যঃ

এ কথা চূড়ান্ত যে, হ্যান্ডলার এজেন্টের সাইকেলের (Cycle) সকল স্তরের প্রত্যক্ষ জিম্মাদার।

স্তর সমূহ হল-

১. মিশন

২. প্রস্তাবনা

৩. যাচাই-বাছাই, ও অনুসন্ধান।

৪. তদন্ত

৫. ভর্তি

৬. প্রশিক্ষণ

৭. পরীক্ষা নেয়া

৮. ব্রিফিং

৯. লাঞ্চিত

১০. মিলাপ

১১. ডি ব্রিফিং

১২. বিনিময় প্রদান।

হ্যান্ডলারের জন্য জরুরী দিকনির্দেশনা

১. সর্বোত্তম হ্যান্ডলার হল, যে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে জানে। তার জন্য কর্তব্য হল, মাঠ পর্যায়ে দীর্ঘদিন যারা কাজ করেছে তাদের থেকে উপকৃত হওয়া। তাদের অভিজ্ঞতা কে কাজে লাগানো।
 ২. সংশ্লিষ্ট এজেন্সিতে কর্তব্যরত যোগ্যতর ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ফলাফল প্রদানকারীর কর্মপন্থা বোঝা ও অনুসরণ করার চেষ্টা করা।
 ৩. সহকর্মীদের কর্মপদ্ধতির উপর নিরবিচ্ছিন্ন নজর রাখা।
 ৪. সেনাসদস্য বলে সন্দেহ হয় এমন বৈশিষ্ট্য না বানানো। সেনাদের পোষাক, বুট, গেম্বল পরিধান না করা। চুলের কাটিং সেনাদের সাদৃশ্য বানাবে না।
 ৫. বৈশিষ্ট্য ও বাহ্যিক আকৃতিতে নিজেকে সাধারণ নাগরিক হিসেবে ফুটিয়ে তুলবে।
 ৬. চালচলন সাধারণ হওয়া উচিত।
 ৭. সন্দেহভাজন বলে মনে হয় এমন কোন কাজ করবে না।
 ৮. গোপন তথ্যের তাকে একান্ত বন্ধুদেরকেও জানাবে না। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবে।
 ৯. উৎসব বা অনুষ্ঠানে নিজের কাজকে মিলাবে না। চাই তা সামাজিক বা অর্থনৈতিক কিংবা ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠান হোক।
 ১০. শত্রুদেশের রসম-রেওয়াজ এবং ধর্মীয় বিষয়াদি সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত থাকলে তাদের সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারে।
 ১১. এলাকা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে এবং তা শুধু চিত্র বা ম্যাপের উপর নির্ভর করে নয়। সরেজমিনে অভিজ্ঞতার সাথে তা জানতে হবে।
 ১২. সিকিউরিটি অনুভূতি ও সিকিউরিটি বিষয়ক যাবতীয় খবরাখবর রাখা।
- হ্যান্ডলার ও এজেন্টের মাঝের সম্পর্ক 'আদর্শ সম্পর্ক' হওয়া চাই। এজেন্টের সামাজিক প্রয়োজন তাকে পরিপূর্ণ বুঝতে হবে এবং তা পূরা করার সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করবে। এর মধ্যে 'অফ দি রেকর্ড' প্রয়োজনও অন্তর্ভুক্ত। কেননা এজেন্টকে একই ধর্মের হওয়া শর্ত নয়। অবস্থা বুঝে কম্প্রাইজ করতে পারে এমন হ্যান্ডলারই সার্থক এজেন্ট হ্যান্ডলার হতে পারে।
১৩. দেখা সাক্ষাতে (মিলাপ) পরিপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এবং উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগাতে হবে।

এজেন্ট (Agent)

এজেন্টের পরিচয় পাঠক পূর্বেই পেয়ে গেছেন। যেহেতু একজন এজেন্টকে অধিক কর্মতৎপর ও ক্রিয়াশীল হতে হয় তাই গোয়েন্দাবিষয়ক বিশ্লেষকরা তার জন্য বিশেষ কিছু যোগ্যতা থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল,

১. যেখানে উপস্থিত হওয়ার কথা ঘড়ির কাটার সাথে তাল মিলিয়ে যথা সময়ে উপস্থিত হওয়া এবং সে সহকর্মীদেরকেও এ ব্যাপারে তৎপর করতে সক্ষম হওয়া।

২. উপস্থিত হয়েই 'টার্গেট' পর্যন্ত পৌছা, তথ্য নেয়া, দেখা, শোনা ও সার্বিক নজরদারি করা। সামরিক তৎপরতা নোট করে ফেলা।

৩. এজেন্টের জন্য নির্দিষ্ট কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা শর্ত নয়। অনেক সময় সীমান্ত এলাকায় রাইমেইলের সাথে জড়িত অনেক মূর্খ-অপরাধী দ্বারাও উত্তম তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। মূলত টার্গেট ও সেখানের কাজের ধরন হিসাবে এজেন্টের লেখাপড়ার বিষয়টি বিবেচ্য।

৪. এজেন্টের জাতীয়তা ও ভাষা 'টার্গেট রাষ্ট্র' থেকে ভিন্ন না হওয়া উচিত। ভাষা না জানায় অনেক সময়ের সম্মুখীন হতে হয়। ভাল ফলাফল পাওয়ার আশা করা যায় না।

৫. এজেন্টকে অবশ্যই এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

৬. এজেন্টের সামাজিক অবস্থান, আর্থিক অবস্থা ও জীবন যাপন পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

৭. সাধারণত ৩০ থেকে ৫০ বছরের মাঝের বয়সের লোকেরা ভাল এজেন্ট হতে পারে।

৮. কাজের ধরন হিসেবে নারী-পুরুষ নির্ধারণ করা হয়। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় পুরুষ এজেন্ট নারী এজেন্টের তুলনায় একটু বেশী অগ্রসর হতে পারে এবং প্রতিকূল অবস্থায় সহজে ঘাবড়ে যায় না।

৯. এজেন্টের শারিরীক অবস্থা ভাল হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমন কোন রোগ না থাকা যা মিশন বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

১০. এজেন্টকে অবশ্যই সুন্দর চাল চলন ও আকর্ষণীয় বেশ ভূষার অধিকারী হওয়া চাই। নৈতিকতায় সেরা, হিম্মত ও প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ এবং সাধারণ জনগণের তুলনায় পরিছন্ন মানসিকতার অধিকারী হওয়া চাই।

যে সকল উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন এজেন্ট তৈরী করে

১. দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্ম, নীতিগত ও আত্মিক আকর্ষণ বা টানই অনেককে এজেন্ট বানিয়ে ছাড়ে। আর এ ধরনের এজেন্ট শুধু অর্থ উপার্জন বা অনৈতিক সম্ভোগের বিনিময়ে নিযুক্ত এজেন্ট থেকে অনেকগুনে উত্তম।
২. আপন দেশ থেকে বহিস্কৃত ব্যক্তির নিজের দেশের জন্য বিদেশে এই আশায় সহজেই এজেন্ট হয়ে যায় যে, কোন ভাল কাজ দেখাতে পারলে হয়ত দেশে ফেরার অনুমতি মিলতে পারে।
৩. নিজ দেশের সরকারের প্রতি অসন্তুষ্টি ও রাজনৈতিকভাবে যারা ভিন্ন মত পোষন করে তারা সহজেই এজেন্টে পরিণত হয়।
৫. শুধু অর্থ উপার্জন অথবা অনৈতিক সম্ভোগ লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা নেশা পূর্ণ করার ইচ্ছায়ও অনেকে এজেন্ট হয়ে থাকে। আর এটাই বেশী পরিলক্ষিত হয়। প্রায় ৪০% এজেন্ট এ প্রকারের।
৬. বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিও এজেন্ট হয়ে যায়।

যেমন, প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা পোষণকারী, আশ্রয়প্রার্থী, আপন দেশ থেকে বিতাড়িত, সাধারণ জনগণ।

এজেন্টদের প্রকারভেদ

এ্যাকশন এজেন্ট (Action Agent)

কোন গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য সংগ্রহকারী এজেন্টকে একশন এজেন্ট বলে। সংবাদ আহরণের ক্ষেত্রে সে কি কি কর্মপন্থা অবলম্বন করবে সেটা সম্পূর্ণ তার ইচ্ছা ও অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তার দায়িত্ব হল নির্ধারিত ব্যক্তির বা বস্তুর তথ্য সংগ্রহ করে হ্যাণ্ডলারের কাছে পৌঁছে দেয়া।

সাহায্যকারী এজেন্ট (Sporting Agent)

এ ব্যক্তি হল, যে একশন এজেন্ট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রের কাছে পৌঁছে দেয়ায় দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়।

প্রিন্সিপাল এজেন্ট (Principle Agent)

তিনি হলেন, শত্রু দেশে যে এজেন্ট হ্যাণ্ডলারের প্রতিনিধি হন। তাকে গুপ্তচরবৃত্তির ক্ষেত্রে সেকেন্ড ইন কমান্ড এর মর্যাদা দেয়া হয়।

প্রিন্সিপাল এজেন্ট একই সাথে এ্যাকশন এজেন্ট ও সহকারী এজেন্টের কাজ আঞ্জাম দেয়। প্রিন্সিপাল এজেন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল শত্রু দেশে আপন এজেন্টদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা।

কনফিউশন এজেন্ট (Confusion Agent)

তিনি হলেন, যাকে শত্রুদেশে এ উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় যে, সে শত্রুদের গোয়েন্দা সংস্থায় অনুপ্রবেশ করে এমন ভুল তথ্য সরবরাহ করবে যাতে শত্রু বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়। এজন্য খুবই চতুর ও শক্ত মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয়।

ডারমেন্ট এজেন্ট (Darment Agent)

তিনি হলেন, যাকে শত্রুদেশে পাঠানো হয় কিংবা সে দেশ থেকেই নির্বাচন করা হয়। তবে গোয়েন্দা কার্যক্রম থেকে তাকে পৃথক রাখা হয়। তাকে শুধু তখনই ব্যবহার করা হয় যখন তাকে ছাড়া কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে যুদ্ধাবস্থায় এ শ্রেনীকে তৎপর করা হয় এবং উত্তম থেকে উত্তম সেবা দেয়।

ডবল এজেন্ট (Dounble Agent)

একই সময় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বি দুই গোয়েন্দা সংস্থার জন্য যে কাজ করে তাকে বলে ডবল এজেন্ট বা ডবল ক্রস। তবে তার ধূর্ততার কারণে কোন সংস্থা অন্য সংস্থার কাজের কথা জানতে পারে না।

ডেবেল এজেন্ট (Devel Agent)

একই সময় নিজ দেশের দুই সংস্থার দায়িত্বরত ব্যক্তিকে ডেবেল এজেন্ট বলে।

ড্রপ এজেন্ট (Drop Agent)

তিনি হলেন, যাকে বিশেষ এক উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়। এ ধরনের এজেন্ট তখনই প্রয়োজন হয়, যখন কোন সেনাবাহিনী নিজ এলাকা অথবা বিজিত এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয় তখন তাকে পিছনে রেখে যায় এ উদ্দেশ্যে যে, সে শত্রুদের অবস্থা জেনে তাদেরকে অবগত করবে।

এ্যাকশন এজেন্টের প্রকারভেদ

কর্মভেদে এ্যাকশন এজেন্ট তিন প্রকার।

১. ভ্রমণরত এজেন্ট

২. মুকীম-অবস্থানরত এজেন্ট

৩. পেনেট্রেশন এজেন্ট

এই তিন প্রকার এজেন্টের কর্মপদ্ধতি, উপকারীতা, ক্ষতি বা বিপদের আশংকা ভিন্ন ভিন্ন। কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দেয়া বা কাউকে ‘মূল’ সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম আঞ্জাম দিতে হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল,

ভ্রমণরত এজেন্ট

তিনি হলেন, যে শত্রু দেশে টার্গেটের পিছনে ভ্রমণরত অবস্থায় থেকে আপন দায়িত্ব পালন করে। এ ধরনের এজেন্টের রাতের অবস্থান সাধারণত এ জায়গায় হয় না। এদের কিছু বৈশিষ্ট্য ও ক্ষতির সম্ভাবনা নিম্নে তুলে ধরা হল।

ভ্রমণরত এজেন্টের বৈশিষ্ট্য

১. সহজেই ভ্রমণ করার সুযোগ।
২. চব্বিশ ঘন্টা দায়িত্বরত থাকে।
৩. সাধারণ লোকদের সাথে সহজেই মিশতে পারে।

ভ্রমণরত এজেন্টদের উপকারীতা

১. এক জায়গায় স্থায়ী না থাকায় কিছুটা নিরাপদে থাকে।
২. কম্প্রোমাইজ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।
৩. সহজে মিলাপ (সাক্ষাত)।
৪. গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিজেই সরবরাহ করতে পারে।
৫. টার্গেটকে সুনিপুণভাবে নজরদারী করতে পারে।

ভ্রমণরত এজেন্টের ক্ষয়ক্ষতি

১. ব্যয় খুব বেশী হয়।
২. টার্গেট এরিয়ার মধ্যে স্থায়ীভাবে না থাকায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আহরণে অক্ষম হয়ে থাকে।
৩. হ্যান্ডলারের জন্য তাকে বরখাস্ত করা মুশকিল হয়।

মুকিম-অবস্থানরত এজেন্ট

টার্গেট দেশে যে এজেন্ট স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাকে মুকিম এজেন্ট বলে। চাই সে ভিন দেশীই হোক না কেন। এ ধরনের এজেন্ট সুবিধামত একটি কোর (কভার) অবলম্বন করে নেয়। যাতে কেউ তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষন করতে সুযোগ না পায়। তিনি সাধারণত আবাসিক এলাকায় সাধারণ বাসিন্দার ন্যায় চলাফেরা করেন। নিজ পেশায় লিপ্ত থেকে অতিউত্তম পন্থায় তথ্য সরবরাহ করেন।

মুকিম এজেন্টের বৈশিষ্ট্য

১. সাধারণত স্থায়ীভাবে বসবাসের কারণে শত্রুর অবস্থা সম্পর্কে খুব ভালভাবে জানা যায়।
২. সে বিদেশী হলে সংস্থার নিয়মতান্ত্রিক কর্মকর্তা হয় না।
৩. নিরাপদ সেইফ হাউজের ব্যবস্থা করতে পারে।

মুকীম এজেন্টের উপকারীতা

১. মিশন ব্যতীত অপারেশন সংক্রান্ত তথ্যও সরবরাহ করতে পারে।
২. ব্যয় কম হয়।
৩. ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে নিশ্চিত খবর প্রদান করতে পারে।
৪. স্বয়ং সম্পূর্ণ কোর (Cover) থাকায় বার বার বেশ পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না। তেমনিভাবে বারবার নতুন সরঞ্জামেরও প্রয়োজন হয় না।
৫. কম সময়ে বেশী খবর অর্জন করতে পারে। কেননা সে টার্গেটের কাছাকাছি অবস্থান করে।
৬. সাধারণত তার সরবরাহকৃত তথ্য অন্যদের তুলনায় অধিক সঠিক হয়ে থাকে।
৭. টার্গেট এরিয়ার প্রতি বিশেষ নজরদারী সম্ভব হয়।

মুকীম এজেন্টদের ক্ষয়ক্ষতি

১. কারো সাথে মিলাপ করা মুশকিল হয়।
২. নিয়ন্ত্রণও মুশকিল
৩. তার ডবল ক্রস হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। কেননা আটক হলে জান বাচানোর জন্য অন্য সংস্থা থেকে কম্প্রোমাইজ হওয়ার আশা করা যায়।

পেনেট্রেশন এজেন্ট (Penetration agent)

তিনি সাধারণত শত্রু গোয়েন্দা সংস্থায় ঢুকে পড়েন। এবং তার কাজটা ঠিক কনফিউশন এজেন্টের মত হয়ে থাকে। এ ধরনের লোক বেশীর ভাগ ডবল ক্রস হওয়ার আশংকা বেশী থাকায় অতিরিক্ত সতর্কতা ও বাছাই পর্ব শেষে তাকে অতিবেশী স্নায়ুবিক বলিষ্ঠতা অর্জন করিয়ে শত্রু দেশে টার্গেটের পিছনে পাঠানো হয়।

পেনেট্রেশন এজেন্টের উপকারীতা

১. মুকীম এজেন্টের সকল উপকারীতা তার থেকেও অর্জিত হয়।
২. অবস্থান ও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়া সহজ।
৩. বিপদের সময় আপন সংস্থাকে সহজেই অবগত করতে পারে।

পেনেট্রেশন এজেন্টের ক্ষয় ক্ষতি

১. শত্রু-গোয়েন্দা সংস্থায় প্রবেশ অনেক বেশী কঠিন এবং ধরা পড়ার আশংকা মাত্রাতিরিক্ত।
২. তার জন্য পরিকল্পনা করা অনেক মুশকিল।

৩. তার নিরাপত্তার বিষয়টি জটিল থেকে জটিল হয়ে থাকে।
 ৪. খুব বেশী 'সময়' ব্যয় হয়।
 ৫. মুকীম এজেন্টের সকল ক্ষয়ক্ষতি তার ব্যাপারেও আশংকাজনক। তিনি সাধারণত সহকারী এজেন্টের কাজ আঞ্জাম দেন।
- সহকারী এজেন্ট নিম্নলিখিত কাজ আঞ্জাম দেয়।
১. কোরয়ার (গাইড, নিরাপত্তায় সহযোগী।)
 ২. তার দ্বারা লাইভ ড্রপের (Live drop) সেবা নেয়া হয়।
 ৩. সেইফ হাউজের অপারেটর (Safe house operator) বানানো হয়।
 ৪. তার অবস্থানের ঠিকানা নেয়া হয়।
 ৫. বুদ্ধিমান টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা সহকারী এজেন্ট হতে পারে।
 ৬. ওয়ারলেস অপারেটরের কাজ, সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করে।
 - এ ক্ষেত্রে সে কয়েকটি সেবা প্রদান করে।
 ১. তথ্য সরবরাহ করে।
 ২. ভর্তিগ্রহণকারী হতে পারে।
 ৩. এজেন্ট খুঁজে দেয়।
 ৪. প্রশিক্ষক হয়ে থাকে।

গোয়েন্দাগিরির পরিভাষা

প্রতিটি ব্যবসায়ের মত গোয়েন্দা কার্যক্রমেও বিশেষ কিছু পরিভাষা রয়েছে। সকল পরিভাষা আয়ত্ত্ব করা না-সম্ভব, আর না সাধারণ পাঠকদের জন্য প্রয়োজনীয়। আমি শুধু কয়েকটি পরিভাষা উল্লেখ করব। যা দ্বারা পাঠক এর মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি বুঝতে পারবেন।

এজেন্ট নেট

একে 'গোয়েন্দা বেস' বলা অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা গোয়েন্দা কার্যক্রমের এমন এক কেন্দ্র যেখানে এজেন্টের থেকে উদ্ধার হওয়া তথ্য বা সরঞ্জাম প্রিন্সিপাল এজেন্ট অথবা কখনও হ্যাণ্ডলারকে কট আউট (Catout) এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

নেটের প্রকার সমূহঃ

সাধারণ নেট

এটি গোয়েন্দা কার্যক্রমের সর্বাধিক সাধারণ নেট। যার সংরক্ষণের তেমন কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না। এই নেটের আওতায় একাধিক এজেন্ট একই হ্যাণ্ডলারের অধীনে কাজ করে। এটার গঠন পদ্ধতি কিছুটা নিম্নরূপঃ

এজেন্ট হ্যাণ্ডলার

এজেন্ট এজেন্ট এজেন্ট

প্রিন্সিপাল এজেন্ট নেট

এতে হ্যাণ্ডলার ও এজেন্টের সম্পর্ক সরাসরি হয় না বরং উভয়ের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে প্রিন্সিপাল এজেন্টকে ব্যবহার করা হয়।

এটা আবার দু'প্রকার।

১. সাধারণ প্রিন্সিপাল এজেন্ট নেট। এতে এজেন্ট হ্যাণ্ডলার প্রিন্সিপাল এজেন্টকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ বা কন্ট্রোল করে। আর প্রিন্সিপাল এজেন্ট সাধারণ এজেন্টদের দিকনির্দেশনা দেয়। এটার গঠন পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

হ্যাণ্ডলার - প্রিন্সিপাল এজেন্ট

এজেন্ট এজেন্ট এজেন্ট

২. জটিল প্রিন্সিপাল এজেন্ট নেট

একে পূর্বের নেট থেকেও বেশী সতর্কতা সম্বলিত নেট বলা হয়। এতে হ্যাণ্ডলার প্রিন্সিপাল এজেন্টকে সরাসরি নয়; বরং মধ্যস্থতার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করে। যার গঠন পদ্ধতি কিছুটা নিম্নরূপ:-

এজেন্ট হ্যাণ্ডলার

ইন্টারমিডিয়েটর

প্রিন্সিপাল এজেন্ট

এজেন্ট এজেন্ট এজেন্ট

একামোডিশন এড্রেস (Cover) (আবাসিক ঠিকানা)

এটা এমন এড্রেস যা ধোকা দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই ঠিকানায় সাধারণত এজেন্ট শুধু ডাক গ্রহণ করে।

ডোসিআর (Dosear)

এটা হল, যে সকল কাগজে এজেন্টের পরিপূর্ণ রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয় তার নাম। এতে সাধারণত এজেন্টের প্রকৃত নাম ঠিকানা লিপিবদ্ধ করা হয়। এই কাগজগুলো ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি সমূহ সংরক্ষণ করে।

ব্রিফিং (Brefing)

কোন এজেন্টকে মিশনে পাঠাবার পূর্বে তার টার্গেট সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ও দিকনির্দেশনা দেওয়াকে ব্রিফিং বলে।

বাগ (Bug)

কোন যন্ত্রকে এমনভাবে লুকানো যাতে যে কোন জায়গায় আলোচনাকে শুনতে এবং রেকর্ড করতে সক্ষম হয়।

ক্লাগু স্টাইন (Clande stine)

সে সকল গোপন নড়াচড়াকে বলে যার বৈশিষ্ট্য কোন ব্যক্তি বুঝতে পারবে না। আর এর মধ্যেই কাজ সম্পাদন হয়ে যাবে।

ব্যাক স্টপ (Back stop)

নকল দলিল প্রমাণ বানানোকে ব্যাক স্টপ বলে। এর মাধ্যমে এজেন্টের আইন বহির্ভূত কাজকে আইনেই আওতায় নিয়ে আসা হয়।

ব্রেক (Brake)

রহস্য উদঘটক গুরুত্বপূর্ণ কাজকে উপযুক্ত পন্থায় পরিপূরক কোন কোড ভেঙ্গে ফেলাকে ব্রেক বলে।

বোনাইফাইড (Bonafide)

নির্দিষ্ট সংকেত-ইঙ্গিত বা ইশারা, যাকে কন্টাক্ট পয়েন্টে একে অন্যকে শনাক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

কন্টাক্ট পয়েন্ট (Contact point)

নির্দিষ্ট স্থান, যেখানে দুই এজেন্ট একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে। এখানে বোনাইফাইড সংকেতের মাধ্যমে একে অন্যকে শনাক্ত করে।

কোর (Cover)

যে পদ্ধতিতে কোন গোয়েন্দা নিজের প্রকৃতিরূপ গোপন করার জন্য ভিন্ন রূপ বা ছদ্মবেশ ধারণ করে একে কোর বলে। এ ক্ষেত্রে এড্রেস কোর, স্টাডি কোর, অথবা অন্য কোন কোর ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কম্প্রোমাইজ (Compromise)

কোন গোয়েন্দাকে শনাক্ত করা, তার কর্ম পদ্ধতি জেনে ফেলা যাতে পরবর্তীতে সে আর কর্তব্যরত না থাকে।

কন্টাক্ট (Contact)

যে ব্যক্তির সাথে ইন্টেলিজেন্স নিজেদের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন কাজে সম্পর্ক স্থাপন করে।

কোরিয়ার (Corear)

কোন প্রাণী অথবা মানুষ যে ইন্টেলিজেন্স এর গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম স্থানান্তরিত করে।

লানচিং (Launching)

কোন গোয়েন্দাকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে সীমান্ত পাড়ি দেওয়ানো।

লানচিং প্যাড (Launching pade)

সীমান্তের যে গোপন স্থান থেকে গোয়েন্দাকে নিরাপদে পার করা যায়।

কট আউট (Cut Out)

কোন ব্যক্তি বা পদ্ধতি যা গোপন সাক্ষাতের স্থানে এমন ভাবে কাজ করে যাতে গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য অথবা গ্রুপের সাক্ষাত গোপন থাকে।

কম্পার্টমেন্টেশন (Compartmentation)

ইন্টেলিজেন্স তথ্য গোপন রাখার জন্য অথবা একে অপরের থেকে কর্ম পদ্ধতি গোপন রাখার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

ড্রপ (Drop)

কোন প্রাণী অথবা স্থান, যেখানে ইন্টেলিজেন্স তথ্য অথবা সরঞ্জাম সাময়িকভাবে রাখা হয়, যাতে সংশ্লিষ্ট এজেন্ট নিয়ে যেতে পারে।

লাইভ ড্রপ (Live Drop)

যার কাছে ইন্টেলিজেন্স তথ্য অথবা সরঞ্জাম রেখে যায় সংশ্লিষ্ট এজেন্ট তার থেকে গ্রহণ করার জন্য, চাই সে জানুক বা না জানুক।

ডেড ড্রপ (Dead Drop)

সে সকল জড় বস্তু, যেমন, কোন গাছের ডাল, কোন পাথরের নীচে, কোন গুহা, গাছ, পাহাড়, ইত্যাদি। যেখানে ইন্টেলিজেন্স সাময়িকভাবে তথ্য বা সরঞ্জাম রেখে যায় যাতে সংশ্লিষ্ট এজেন্ট গ্রহণ করতে পারে।

মুভিং ড্রপ (Moving Drop)

সে সকল প্রাণী বা জড়বস্তু যা নড়াচড়া করে। যেখানে ইন্টেলিজেন্স তথ্য বা সরঞ্জাম এজেন্টের জন্য রেখে যায়। যেমন পশুর পাল, ট্রেনের বগি ইত্যাদি।

অপারেশনাল ডেটা (Operational data)

সে সকল তথ্য, যা এজেন্ট হ্যাণ্ডলারের পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি তৈরীর জন্য প্রয়োজন হয়। এর অধিকাংশ উপাদান দেশের টার্গেটের সংবাদ সম্বলিত হয়ে থাকে।

পেপার মিল (paper Mill)

যে এজেন্ট মিথ্যা ঘটনাকে সত্য বানিয়ে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিকে ধোকা দিতে পারঙ্গম।

সেইফ হাউস (Safe House)

যে সংরক্ষিত ও গোপন আস্তানা এজেন্ট ও এজেন্ট হ্যাণ্ডলারের কার্যক্রম চালানোর জন্য বানানো হয়।

স্ক্রীনিং (Screening)

কোন ব্যক্তির যোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতাকে যাচাই করার জন্য গোপন পন্থায় তার বায়োডাটা ও পিছনের জীবনের রেকর্ড পর্যবেক্ষণ করা।

সার্ভিসিং সিগনাল (Servicing signal)

যখন কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট জায়গা থেকে ড্রপ উঠিয়ে নেয় তখন সেখানে একটি চিহ্ন রেখে যায়, যাতে বুঝা যায় এখান থেকে ড্রপ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

সেফটি সিগন্যাল (Safty signal)

পূর্ব নির্ধারিত ঐ চিহ্ন যার দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, ময়দান পরিষ্কার এবং ইন্টেলিজেন্স কর্মতৎপরতা চালাতে পারে

আগার গ্রাউন্ড (Under Ground).

গোপন তৎপরতাকে খতম করা অথবা সীমিত করে দেয়া। যাতে তা প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা বাকী না থাকে।

আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাসংস্থা ফ্রিম্যাসন الماسوني

বর্তমান যুগেও ইহুদীদের আন্তর্জাতিক সংস্থা ফ্রিম্যাসন সম্পূর্ণ সক্রিয়। সাধারণত এর কর্মতৎপরতা লোক চক্ষুর আড়ালে থাকে। এটা একমাত্র সংস্থা যার মাধ্যমে গোটা দুনিয়ার ইহুদীরা পারস্পরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখে। এটা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সংগঠন। এটির প্রাচীনতা উপযুক্ত দলীল দিয়ে প্রমাণিত।

ফ্রি ম্যাসনের গ্রন্থ ‘পৃথিবীর গোয়েন্দা সংস্থা সমূহ’ এর তথ্য অনুযায়ী সংগঠনটি হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাবেলে বনী ইসরাঈলের দাসত্বের যুগেও সংগঠনটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। তখনও সক্রিয় ছিল। বনী ইসরাইলের সত্তর বছরের দাসত্বের যুগেও কতিপয় নবীর আগমন ঘটে। তাদের মধ্যে হজরত দানিয়াল আলাইহিস সালাম, হজরত উযাইর, হজরত ইয়াহয়া আলাইহিস সালাম, হজরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম অন্যতম। তাদের অব্যাহত চেষ্টায় কাজের গতি বৃদ্ধি পায় এবং রকওয়া, সাইহুন ও জেরুসালেমের দিকে প্রত্যাবর্তনকে কওমী নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়। তাদের সহীফাগুলো বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে। এই ফ্রি ম্যাসন সাইরাস ইরান গ্রেট এর সাথে এ মর্মে চুক্তি করে যে, সে বাবেলের উপর আক্রমণ করবে এবং সে সময়ে ভেতর থেকে সকল ইহুদী তার সহযোগীতা করবে।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর জন্মের প্রায় হাজার বছর আগে সুলাইমান আলাইহিস সালাম ফিলিস্তিনে মসজিদে আকসা বা বায়তুল মাকদিস নির্মাণ করেছিলেন। ইহুদীদের নিকট এটি টেম্পল অব সোলেমান নামে পরিচিত। ইহুদীদের বিশ্বাস মতে, এই টেম্পল বা মন্দিরে রক্ষিত ছিল পাথরে খোদিত দশম আজ্ঞা বা টেন কমাণ্ডমেন্টস (TEN COMENDMENTS)। ইহুদীদের আরো বিশ্বাস হচ্ছে, এই টেম্পলে স্বয়ং ঈশ্বর বাস করতেন।

ধারণা করা হয়, সুলাইমান আলাইহিস সালাম 'ইয়াওয়ের' (হিব্রু ভাষায় ঈশ্বর) এর নিকট থেকে স্থাপনাটির স্বর্গীয় নকশা প্রাপ্ত হন। যে কারণে এটি হয়ে উঠে অতীন্দ্রীয় জ্ঞানের উৎস। এই নকশাটি সম্বন্ধে আর একজন মাত্র লোক জানতেন। পশ্চিমে তিনি হাইরাম আবিদ নামে পরিচিত। মেধাবি এই স্থাপতি বাইতুল মাকদিসের নির্মাণ কারিগরদের অন্যতম ছিলেন। হিব্রু বাইবেলে (তালমুদ) তাকে বিধবার সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাইরাম আবিফকে তার কয়েকজন শিষ্য গোপন আঙা লাভের বাসনা থেকে খুন করে পাহাড়ি গুহায় পুঁতে রাখে। ইয়াহুদীদের প্রাচীন সংঘ ফ্রীম্যাসনারির (FREE MASSON) উদ্ভব এই হাইরাম আবিফকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। তিনি ছিলেন ফ্রি অর্থাৎ মুক্ত এবং ম্যাসন- কারিগর।

ফ্রিম্যাসন আকীদা মতে, হাইরাম আবিফ তার অতীন্দ্রীয় জ্ঞানের দলিলাদি সলোমন মন্দিরের নিচে লুকিয়ে রেখেছিলেন। যেখানে বিশ্বকে শাসন করা বা বশীভূত করে রাখার জ্ঞান ও কলাকৌশল রয়েছে। যেমন প্রসিদ্ধ আছে যে, সুলাইমান আলাইহিস সালাম মানব ও দানবকে বশীভূত করে পৃথিবীব্যাপী তার সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। তালমুদ, জান্দুর, নকশা, বায়তুল মাকদিসের স্থাপত্য কৌশল এবং এ সংক্রান্ত দলিলাদি করায়াত করার জন্য ক্রসেডের সময় 'নাইট টেম্পলার' নামে আরেকটি উগ্রগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। তবে বিশ্লেষক ও ঐতিহাসিকদের মতে নাইট টেম্পলার ও ফ্রিম্যাসন মূলত একই গোষ্ঠীর লোক। গুরু দিকে এদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯ জন। তারা খৃষ্টের প্রতি আনুগত্য, দারিদ্র ও কৌমার্যের ব্রত নিয়েছিল।

এদের রোমাঞ্চকর কার্যকলাপে আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপের অভিজাত শ্রেণী তাদের সংঙ্গে যোগ দেয়। এ সময় তারা প্রচুর অর্থ-সম্পদ ও ভূসম্পত্তি লাভ করে। এরা প্রায় ৭৫ বছর পর্যন্ত জেরুসালেমের টেম্পল অব সলোমনকে কেন্দ্র করে তাদের গোপন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। কথিত আছে, তারা সেখান থেকে টেন কামাণ্ডমেন্টস ও অন্যান্য গোপন নথি হস্তগত করতে সমর্থও হয়েছিল। ক্রসেড যুদ্ধে পরাজয়ের পর এদের প্রকাশ্য তৎপরতা চলে যায় পর্দার আড়ালে। লুফিসারে (সর্বদর্শী আরাধ্য দেবতা) বিশ্বাসী ম্যাসুনিকরা এখনও পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী তাদের গোপন কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার উগ্র বাসনা এখনো তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে।

ফ্রীম্যাসনবাদ ও ইয়াহুদী

الماسونية বা ফ্রীম্যাসনবাদ। এর ইংরেজী শব্দ (FREE MASSONRY) অর্থ বানানো। যারা মাসূনিয়াহ এর সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে মাসূনী বা ফ্রীম্যাসন (স্বাধীন নির্মাতা) বলা হয়। অর্থাৎ যারা শিগগিরই মসজিদে আকসা ধ্বংস করে তাতে সোলেমানী কাঠামো নির্মাণ করবে। তাই তাদের প্রতীক হচ্ছে একটি গোল চিহ্ন যার ভিতরে রয়েছে একটি ছয়কোণ বিশিষ্ট তারা। আর এ তারার ভিতর রয়েছে ইংরেজী অক্ষর এ (A)। এ অক্ষর ইহুদীদের সর্বশেষ রাজা গ্যাকিনের প্রতি ইঙ্গিত করে, যাকে বুখতানাস্‌সর বন্দী করেছিল।

মাসূনিয়াহ হচ্ছে একটি খাটি ইয়াহুদী সংগঠন। আর এর সকল প্রতীক ও গোপন অক্ষরও ইহুদীবাদ সম্পর্কীয়। শ্রোকাশ তার বই 'ইয়াহুদী মানসিকতা'য় উল্লেখ করেছেন, পৃথিবী আজ জীবন মৃত্যুর লড়াইয়ের সম্মুখীন। ইয়াহুদীবাদ-ফ্রীম্যাসনাবাদ সারা বিশ্বের জন্য 'মৃত্যু' পরিণতি সৃষ্টি করেছে।

ফ্রীম্যাসনাবাদ যা গোপনে প্রতারণার মাধ্যমে পৃথিবীতে ইয়াহুদীবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিত। এর ইতিহাস সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, এর সূচনা হয় হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর যুগে। তবে আধুনিক ফ্রীম্যাসনবাদ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে ১৭৭৭ সাল থেকে। এর প্রধান কার্যালয় লন্ডনে। একে তারা আমাদের মুসলমানদের ক্বিবলা 'ক'বা' এর মত মর্যাদা দেয়।

ফ্রীম্যাসনবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের চতুর্থ, পঞ্চম, নবম ও এগারতম ধারায় উল্লেখ আছে যে, ফ্রীম্যাসনবাদ আমাদের অন্ধ সেবা করে যাচ্ছে। শিগগিরই আমরা অইহুদী পৃথিবীকে গোপন ফ্রীম্যাসনবাদী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে ধ্বংস করব। এরপর সেসব ফ্রীম্যাসনবাদী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহ ধ্বংস করব যা জন্মগত ইয়াহুদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। যখন কোন গাধা- (ইয়াহুদী ব্যতীত পৃথিবীর সকল লোককে তারা গাধা বলে অভিহিত করে) মারা যাবে তখন আমরা অন্য গাধার উপর সওয়ার হবো। আমরা আল্লাহর নির্বাচিত জাতি। অন্যান্য জাতিসমূহকে আল্লাহ আমাদের সেবা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। গাধারা আমাদের গোপন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহের ব্যাপারে কিছুই জানে না। তাদেরকে আমরা আমাদের সংগঠনে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছি। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পুলিশদেরকে আমাদের ফ্রীম্যাসনবাদী প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রবেশ করাবো, যাতে তাদেরকে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করতে পারি। এবং যাতে তারা আমাদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করে।

এ হচ্ছে নিভেজাল ইয়াহুদী প্রতিষ্ঠান ফ্রীম্যাসনবাদের পারিকল্পনা। এ ফ্রীম্যাসনাবাদ পরিচালিত দুটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে- লায়ন্স ক্লাব ও রোটারী ক্লাব। দেশের প্রভাবশালী লোকদেরকে এসব ক্লাবের সদস্য করা হয়।

(মিশরের আল আযহার ও রাবেতা আল আলামী আল ইসলামীর পক্ষ থেকে ফ্রীম্যাসনাবাদের সাথে সম্পর্ক রাখা ও তাদের নিয়ন্ত্রিত লায়ন্স ও রোটারী ক্লাবের সদস্য হওয়া মুসমানদের জন্য হারাম বলে ফতওয়া দেয়া হয়েছে।)

ফ্রীম্যাসনবাদের স্তর সমূহ

ফ্রীম্যাসনাবাদের ৩টি স্তর রয়েছে।

১. প্রাথমিক স্তর।

প্রাথমিক স্তরে ৩৩টি পদ রয়েছে। যে ৩৩ টি পদ অর্জন করে তাকে গলায় একটি রশি এবং চোখে পট্টি বেধে ফ্রীম্যাসনবাদের প্রধান কার্যালয়ের একটি লাল অঙ্ককার কক্ষে প্রবেশ করানো হয়। যেখানে রয়েছে মানুষের মাথার অনেক খুলি। সেখানে তাকে অশ্লীল কাজে লিপ্ত করানো হয়। ১৯৬৫ সালে মিশরের ‘সশস্ত্র বাহিনী’ পত্রিকা এ ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। অতঃপর তাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তিনজনের সামনে এনে এ শপথ করানো হয় যে, সে ফ্রীম্যাসনবাদের কাজে আন্তরিক হবে। যদিও তাকে তার ছেলে, স্ত্রী ও নিকটাত্মীয়ের বিরোধিতা করতে হয়। আর তার কাছ থেকে এ অঙ্গীকারও নেয়া হয় যে, যদি সে ফ্রীম্যাসনবাদের গোপন বিষয়গুলো প্রকাশ করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। এ ব্যাপারে এত কড়াকড়ি করার কারণ হচ্ছে, কেউ কেউ ফ্রীম্যাসনবাদের এ ব্যাপারটি প্রকাশ করে ফেললে আরব পত্রিকাগুলো তা ফলাও করে প্রচার করবে।

যদি কেউ ফ্রীম্যাসনবাদের প্রথম স্তরের ৩৩টি পদ অর্জন করে তাকে উস্তাদের আসনে (মহান শিক্ষক) উপাধি দেয়া হয়। ফ্রীম্যাসনবাদের দ্বিতীয় স্তরের জন্য আগে জন্মগত ইহুদী ছাড়া কাউকে গ্রহণ করা হত না। এখন এ কড়াকড়ি আর নেই। তবে শর্ত থাকে যে, তাকে ইয়াহুদীদের জন্য বড় কোন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ফায়দা লুটিয়ে দিতে হবে।

কেউ যখন প্রথম স্তরের ৩৩ টি পদ অতিক্রম করে মহান শিক্ষক উপাধি নিয়ে দ্বিতীয় স্তরে পদার্পন করতে যায়, তখন তাকে ফ্রীম্যাসনবাদের গোপন কথা সমূহ বলে দেয়া হয়। দ্বিতীয় স্তরে পদার্পণের পর তার কাছ থেকে আবার অঙ্গীকার নেয়া হয়। আগের মত তার উভয় চোখে পট্টি বেঁধে ফ্রীম্যাসনবাদের মূল ব্যক্তিদের সামনে আনা হয়। চোখ বাঁধা অবস্থায় জিজ্ঞাসা করা হয়। তুমি কে?

সে উত্তরে বলে, আমি একজন অন্ধকার জগতের লোক। আমি আলোর সন্ধান করছি। আমি জেনেছি যে, আপনারা সোলেমানী কাঠামো তৈরী করবেন। তাই আপনাদেরকে সহায়তা করতে এসেছি। এ সময় তাকে বলা হয়, আমরা জন্মগত ইয়াহুদী ছাড়া এ কাজে অন্য কাউকে গ্রহণ করিনা। তখন সে বলে, আমি আপনাদেরই একজন এবং আপনাদের আত্মীয়, অতপর তার চোখ খুলে দেয়া হয়। এবং তাকে দুটি মূর্তির সামনে আনা হয়। এ দুটি মূর্তির একটি মূসা আলাইহিস সালাম ও অপরটি হারুন আলাইহিস সালাম এর। তাকে বলা হয়, এদুজন হচ্ছেন মূসা ও হারুন আলাইহিস সালাম। তুমি কি এ দু'জন ব্যতীত অন্য কোন নবীকে বিশ্বাস কর? তখন সে বলে, না। অতপর তাকে অন্যান্য নবীগনকে লানত করতে বলা হয়। (নাউযুবিল্লাহ)! এরপর তাকে তাওরাতের কাছে নিয়ে আসা হয় এবং বলা হয় এটা হচ্ছে তাওরাত। তুমি কি এ ছাড়া অন্য কোন কিতাবকে বিশ্বাস কর? সে বলে, না। এরপর তাকে অন্যান্য আসমানী কিতাবকে গাল মন্দ করতে বলা হয়।

ফ্রীম্যাসনবাদের তৃতীয় স্তরকে বলা মহাজাগতিক বন্ধন। এটা কতক ইয়াহুদী গ্রেট শয়তানের সমষ্টি। তাদেরকে হাকীম (প্রজ্ঞাবান) নামে অভিহিত করা হয়। এরা রাত-দিন মানবতাকে কিভাবে ধ্বংস করা যায় সে পরিকল্পনায় ব্যস্ত থাকে। এরা বসবাস করে নিউইয়র্কে। ফ্রীম্যাসনবাদ সম্প্রসারিত হলে আদিস আবাবা ও সুইজারল্যান্ডে দুটি শাখা খোলা হয়।

হিস্ট্রী অব ওয়ার্ল্ড

ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটেনিকার তথ্য অনুসারে সাইরাস গ্রেট শক্তিশালী সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বনী ইসরাইলের সহযোগীতায় বাবেলে আক্রমণ করে বিজয় লাভ করে। সে সময় বাদশাহ ছিল বুখতানাস্সারের পুত্র। সাইরাস কর্তৃক সকলকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। কারো বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিশোধমূলক আচরণ করা হয়নি। এভাবে বনী ইসরাইল বাবেল থেকে দীর্ঘদাসত্ব হতে স্বাধীনতা লাভ করে। আপন পিতৃভূমি জেরুসালেমে চলে আসে। সাইরাসের আলোচনা কুরআন শরীফে রয়েছে। কুরআনে হজরত সিকান্দার যুল কুরনাইন এর আলোচনা রয়েছে। তিনিই সেই ব্যক্তি। বিজয়ের পরে বনী ইসরাইল ও বাবেলের প্রজাদের সাথে সদাচরন তার বদান্যতার বহিঃপ্রকাশ করে। সে সময় ফ্রিম্যাসনের উদ্দেশ্য ছিল অনেক উঁচু ও মহৎ।

বর্তমান যুগে সংগঠনটির কার্যক্রম, অবস্থা ও কীর্তিকলাপ দেখে বোঝা যায় এর একটিই উদ্দেশ্য। তাহল-গোটা বিশ্বের সকল ইহুদীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপন স্বার্থ অর্জনের জন্য কাজ করতে হবে। ইসরাইলের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারা ও

আমেরিকা-রাশিয়ার উপর তাদের প্রভাব বিস্তার এবং ইসরাইলকে খুশি করতে পাকিস্তানের মরিয়া হয়ে উঠা বিশ্ববাসীকে নতুন করে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে। বর্তমানে ইসরাইলের সব থেকে বড় মুরবিব ও পৃষ্ঠপোষক হল আমেরিকা। রাশিয়াও ইসরাইল অতিথিয়তায় কোন অংশে কম নয়। ইসরাইল প্রতিষ্ঠা লাভের পর কয়েক লাখ ইহুদীকে রাশিয়া ইসরাইলে পাঠাতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে নি; বরং আদেশ মানতে বাধ্য ছিল। একাধিক গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যও রাশিয়া ইসরাইলের সঙ্গ দিয়েছে।

ফ্রিম্যাসন-পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন গোয়েন্দা সংস্থার শাখা।

আইয়ুব খানের শাসনামলে পাকিস্তান সরকার ফ্রিম্যাসনকে অবৈধ ঘোষণা করে। তারপরও বর্তমানে ফ্রিম্যাসনের দুটি শাখা তৎপর রয়েছে।

১. রোটারী ক্লাব

২. লাইন্স ক্লাব

ফ্রিম্যাসন এই ভিন্ন দুটি নামে তৎপরতা চালাচ্ছে।

এই সংস্থাটি নৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমের নামে সমাজের মধ্যে স্বীয় বিষাক্ত প্রভাব বিস্তারে নিয়োজিত। দুঃখজনক কথা হল, আমাদের দেশের (পাকিস্তান) শিক্ষিত এমনকি দ্বীনদার শ্রেণীও জেনে বা না জেনে সংস্থা দুটির কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। এসব লোকের কোন হুশই নেই যে, সংস্থা দুটি আমাদের সমাজকে কিভাবে পশ্চিমা চংয়ে সাজিয়ে তুলছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যক্তি-স্বার্থ, পেশাদারী পদ, ক্ষমতাসীনদের সাথে সুসম্পর্ক, সংস্কৃতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের নামে এরা পাকিস্তানের উচ্চ শিক্ষিত ঘরানা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে নিজেদের ফাঁদে ফেলে রেখেছে।

রোটারী ক্লাব



(সংস্থা ইহুদীদের, পরিচালিত হয় খৃষ্টানদের অর্থে)

এ ক্লাবের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করে কোন লাভ নেই। আর আবেদন করতে বলাও হয় না। মূলত কোন পুরাতন সদস্য যদি আপন বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিত জনের মধ্যে উপযুক্ত কাউকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব পেশ করে, তারা যদি ভাল মনে করে তবে তাকে সদস্য করা হয়। সদস্যকে আপন পেশা বা কাজে অভিজাত হতে হয়।

রোটারী আন্দোলনের সূচনা

১৯০৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারীতে মার্কিন অ্যাটর্নি পল পি. হ্যারিস বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে আমেরিকার শিকাগোতে এই আন্দোলন শুরু করে। সংস্থাটির সর্বপ্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় শিকাগোর ইউনিয়ন ভবনে। সেখানে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আস্তে আস্তে সকল বন্ধু বান্ধবের ঘরে এ মিটিং সংগঠিত করা হবে। (আজও পর্যন্ত এর ধারা অব্যাহত রয়েছে।

ধীরে ধীরে সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পল পি. হ্যারিস ও তার বন্ধুদের জন্য বাসায় মিটিং করা মুশকিল হয়ে পড়ে। এরপর থেকে তাদের মিটিংগুলো হোটেল বা রেস্তোরাতে হতে শুরু করে। ১৯১১ সালে রোটারী সংস্থা আমেরিকা অতিক্রম করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই ক্লাবটি আস্তে আস্তে জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে সারা বিশ্বে ২৫ হাজারেরও বেশী রোটারী ক্লাব বিদ্যমান। যার সদস্য সংখ্যা ১২ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। পাকিস্তানে ক্লাবটির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বলা হয়, বিভিন্ন বিষয়ের পেশাদারী প্রশিক্ষণে সহায়তা করা, সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা। কমিউনিটি সার্ভিসের নামে সর্বসাধারণের উন্নতি ও সফলতার কলাকৌশল শিক্ষা দেয়া। এ ছাড়াও তারা বাহ্যিকভাবে আস্তে আস্তে জাতিকভাবে মনুষ্য উৎকর্ষতা, জাতীয় ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব নিরাপত্তা বিষয়ক প্রোগ্রাম করে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিদেশে পড়ার খরচ ও ভাতা প্রদান করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে তারা রোটারী গ্র্যান্ট ও ইন্টার গ্র্যান্ট নামে আরো দুটি সংগঠন করে রেখেছে। যার মধ্যে ধারাবাহিকভাবে ১৮/১৯ এবং ১৪ থেকে ১৮ বছরের যুবক যুবতীদের সদস্য করা হয়।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় পাঠক রোটারী ক্লাবের সফলতা, বিস্তার ও উন্নতির ইতিহাস জানতে পেরেছেন। এটা হল মিডিয়া জগতের এক অত্যাধুনিক সংস্করণ। যার মাধ্যমে ইহুদীবাদ বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের মাথার উপর বসে আছে। এদের মূল টার্গেট অবহেলিত সমাজ বা নিপীড়িত মাজলুম জনতা নয়; বরং প্রভাবশালী, ক্ষমতাশীল লোকেরাই এদের মূল টার্গেট। এসব সংস্থার মাধ্যমে তারা সেসব ক্ষমতাধর ব্যক্তিদেরকে সদস্য করে থাকে যারা সমাজের প্রতিনিধি বা প্রভাবশালী শ্রেণী। এদের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইহুদীবাদ আস্তে আস্তে জাতিকভাবে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে চলেছে।

সংস্থাটি মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ব্যবসা-বাণিজ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক গাঢ় করার সাথে সাথে কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিনোদন মূলক কর্মকান্ড উপহার দেয়া। বাহ্যিকভাবে যদিও তারা এটা প্রকাশ করে থাকে; কিন্তু তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, একে অন্যের পেশা থেকে উপকৃত হওয়া। সামাজিক উন্নতির জন্য এমন এক শ্রেণীকে প্রস্তুত করা যারা চিন্তাগতভাবে এক হবে এবং সমাজের

প্রত্যেকটি স্তরে প্রভাব রাখতে পারবে। ঠিক এজন্যই পাকিস্তানের শিল্পপতি ও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর ব্যক্তিদের মাঝে রোটারী ক্লাবের সদস্য হওয়ার আগ্রহ সংক্রামক ব্যধির ন্যায় ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ী কার্যক্রমকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে এবং ক্ষমতাসীনদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের নিমিত্তে চটজলদি রোটারী ক্লাবের সদস্য হওয়ার শুরু করে দিয়েছে। এমনকি নিজের নাম বা গাড়িতে রোটারী লোগো লাগিয়ে ঘোরাফেরা করতে গর্ববোধ করে। রোটারী ক্লাবের সদস্য হলে যে ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি হয় তা শুধু এই একটি ঘটনা দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, শ্যান গ্রুপের ক্যাপ্টেন আজহার সাহেব রোটারী ক্লাবের গর্ভনর পদ লাভের জন্য লক্ষ লক্ষ রুপি খরচ করেছেন।

রোটারী ক্লাবের সদস্যরা একে অপরের ঘরে পার্টিকে শরীক হয়ে শরাব খেয়ে মত্ত হয়ে যুবতীদের সাথে অসামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে শুরু করেছে। করাচির লিবার্টির ডক্টর মানসুর এর উপরও রোটারীর সদস্যরা ফাণ্ড করার জন্য কঠিন শর্তারোপ করেছিল। যখন এটা ব্যাপকতা লাভ করতে শুরু করবে তখন তারা লিবার্টিতে খরচ করা সকল অর্থ ফেরত নিয়ে নেয়। কিন্তু যখন আতাউর রহমান বারী বোটারীর ডিসট্রিক্ট গর্ভনর নির্বাচিত হলেন তখন তিনি বোটারীর মধ্যে অসৎতৎপরতা-মদ, যুবক, যুবতী ব্যবহার ইত্যাদির ব্যাপারে আপত্তি তুলেন। বিশেষ করে মেট্রোপলিটন চেয়ারম্যান বরাবরে বোটারীর তীব্র সমালোচনা করে একটি চিঠি লিখেন। তা সত্ত্বেও মেট্রোপলিটন ক্লাব আপন অসামাজিক কাজ অব্যাহত রাখে। বারী সাহেবকে পদচ্যুত করার চেষ্টা করে। যার মধ্যে এ এ মুহসিন অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে।

রোটারী ক্লাবের কাজ ঠিক তখনই ব্যাপকভাবে কাজের সুযোগ লাভ করে যখন সিঙ্গাপুর এয়ার লাইন্সের এম আই আকবর ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউল হককে বোটারীর মহাপরিচালক বানাতে সক্ষম হয়েছিল।

বোটারী ক্লাবের অনুষ্ঠানগুলো এখন মদ, নারী, অশ্লীলতা, নগ্নতায় ভরপুর। বিনোদনের নামে পশ্চিমা সংস্কৃতি চর্চায় বিভোর। যারা না জেনে বোটারীর সদস্য হয়েছিল তাদের ঠিকই ভুল বুঝে এসেছে। রোটারীর অনুষ্ঠানগুলোতে তারা ঠিকই লজ্জিত হন। ১৯৯৪ সালের ১৯ই এপ্রিল হোটেল প্রিন্স কনস্টেবলে ডিসট্রিক্ট কনফারেন্স সংগঠিত হয়। এর বিস্তারিত তথ্য গোপন করা হয়। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে সেখানে নাচগান ও মদের ব্যবহারকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রাইভেট গায়ক, গায়িকা থাকা সত্ত্বেও অনেক বেশী বিনিময় দিয়ে করাচি থেকে এক রিটার্ড সেনা সদস্যের মেয়ে ক্লাসিক্যাল ড্যান্সারকে সেখানে আনা হয়।

১৯৯৩ সালের ২১ জানুয়ারী আমেরিকান কনস্যুল জেনারেল রিচার্ড ফ্যাক এর বাসায় নাইটের ব্যবস্থা করা হয়। বাৎসরিক অনুষ্ঠান হিসাবে ১৯৯২ সালেও সে মেট্রোপলিটন রোটারী ক্লাবের অধীনে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলোর পরিচালক ও করাচীতে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে মদ ও নারী উপভোগের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এ বছর এক জোড়ার জন্য অংশগ্রহণের কার্ডের মূল্য ছিল ২৬০০ রুপি। বিগত তিন বছর যাবত আমেরিকান কনস্যুলের তত্ত্বাবধানে উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন অব্যাহত রয়েছে। এ অনুষ্ঠানে করাচির উচ্চবিত্ত শ্রেণীও ব্যবসায়ী শ্রেণীকে রোটারী ক্লাবের সদস্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট আগ্রহী করে তোলা হয়েছে। যা কলমের ভাষার প্রকাশ কর অসম্ভব। এতে দুবাই থেকে আগত ব্যাণ্ড পার্টির মাধ্যমে ড্যান্স পরিবেশন করা হয়। অবশেষে দর্শকরাও নারী নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় নাচতে শুরু করে। মদের নেশায় বৃদ্ধ হয়ে সারারাত্রি কাটানোর পর ড্রাইভার তাদের কে ধরে নিয়ে গেছে। নিজেদের কোন হুশ জ্ঞান ছিল না।

রোটারী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

১৯৩৭ সালের ২২ শে ডিসেম্বর ঢাকায় রোটারী ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। মাত্র ৮৮জন ডিস্ট্রিক্ট সদস্য নিয়ে ১৯৩৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী সনদ প্রাপ্ত হয়। তখন থেকে রোটারী কার্যক্রম প্রসারিত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৮০ এর তত্ত্বাবধানে ২০৫ টি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার মোট সদস্য সংখ্যা ৪৩০০। এছাড়াও অনেক জুনিয়র ক্লাব রয়েছে যেমন, রোটারাক্ট ক্লাব (সদস্য ১৮০)। ইন্টারাক্ট ক্লাব (সদস্য ২০)। রোটারী কমিউনিটি কোর্পস (সদস্য ৫০)

ম্যাসুদী-ইহুদী সন্তাসী গোষ্ঠী

ইহুদীরা উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্ত ফেৎনাবাজ মেধা দিয়ে সারা দুনিয়া গোপন সংস্থা ও সংগঠনগুলোর জাল এমনভাবে বিস্তৃত করেছে যে, গোটা বিশ্বের নিরাপত্তা এক কথায় হুমকির মুখে আছে।

তাদের এসব পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা একদিকে যেমন ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্য তেমন গোটা বিশ্বের তাদের প্রভাব বিস্তার করার জন্যও বটে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে কিছুটা ধারণা রাখে এমন সকলেই জানেন যে, আমেরিকার উপর ইহুদিদের হাত কতটা শক্ত। রাশিয়ার মধ্যে ও ইহুদীরা যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে তাদের ক্ষমতার ও প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

ইহুদীদের কয়েকটি সংগঠন সম্পর্কে গোটা বিশ্ব মোটামুটি জানত। কিন্তু বর্তমানে তাদের নতুন এক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এই সন্ত্রাসী সংগঠনের নাম ম্যাসুনী আন্দোলন। এই সংগঠনের আওতায় আরো অনেক শাখা-সংগঠন আছে যা সারা বিশ্বে ইহুদী স্বার্থ রক্ষা বা আদায়ের জন্য কাজ করে ফেৎনার বাজার গরম করে রেখেছে। ম্যাসুনী এর অধীনস্থ কয়েকটি সংগঠনের নাম কোন কোন সময় প্রকাশও পেয়েছে। সবথেকে মারাত্মক যে নামটি প্রকাশ পেয়েছে তা হল P-2। এই মাত্র কিছু দিন আগে মানুষ তা জানতে পেরেছে। সর্বপ্রথম ১৯৮১ সালে ইটালির মেরানো শহরে পুলিশ জানতে পারে। একটি তদন্ত করতে গিয়ে মূলত তা জানতে পারে। তদন্ত ছিল আন্তর্জাতিক শিল্পপতি মিশেল স্যাভেনার ব্যাপারে। ১৯৭৯ সালে ইটালীর জেল থেকে সে পালিয়ে ইটালির জারমো শহরে, এরপর সেখান থেকে ৬০০ কিলোমিটার দক্ষিণে এরজাদ প্রদেশের এক কাপড় ব্যবসায়ী জিশোজালাল্লীর কাছে আশ্রয় নিয়ে পূর্ণ দত্তের পর যখন পুলিশ জিশোজালাল্লীর ঘরে তল্লাশী চালায় তখন এক ভয়ংকর তথ্য হাতে আসে। কাগজগুলো ছিল ম্যাসুনের অধীনস্থ সংগঠন Lagruppa gelli Prapaganda due

এর। যার সংক্ষেপন হল P-2। জিশো ছিল সংগঠনের গ্রাণ্ড মাস্টার। জালালী ইহুদী ছিল। কাগজগুলিতে এক নাজুক লিস্ট ছিল যা ইটালির সংবাদ পত্রে ছাপা হলে সারা বিশ্ব হতবাক হয়ে পড়ে। লিস্টটি ছিল এই ভয়ংকর সংগঠনটির রাজনৈতিক সদস্য সংক্রান্ত। যাতে ইটালির মন্ত্রীসহ অন্যান্য ফেডারেল মন্ত্রীরাও ছিল। বিস্তারিত লিস্ট হল:

সংসদ সদস্য-৪৩

সেনা অফিসার-১৮৩

জেনারেল-৪৩

নৌবাহিনীর উচপদস্থ অফিসার -৮

সুপ্রিম কোর্টের জজ-১৯

গোয়েন্দা সংস্থা সমূহের প্রধান-৩

ইটালির বড় বড় শহরের ইন্সপেক্টর জেনারেল -৪

জাতীয় দৈনিক পত্রিকার প্রবীণ সাংবাদিক-২৪

এ সংবাদে শুধু ইটালিই হতবাক হয়নি; বরং গোটা ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোও হয়রান হয়ে যায়। তবে সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হল, যত দ্রুত এটা প্রকাশ পায় তার থেকে শতগুণ দ্রুত খবরটি গোপন হয়ে যায়। বরং যারা এর তদন্ত

করেছিল পরবর্তীতে তাদের বড় ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ফ্রান্সের এক সাংবাদিক তো একথাও লিখেছেন যে, যার পৃষ্ঠপোষক আমেরিকার সি.আই.এ এবং ন্যাটো তাদের তদন্ত করা অসম্ভব। কিন্তু মিশরী বিশ্লেষক আনোয়ার আল জুনদী, আইনুশ শামস ইউনিভার্সিটি কায়রোর ইংরেজী সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর আব্দুল ওয়াহাব যথেষ্ট গবেষণালব্ধ আলোচনা করেছেন।

P-2 ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক ম্যাসুনী আন্দোলনের অংশ হিসেবে ইটালীতে গঠিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সংস্থাটির লক্ষ্য ছিল। ইটালীর ক্ষমতাস্বার্থক ব্যক্তিদেরকে নিজেদের দলভুক্ত করা। যাতে ইহুদী স্বার্থকে সহজে রক্ষা করা যায়। ইটালীতে এর পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় বিশিষ্ট শিল্পপতি জিগো জালান্নিকে। এই দায়িত্ব প্রাপ্তি দুবছর পূর্ব থেকেই তিনি ম্যাসুনী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে শরীক ছিলেন। তার বায়োডাটা যথেষ্ট অস্পষ্ট। ১৯১৯ সালে বস্টোয়া শহরে তার জন্ম। ১৮ বছর বয়সে স্পেনে যোগে সেনাবাহিনীর ৭৩৫ নম্বর কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত হন। স্পেনের গৃহযুদ্ধেও তিনি শরীক ছিলেন। তিনি জেনারেল ফ্রাংকোর অধিনে ছিলেন। এরপর ইটালী চলে আসেন। এসেই মসুলীনির সহায়তা শুরু করে দেন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সমাপ্তি ও মসুলীনির পরাজয়ের পর তার আর্জেন্টাইনে পলাতক অবস্থায় বিদেশী এক ইহুদী শিল্পপতির সাথে সাক্ষাত হয়। সে তাকে ইটালী ও আর্জেন্টাইনের মধ্যে ব্যবসা করার জন্য সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে জিগো কোটিপতি হয়ে যায়। কিছুদিন পর পিতৃবাস ইটালীতে ফিরে আসার চিন্তা করেন। সেখান থেকে অবসর নেন এবং নিশ্চুপে ম্যাসুনীর হয়ে P-2 এর গঠনে অবদান রাখে।

এ ব্যক্তি ইটালীর শক্তিদ্র ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদেরকে P -২ এর ছায়াতলে আনতে যথেষ্ট সক্ষম হয়েছিলেন। নতুন ম্যাসুনী সদস্যদের থেকে খুব শক্ত অঙ্গীকার নেয়া হত। সব কাজ জিগো জালান্নীর হাতে সম্পাদিত হত। যার উপর ভিত্তি করে ইটালির ক্ষমতাসীন সরকার সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা ইটালির ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনাও করেছিল সংগঠনটি। ইটালির প্রসিদ্ধ জেনারেল G-Allavena জি এলাভেনা যিনি মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স এর প্রধান ছিলেন। তিনি যথারীতি সংগঠনটির সদস্য হয়ে কর্মতৎপরতা শুরু করে দেন। সরকার ও দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপন নেতা জিগো জালান্নীর হাতে পৌঁছে দেন। আশ্চর্যের কথা হল, লোকটি শুধু সরকারের উপরই প্রভাব বিস্তার করেনি বরং খৃষ্টানদের মূল

কেন্দ্র ভ্যাটিক্যান সিটির উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তিনি জানয়াল স্টেটের খৃষ্টান পাদ্রীদেরকে ম্যাসুণীর সদস্য বানিয়ে ভ্যাটিকানে পরিচালনা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করেন। ভ্যাটিকানের উচ্চকক্ষের নেতাদের কাছে ম্যাসুণী কার্যক্রম পছন্দনীয় নয়। এমনকি একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, কারো বিরুদ্ধে ম্যাসুণীর তৎপরতা অভিযোগ পাওয়া গেলে তাকে ক্যাথলিক গ্রুপ থেকে বহিস্কার করা হবে। অন্যদিকে ক্যাথলিকদের গোপন সংগঠন Deious যা দ্বিতীয় পোপ ইউহান্না প্রিন্সের পৃষ্ঠপোষকতায় চলত তারা গোপনে ম্যাসুণীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। ১৯৭৬ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কতিপয় অফিসার রাষ্ট্রকে এ তথ্য দেয় যে, জিশোজালাল্লীর ম্যাসুণী তৎপরতার ফলে সে যথেষ্ট ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এটা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। ১৯৮১ সালে P-2 কে ১৭টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রতিটি অংশের ভিন্ন ভিন্ন পরিচালক নির্ধারন করা হয়। এদের সকলের গ্রাণ্ড মাস্টার ছিল জিশো জালাল্লী। মজার ব্যাপার হল, প্রতিটি বিভাগের প্রধানের কাছে অন্য বিভাগের প্রধানকে অজ্ঞাত রাখা হত। এরপর সংগঠনটি দেশের অভ্যন্তরে ধামাকা, হত্যা, অপহরন সহ নানান কর্মকাণ্ড শুরু করে দেয়। নিজেদের স্বার্থ হাছিলের জন্য অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠনকে তারা সহায়তা দিতো। তাদের কর্মতৎপরতা এত ব্যাপকতা লাভ করে যে, তা নিয়ন্ত্রন করতে না পারায় প্রধানমন্ত্রী ফাওলানী পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে প্রকাশ হয় যে, P-2 গোপনে এক গোপন সামরিক সংস্থা গ্লাডোকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে।

গ্লাডো

সামরিক সংগঠন গ্লাডো মূলত ন্যাটোর ইশারায় ইটালীতে গঠিত হয়। যার লাগাম সরাসরি আমেরিকা সি.আই.এর হাতে ছিল। সংগঠনটির সর্ববৃহৎ লক্ষ্য ছিল ইটালিয়ান কমিউনিস্ট পার্টিকে ক্ষমতায় আসা থেকে বাধা দেয়া। উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা সারা দেশে খুন, হত্যা, অপহরন, বোমা ধামাকা ইত্যাদি ঘটিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলা। আমেরিকার প্রাক্তন এজেন্ট Brenkeke এ কথা স্বীকার করেছে যে, ম্যাসুণী সংগঠন P-2 উচ্চমাত্রায় লক্ষ্য অর্জন দেখিয়ে সি.আই.এ থেকে অনেক অর্থ উপার্জন করেছে। কখনও সি.আই.এ থেকে এক মাসে দশ মিলিয়ন ডলারও অর্জন করেছে।

ইটালিয়ান তথ্য বিশ্লেষক কাসুন ম্যাসুণী ও সি.আই.এর মাঝের সম্পর্কের কথা জনসম্মুখে তুলে ধরেন। কিন্তু সি.আই.এর তৎপরতা তা পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। ন্যাটো শুধু ইটালিতেই এ ধরনের সংগঠন তৈরী করেছে এমন নয়।

বরং প্রতিটি দেশেই তাদের স্বার্থে বিভিন্ন নামে সংগঠন তৈরী করে রেখেছে। এসব সংগঠন একেকটি দেশে একেক নামে পরিচালিত হচ্ছে। ইটালী ভাষায় গ্লাডো অর্থ কর্তনকারী ছুরি।

বিভিন্ন দেশের সংগঠনগুলোর নাম নিম্নরূপ:

বেলজিয়াম SDRA-8

ফ্রান্স ROSE AIR

ইউনান SHEEPSKIN

তুরস্ক KONTRGERILLA

জার্মানি SILANTTRAP

হলান্ড NATO COMMAND

ব্রিটেন SECRET BRITISH NET WORK

অস্ট্রেলিয়া SCHWERT

স্পেন STA BEHIND

এসকল শাখার সদর দপ্তর ব্রুকসেলে অবস্থিত। স্বত্বব্য যে, এটা ন্যাটোর হেড কোয়ার্টার ও ন্যাটোর বাৎসরিক সম্মেলনের সাথে সাথে এর শাখাগত সংগঠনগুলোর সদস্যদের বৈঠক হয়। যাতে ন্যাটোতে গৃহিত সকল পদক্ষেপ তাদের ভালভাবে জানা থাকে। এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সাজানোর ক্ষেত্রে আপোষে পরামর্শ ও সহায়তার মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে।

হল্যান্ডে ন্যাটোর অনেক বড় বিমান ঘাটি অবস্থিত। সেখানের অফিসারদের বিনোদন ও মাস্তুরি জন্য যে সকল বার ও নাইট ক্লাব সেখানে অবস্থিত সেগুলো সব এই গোপন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের মালিকানাভুক্ত।

এই ম্যাসুনি সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিস তো ব্রুকসেলে অবস্থিত এর প্রশিক্ষন কেন্দ্র সাউনিয়া দ্বীপে ন্যাটোর বিমান বন্দরের কাছে অবস্থিত। যেখানে ন্যাটোর সামরিক অফিসারগণ সংগঠনের নতুন সদস্যদেরকে অত্যাধুনিক অস্ত্র পরিচালনা ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিচালনার প্রশিক্ষন প্রদান করে। পরবর্তীতে অবশ্যই স্থানটি ন্যাটোর অস্ত্রপাচারে সব থেকে বড় ঘাটি বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সংগঠনটি গোপনে ইটালিতে গোপন অস্ত্রাগারও তৈরী করে রেখেছিল। ১০০টি ছিল ফেনেসিয়া শহরে। অন্যান্য শহরে ছিল ৩৯ টি। অস্ত্রাগারগুলো মাটির অতিগভীরে অবস্থিত ছিল। কবরস্থান অথবা গীর্জার কাছাকাছি এসব অস্ত্রাগার নির্মাণ করা হত। ১৯৮৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী ওলফ

পামলকে হত্যার পিছনে এই গ্লাডোর হাত ছিল। তার অপরাধ ছিল শুধু মক্ষের প্রতি টান। এ জন্য আমেরিকার বেল্টিক প্রনালীতে সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজ চলতে দেখা গেছে।

মূলপ্রশ্ন হল, পর্দার পিছনে বিশ্বে কারা রাজত্ব করছে? এটা অনেক আলোচনা সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায় যে, ম্যাসুনী আন্দোলন ও তার অধীনস্থ সংগঠন P-2, গ্লাডোর মত ইত্যাদি সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো একত্র হয়ে বিশ্বের বড় একটি অংশের উপর ক্ষমতার অপচর্চা করছে। প্রতিটি দেশের মিশনারী কর্মকর্তারাও তাদের হয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা একথা ভালভাবে জানি যে ম্যাসুনীবাদ মূলত আন্তর্জাতিক জায়নবাদের একটি বড় অংশ। এজন্যই ইটালির ম্যাসুনী সংগঠন P-2 এর সাথে ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ইটালির কোটিপতি ইহুদী তাজ করলোডী ব্যান্ট P-2 এর ও সদস্য। যার আলোচনা মোসাদের সাবেক এজেন্ট ভিক্টর ভেস্কো আপন ডায়রীতে লেখে গেছে। ১৯৯৪ সালে তা প্রকাশ হয়েছিল। লেখক তাতে বলেন, এদের সম্পর্ক একটি ত্রিভুজের ন্যায়। অর্থাৎ ভয়ংকর মোসাদ, P-2 ও গ্লাডো একটি ত্রিভুজ যাদের হাতে আন্তর্জাতিক অস্ত্রবানিজ্য পরিচালিত হয়।

মোসাদ

Mossad

الموساد



জাতীয় পতাকা

লোগো

সদরদপ্তর

পূর্ণনামঃ “HA MOSSAD, LE MODIYN VE LE TAFKIOIM
MAYUHADIMÓ

The institute for intelligence and special oprations.

الموساد للاستخبارات والمهام الخاصة

প্রতিষ্ঠাঃ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৯

পূর্বসংস্থাঃ হাগানা

কর্মীঃ ১২০০ আনুমানিক

বার্ষিক বাজেটঃ গোপনীয়

নীতি বাক্যঃ (কোন নীতি নেই, দুর্নিতিবাজ)

সংস্থাপ্রধানঃ ইয়োসি কোহেন

অভিভাবক সংস্থাঃ

ওয়েব সাইটঃ www.mossad.gov.il

মোসাদ

Mossad

الموساد

ইসরাইলের হিংস্র ও সন্ত্রাসী গোয়েন্দা সংস্থা ।

গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান রাখেন এমন যে কারো নিকটে একথা স্পষ্ট যে, পৃথিবীর সর্বাধিক জটিল ও কুটিল গোয়ান্দা সংস্থা হল মোসাদ । সমগ্র বিশ্বের সবচেয়ে বেশী রক্তপিপাসু ও কর্মক্ষম ইহুদীদের এই সংস্থার পূর্ণ নাম হল (যা মোসাদ একাডেমী এর বাইরে লেখা রয়েছে) : “HA MOSSAD, LE MODIYN VE LE TAFKIOIM MAYUHADIMÓ যার ইংরেজী অনুবাদ হলঃ The institute for intelligence and special oprations.

মোসাদ আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন-এর গোয়ান্দা সংস্থা থেকে অধিক কর্মক্ষম। এই সংগঠনটি বিশ্বের সবচেয়ে বেশী জটিল ও আক্রমণাত্মক। যখন ইচ্ছা পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী করতে সক্ষম।

আন্তর্জাতিক শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনায় এরা অতি বেশী সক্রিয়। ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের এই সফলতার সবচেয়ে বড় কারণ হল দুনিয়ার সকল ইহুদী মোসাদের সহায়তা করে।

মোসাদের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি হল, আমরা মধ্য প্রাচ্যের কেন্দ্রে রয়েছি, সুতরাং আমাদেরকে প্রতিবেশী দেশ সম্পর্কে নিয়মিত খবরাখবার রাখতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আটকে পড়া ইহুদীদেরকে বের করা এবং তাদের সাহায্য করা তাদের এক গুরুত্বপূর্ণ মিশন।

এই ইহুদী সংগঠন বিশ্বে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের যে রেকর্ড গড়েছে তা অন্য কেউ করতে পারেনি। এর এজেন্টরা কয়েকটি যুদ্ধেই বিজয়ের জন্য ইসরাইলকে যারপর নাই সহায়তা দিয়েছে এবং কিছু আরব রাষ্ট্রের ক্ষমতার মসনদ উল্টাতে সহায়তা করেছে।

মোসাদের প্রধান সর্বদা ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য। ইসরাইলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গোয়েন্দাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মোসাদের প্রধানকে নিয়োগ দেন এবং তার মেয়াদ পাঁচ বছর।

মোসাদের সদস্য হওয়ার শর্তাবলী

মোসাদের সদস্য হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য

১. স্বাভাবিক গড়ন ও আকৃতির হওয়া
২. মেধাবী ও সক্ষম হওয়া।
৩. বাহ্যিক সুখ্যাতি ও সুনাম বিমুখ হওয়া।
৪. পুরুষ হোক, মহিলা হোক কর্মক্ষম হওয়া।
৫. ইহুদী হওয়ায় নিজেকে গর্বিত মনে করা।
৬. কৃষকের সন্তানকে অধিক উপযুক্ত মনে করা হয়।
৭. শিক্ষিত ও উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী হওয়া।
৮. শরীর মজবুত হওয়া। দৈহিক কাঠামো মজবুত হওয়া।
৯. দুঃসাহসি ও বাহাদুর হওয়া।

সদস্য হওয়ার পরে দীক্ষা

১. সপ্তাহে দু'বার কাজের হিসাব নেয়া।
২. যে কোন জায়গায় কাজের রিপোর্ট নেয়া হতে পারে।
৩. কম বেতনে বেশী কাজের দীক্ষা দেয়া হয়।
৪. দুনিয়ার চাকচিক্য ও বিলাসিতার জীবন যাপন দেমাগ থেকে দূর করে দেয়া হয়।
৫. নিজস্ব কোড দেয়া হয় এবং বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়।
৬. আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭. স্মরণশক্তির পরীক্ষা নেয়া হয়, এতে খুব কম লোকই উত্তীর্ণ হয়।
৮. সম্মোহনী সৃষ্টিকারক ও প্রভাব বিস্তারকারী কথাবার্তা শিক্ষা দেয়া হয়।
৯. বিশেষভাবে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয়।
১০. ভিন্ন দেশে পৌঁছে সে দেশের পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার বিদ্যা শিক্ষা দেয়া হয়।
১১. মিশন সফল করতে বিবাহও করতে পারে।
১২. ইহুদী হওয়াতে নিজেকে গর্বিত মনে করার মানসিকতা তৈরী করা হয়।
১৩. উদ্দেশ্য হাছিলে জানকে ঝুকিতে ফেলার মানসিকতা তৈরী করা হয়।
১৪. কীর্তি ও কর্ম অনুযায়ী স্তর বিন্যাস করা হয়।

প্রথমে ইসরাইলী ইন্টেলিজেন্স এন্ড সিকিউরিটি সার্ভিস (SHAY) নামক ক্ষুদ্র ইনফরমেশন ইউনিটের মাধ্যমে নিজেদের কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে বৃহৎরূপ ধারণ করে। এ গোপন সংগঠনের কর্মকর্তাদের নিকট গোয়েন্দাগীরির সকল অত্যাধুনিক অস্ত্র ও যন্ত্র রয়েছে। যা সব ধরনের চ্যালেঞ্জ ও পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। বর্তমানে সারা বিশ্বেই মোসাদের এজেন্ট বিদ্যমান এবং অনেক দেশে এর নিটওয়ার্ক ব্যাপকভাবে বিস্তৃত।

এর কবজা থেকে আমেরিকা কেন, হোয়াইট হাউজও সংরক্ষিত নয়। এই সংগঠনই ইরাকের এটমি রি-এক্টর ধ্বংস করেছে। এছাড়া এর মাধ্যমে ইসরাইল ১৯৬৭ সালে মিসর, সিরিয়ার গোলান পাহাড়ী এলাকা, সিনাই উপত্যকা ও দেশটির পশ্চিমাঞ্চল দখল করে নেয়।

এই সংগঠনটি হত্যা, গুম, অপহরণ, সন্ত্রাস এবং কমান্ডো একশনকে নিজেদের জন্য বৈধ মনে করে। মোসাদ এতই সক্রিয় সংগঠন যে, তারা আরবের কয়েকটি দেশের শাসন ক্ষমতা বদলিয়ে দিয়েছে। বারবার আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনকারী হিসাবে নিজেদেরকে প্রমাণ করেছে।

প্রতিষ্ঠা

১৯২৯ সালে জুরিখ জার্মানে ইহুদীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংঘটিত হয় তখনই এই গোপন সংগঠনটি অস্তিত্বে আসে।

প্রতিষ্ঠার সময় এর দুটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়।

১. ইহুদীদের অধিকার সংরক্ষণ করা।
২. ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে শক্তিতে পরিণত করা। SHAY মূলত এই সংগঠনটির শাখা প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে SHAY ইহুদীদের আভার গ্রাউন্ড সন্ত্রাসী সংগঠন হাগানাহ (HAGANAH) ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত) এর ইন্টেলিজেন্স ও সিকিউরিটির সহযোগী সংগঠনের রূপ নেয়। সে সময় হাগানাহর (HAGANAH) আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে চলছিল। ইহুদিদের স্বার্থ উদ্ধার ও সংরক্ষণের জন্য এই সংগঠনটি সারা বিশ্বে জাল ছড়িয়ে দেয়। যার উদ্দেশ্যে নিম্নরূপঃ
১. নাৎসি জার্মানের যুদ্ধ পরিকল্পনাগুলোকে নস্যাত করা।
২. ইহুদি সশস্ত্র সংগঠনগুলোকে অস্ত্র সরবরাহ করা এবং লড়াই চলাকালীন তাদের নিরাপত্তা দেয়া।
৩. ফিলিস্তিন এবং প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলোর নেতৃত্ব পরিবর্তনযোগ্য বলে যারা সশস্ত্র বিরোধিতায় লিপ্ত তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ও তাদের কন্ট্রোল করা।
৪. আরবদের কিছু লোককে এজেন্ট বানিয়ে তাঁর মাধ্যমে কাজ হাসিল করা। যে নিজেকে ইহুদীবিরোধী রূপে প্রকাশ করে তার মাধ্যমে রাজনৈতিক রহস্য ও গোপন তথ্য উদ্ধার করা।
৫. গোয়েন্দাগীরির মাধ্যমে বৃটেনের শাসকবর্গের তথ্য সংগ্রহ করে ইহুদী নেতাদের অবগত করা।
৬. স্নায়ুযুদ্ধ ও প্রোপাগান্ডার জন্য স্বাধীন ইসরাইলী নেতৃত্বকে সহায়তা প্রদান করা।

ইসরাইল প্রতিষ্ঠা

পূর্বোল্লিখিত সংগঠনের সহায়তা ও আমেরিকার পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধানে ১৯৪৮ সালে 'স্বাধীন' ইসরাইল প্রতিষ্ঠা হয়। এরপর এই সংগঠনকে সরকারী তহবীলের আওতায় আনা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিম্নোক্ত শাখাগুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১. পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স উইং
২. কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এন্ড ইন্টার সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট
৩. মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স
৪. পুলিশ ব্রাঞ্চ অব মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স
৫. লেভেল ইন্টেলিজেন্স এ্যান্ড সিকিউরিটি।

ইসরাইলের প্রতিষ্ঠালগ্নে এ সকল প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করত। নিজেদের গভির মধ্যেই থাকত। তবে কখনও আপোষের মধ্যে বিরোধিতায় লিপ্ত হত। এতে অপরের প্রতি সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় কোন বাধা ছিল না। এমনকি একই সময়ে একটি টার্গেটের পিছনে তিন তিনটি প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট কাজ করত।

১৯৫১ সালে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী রিও শিলওয়া ইসরাইলের সমগ্র ইন্টেলিজেন্সকে নতুন ধাচে সাজিয়ে তোলেন।

ভাদা (VAADA)

এটা মূলত প্রিন্সিপাল ইন্টেলিজেন্স এণ্ড সিকিউরিটি অথরিটি এর সমমানের। এর কাজ হল সকল গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মাঝে সমন্বয় করা। কেননা এটা সকল সার্ভিসের পরিচালকদের দ্বারা গঠিত।

মোসাদ ব্যতীত অন্যান্য গোপন সংগঠন

(Shin Beth) শিনবেথ

এটা অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। এর দায়িত্ব নিম্নরূপঃ

১. ভি.আই.পি, ভি.ভি.আই.পি, সেনা অফিসার, রাজনীতিবিদ, সরকারী আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
 ২. শিল্পকারখানা, সমুদ্রবন্দর, বিমান বন্দর, এয়ার লাইন্স হেফাজত করা।
 ৩. বহিররাষ্ট্রে ইসরাইলী দূতাবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- এই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানও প্রধানমন্ত্রী।

মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স

এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হল সেনাবাহিনীর কার্যপ্রণালীর ইলেক্ট্রনিক তথ্য অর্জন করা। এর প্রধান হল সেনাবাহিনীর চীফ অব দা স্টাফ। এর কার্যাবলীর মধ্যে এটাও রয়েছে যে, স্থানীয় ইন্টেলিজেন্স এর প্রাক্কলন প্রস্তুত করা। ইসরাইলের এই সংগঠনটির সহায়ক অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হলঃ

১. রিসার্চ ইন্টারপলিটিক্ল প্লানিং সেন্টার
 ২. মিনিস্ট্রি অব ফরেন এ্যাফেয়ার্স
 ৩. স্পেশাল টাস্ক ডিভিশন পুলিশ যা অনুসন্ধানের কাজ করে।
 ৪. সীমান্ত রক্ষীবাহিনী
 ৫. মিলিটারি অব ফিনান্স (EIAI)
 ৬. জাতীয় ইসরাইল এয়ার লাইন্স (ZIN)
 ৭. জাতীয় জাহাজ কম্পানি
 ৮. ইহুদীবাদী সংগঠন সমূহ।
 ৯. দেশে ও দেশের বাহিরে বসবাসরত ইহুদী প্রজন্ম এর সাথে সম্পৃক্ত।
- ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে ইসরাইল সরকার অরকান্ট কমিশন গঠন করে। যা নতুনভাবে ইন্টেলিজেন্স এন্ড সিকিউরিটি এর আগাগোড়া নিরীক্ষন করে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো তালিকাভুক্ত করেছে-
১. স্পেশাল এডভাইজার টু প্রাইম মিনিস্টার এর চুক্তিকে আরো শক্তিশালী করতে হবে এবং এই চুক্তির উপর ইন্টেলিজেন্স এন্ড সিকিউরিটি সার্ভিসেস এর রিপোর্ট গুলি বুঝতে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে হবে, যে রিপোর্টগুলো গভীরভাবে যাচাই করবে এবং এর আলোকে সার্ভিসেসের তৎপরতাকে যথার্থ পর্যবেক্ষন করে প্রধান মন্ত্রীকে ব্রিফিং করার উপযুক্ত হবে। প্রধানমন্ত্রীর পূর্বে জেনারেল রাহাম বাম জিউ ইন্টেলিজেন্স এডভাইজার ছিল।
 ২. ইন্টেলিজেন্স এর প্রাক্কলন এর জন্য মোসাদের মধ্যে একটি রিচার্স ইউনিট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ ইউনিট মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স থেকে পৃথক হবে।
 ৩. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি পলিটিক্ল প্লানিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যা বিশেষভাবে মোসাদের সাথে সম্পর্ক রাখবে। এবং অন্যান্য সার্ভিসগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখবে। শুধু মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এর উপর ভরসা না করে আরেকটি এজেন্সি দিয়ে তাকে চেক করানো প্রয়োজন।
 ৪. কার্যত সকল সার্ভিসগুলোর একে অপরের সাথে সম্পর্ক হবে রিপোর্ট একত্র করার জন্য। অপরকে নিজেদের চূড়ান্ত সুপারিশগুলো দেখাবে না। সকলেই যার যার হেডকোয়ার্টার ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিবে।
- এ সমস্ত সুপারিশের আলোকে সার্ভিসেসের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। অনেক যুবককে পদনোতি দেয়া হয়েছে। ১৯৭৭- এ ফেয়ারেল কমিটি অন সিকিউরিটি আফেয়ার্সও প্রতিষ্ঠিত হয়।

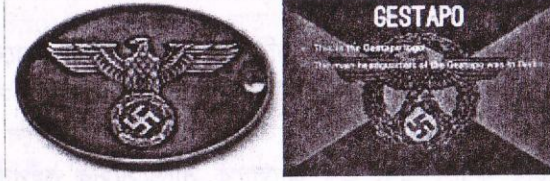
ব্যবস্থাপনা

বাজেট ও বিভিন্ন অপারেশনকে গোপন রাখার জন্য আই. ডি.এফ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সকল সার্ভিসকে ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রদান করে। প্রকৃত ব্যয় গোপন রাখার প্রতি কড়া নজর রাখা হয়। ব্যবস্থাপক ও রাষ্ট্রীয় কোষাগারের কিছু উচপদস্থ কর্মকর্তা ব্যতীত আর কেউ এ সম্পর্কে অবগত হতে পারে না।

এই 'জাতীয় সম্পদ'কে যথার্থ পদ্ধতিতে খরচ করা হয়েছে বলে জনগণের কাছে বিশ্বস্ত করার জন্য ব্যবস্থাপকরা বাৎসরিক অডিটও করে এবং ব্যয়কে সঠিক অথবা ভুলের ভিত্তিতে প্রস্তুত করে।

গেস্টাপো

হিটলারের শাসনামলে জার্মানির গোয়েন্দা সংস্থা গেস্টা পো



লোগো

গঠিতঃ ২৬ এপ্রিল ১৯৩৩

পূর্বসংস্থাঃ Prussian Secret Police

বিলুপ্তিঃ ৮ই মে ১৯৪৫

ধরণঃ গুপ্ত পুলিশ

অধিক্ষেত্রঃ নাৎসি জার্মানি

সদর দপ্তরঃ বার্লিনের প্রিন্স আলব্রেখ্ট স্ট্রীট

কর্মী সংখ্যাঃ ৩২০০০ (১৯৪৪)

অভিভাবক সংস্থাঃ Allgemeine SS RSHA Sicherheitspolizei

নাৎসি শাসক হিটলারের সময়ে জার্মানির গোয়েন্দা সংস্থার নাম ছিল “গেস্টাপো”। হিটলারের বক্তব্য ছিল- ব্রিটেনের সকল ইংরেজকে ইংল্যান্ডে ডুবিয়ে মারব। শুধু নারীদের বাচিয়ে রাখব। বিশ্বযুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে জার্মানি সৈন্যরা যেমন সফলতা লাভ করেছে তেমনি গোয়েন্দা সংস্থা গেস্টাপোও

সন্ত্রাসের প্রতীক সাব্যস্ত হয়েছে। গোটা বিশ্বে সম্মিলিত বাহিনীর গোয়েন্দাদেরকে পদে পদে পরাজিত করেছে। আজও হিটলারের নির্যাতন কাহিনী লোকমুখে প্রসিদ্ধ। এক সময় হিটলার আদেশ দিয়েছিল, সকল প্রসূতি নারীকে প্রসব করতে বাধ্য কর এবং তাদের সাথে যৌনাচরণ কর। যে নারী অস্বীকৃতি জানাবে তাকে গুলি করে হত্যা কর। সে সময় অসংখ্য নারী আপন ইচ্ছিত রক্ষার্থে আত্মহত্যা করেছে।

হিটলারের সব থেকে বেশী নির্যাতন ছিল ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর। তাদের ব্যাপকভাবে আটক করে, গুলি করে অথবা বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগে হত্যা করেছে। কারণ ছিল, ইহুদীদের অস্ত্রকারখানা চব্বিশ ঘন্টা নাথসি বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীকে সহায়তা করত। এ কারণে হিটলারের হৃদয়ে ইহুদীদের প্রতি ঘৃণা বসে যায়।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সহকর্মী জন সোভিরেল এক বক্তব্যে বলেন, সে সময় মার্শাল স্টালিন ইহুদীদের ব্যাপারে মার্কিন ও বৃটেনকে খুবই আন্তরিকতার সাথে বলত, তারা এক নির্যাতিত জাতি। তাদের ৩০ লাখ জনগন নারী-পুরুষ, বৃদ্ধসহ পূর্ব ইউরোপে এবং অর্ধলক্ষ পশ্চিম ইউরোপে গেস্টাপোর নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

জন সোভিরেল স্বীয়গ্রন্থ ‘ক্রিমিয়া থেকে পটসডাম পর্যন্ত’ তে (সানফ্রান্সিসকো থেকে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত) লেখেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান স্টালিন আবেদন করেছিল- জার্মানির উপর আরোপিত মুক্তিপণ দ্বিগুন করা হোক। যাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউরোপ থেকে বিতাড়িত ৩০ লাখ ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনে ব্যয় করা যায়। কিন্তু চার্চিল (যুক্তরাজ্যের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধচলাকালীন প্রধানমন্ত্রী) খুবই নমনীয়তার সাথে কূটনৈতিকের মত উত্তর দেয় “ফিলিস্তিনের সবুজ শ্যামল এলাকা খুবই সংকীর্ণ, ৩০ লাখ ইহুদী সেখানে থাকার সুযোগ নেই”।

ইসরাইল প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর ১৩ লাখ ইহুদী হত্যাকারী হিমলারকে (নাথসি যুগে হিটলারের ডান হাত) ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা আটক করে শাস্তি প্রদান করে।

জার্মানের এই গোয়েন্দা সংস্থা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতীক হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। সংস্থাটি এতই সক্রিয় ছিল যে, সম্মিলিত বাহিনী সর্বদা তাদের আতংকে থাকত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদী পূঁজিপতিরা সম্মিলিত বাহিনীকে অস্ত্র সরবরাহ করত। কেননা অস্ত্র কারখানাগুলো তাদেরই মালিকানায় ছিল। অন্যদিকে জার্মানে

অবস্থিত কারখানাগুলোর কর্মকর্তাদেরকে মালিকদের বিরুদ্ধে ধর্মঘট-আন্দোলন করতে উৎসাহিত করত যাতে জার্মানির অর্থব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এ সকল কারণে ইহুদীরা হিটলারের চক্ষুশুলে পরিনত হয়। ফলশ্রুতিতে লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে হিটলার খুবই নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সম্মিলিত বাহিনীর সামরিক ও বেসামরিক জাহাজগুলোকে সাবমেরিনের মাধ্যমে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন করে। ১৭ মে ১৯১৫ সালে বৃটেনের জাহাজ লুসিকে আয়ার ল্যাণ্ডের নিকট টার্গেট বানায়। দুটি টর্পেডো লাগাতেই জাহাজ এত দ্রুত ডুবে যায় যে, প্রাণ রক্ষার জন্য ছোট নৌকাগুলোও নামানোর সুযোগ পায়নি। এই জাহাজে ১২৫১ জন পর্যটক ও ৬৫০ জন কর্মকর্তা ছিল। এর মধ্যে প্রায় এক হাজার নিখোঁজ হয়ে যায়। নিখোঁজদের মধ্যে ১২৪ জন মার্কিন নাগরিকও ছিল। যাদের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রু উইলসনের এক বন্ধুও ছিল।

আমেরিকান নাগরিক নিহত হওয়ায় প্রেসিডেন্ট উইলসন জার্মানিদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। জার্মান প্রতিভুরে বলে দেয় যে, নিউইয়র্ক থেকে লুসি তানিয়া রওয়ানা করার পূর্বেই পত্রিকায় সতর্কবার্তা প্রচার করা হয়েছিল যে, কোন মার্কিন নাগরিক যেন এখানে ভ্রমণ না করে। এতদসত্ত্বেও তারা সতর্ক হয়নি। উপরন্তু পর্যটকদের আড়ালে জাহাজটিতে অস্ত্রের মজুদ ছিল। যা বৃটেনে পৌঁছানো উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বৃটেনও এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে।

এই ঘটনার পর আমেরিকা নতুনভাবে জার্মানির বিরুদ্ধে চিন্তা করতে বাধ্য হয়। যে এখনও বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি।

১৯১৫ সালে জার্মানি অস্ত্র হিসেবে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে। ১৯১৫ সালের ২২ এপ্রিল ওয়াই প্রেস রনাসনে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে সম্মিলিত বাহিনীর অবস্থা এতটাই খারাপ করে দেয় যে, তারা মোর্চা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। জার্মানি সৈন্যরা গ্যাস থেকে আত্মরক্ষার জন্য মাস্ক পরিহিত ছিল। যার ফলে শত্রুর মোর্চা দখল করা তাদের জন্য খুবই সহজ হয়। ব্যবহৃত গ্যাসের রং ছিল হলুদ। পৃথিবীর যুদ্ধ ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার হয়। এসকল কর্মকাণ্ড গেস্টাপোর অধিনে সম্পাদিত হত।

আরো বিস্তারিত শুনুন-

গেস্টাপো- গেহেইমে স্টাটজ পোলিসেই, গোপন পুলিশ) ছিল নাৎসি জার্মানি এবং জার্মানি অধিকৃত ইউরোপের গোপন পুলিশ বাহিনী। ১৯৩৩ সালে হেরমান গোয়েরিং প্রথম এই বাহিনী গঠন করে।

ঘটনা শুরু হয়েছিল ১৯৩৩ সালে। নাৎসিরা সবেমাত্র ক্ষমতায় বসেছে। নব্যগঠিত জোট সরকারের নাৎসি সদস্য ছিল মাত্র তিনজন। হিটলার, চ্যাম্পেলর

হিসাবে। উইলহেম ফ্রিক-অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী হিসেবে। হেরমান গোয়েরিং-দপ্তরবিহীন মন্ত্রী হিসেবে। গোয়েরিংয়ের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল। তিনি ছিলেন জার্মানির প্রুশিয়া অঞ্চলের প্রধানমন্ত্রী। যার কারণে প্রুশিয়ার পুলিশ বাহিনী ছিল সরাসরি তার নিয়ন্ত্রনে।

গোয়েরিং তার এই ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করেন। হিটলারের SA বাহিনীর কার্যকলাপে পুলিশী বাধাদানের উপর তিনি সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ফলে SA সরাসরি আকাশের চাদ হাত পেয়ে যায়। তাদের কার্যকলাপে বাধা দেয়ার মত কেউ ছিল না। যার ফলে পথেঘাটে নাৎসিবিরোধী ব্যক্তিরা SA কর্তৃক অকথ্য নির্যাতনের শিকার হতে লাগল। ইহুদীদের পরিস্থিতি ছিল আরও সঙ্গীন। যেখানেই কোন ইহুদী পাওয়া যেত সেখানেই তাকে সবার সামনে হেনস্তা করা হত। ইহুদি মালিকানাধীন দোকানগুলো বিনা কারণে SA সদস্যরা বন্ধ করে দিত।

ধূর্ত গোয়েরিং এরপর প্রুশিয়ান পুলিশের রাজনৈতিক ও গোয়েন্দা বিভাগকে আলাদা করে ফেলে। শুধু তাই নয়, তিনি রাজনৈতিক ও গোয়েন্দা বিভাগের অধিকাংশ কর্মচারীকে ছাটাই করে নাৎসিদের স্থলাভিষিক্ত করে। এভাবে প্রায় ৫০০০ নাৎসিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পরবর্তীতে ১৯৩৪ সালের ২৬ শে এপ্রিল গোয়েরিং পুলিশের রাজনৈতিক গোয়েন্দা শাখাকে একত্র করেন। নব্যগঠিত এই সংগঠনটির নাম দেয়া হয় Secret Police Office জার্মান ভাষায় রূপান্তর করলে দাডায় Geheimes Polizei Amt। সংক্ষেপে GPA। কিন্তু GPA নামটির সাথে সোভিয়েত পলিটিক্যাল পুলিশ GPU এর নামের অনেক মিল থাকায় নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় Secret State Police জার্মানি ভাষায় Geheime State polizei।

এতে কিন্তু গেস্টাপো নাম পাওয়া যায় না। মূলত একজন পোস্ট অফিস কর্মকর্তা Geheime State polizei এর নামে নতুন স্টাম্প ছাপাতে গিয়ে দেখে স্ট্যাম্পের তুলনায় নামটি বেশ বড়। তখন তিনি শব্দ তিনটির শুরু থেকে Ge Stapo একত্র করে নাম রাখেন Gestapo। তখন থেকে এর নাম হয় গেস্টাপো। কার জানাছিল যে, এই নামটিই ক'দিন পর সকলের জন্য আতংক হয়ে আবির্ভূত হবে। গেস্টাপো প্রতিষ্ঠার পরপরই গোয়েরিং একে নিজ স্বার্থ হাছিলের জন্য ব্যবহার শুরু করে দেয়। এরপর গোয়েরিং রুডলফ ডাইলস্কে গেস্টাপোর প্রধান হিসাবে মনোনীত করে। ডাইলস্ ছিল প্রুশিয়ান পুলিশ বাহিনীর সিনিয়র উপদেষ্টা।

১৯৩৪ সালের ২০ এপ্রিল গোয়েরিং SS প্রধান হেনরিখ হিমলারের হাতে গেস্টাপোর দায়িত্ব তুলে দেয়। যেহেতু নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের জন্য রুডলফ ডাইলস উপযুক্ত নয় তাই কসাই হিমলারের কাছে দায়িত্ব অর্পন করে।

গেস্টাপোর প্রধান হয়ে হিমলারের এক প্রকার সুবিধা হয়। সে ছিল প্রশিয়াবাদে গোটা জার্মানির পুলিশ ফোর্সের প্রধান। গেস্টাপোর নিয়ন্ত্রন লাভের মাধ্যমে সে গোটা জার্মানির পুলিশ ফোর্সের প্রধান বনে যায়। নাৎসিরা গেস্টাপোকে নাৎসি জার্মানির গোপন ত্রানকর্তা হিসেবে অবিভূত করত। বিদ্রোহ, এস্পিওনাজ, স্যাবোটাজ, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিয়োজিত ছিল গেস্টাপো। ১৯৩৬ সালে গেস্টাপো আইন পাশ করে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান করায়।

গেস্টাপোর আইনের মূল অংশটি ছিল নিম্নরূপ:-“Neither the instrucion, nor the affairs of the Gestapo, will be open to reveiw by administrative court এই আইনটির বদৌলতে গেস্টাপো বিচার ব্যবস্থার ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। স্বীয় কার্যকলাপের জন্য সে কারও কাছে দায়বদ্ধ নয়।

১৯৩৬ সালে গেস্টাপোকে জার্মানির National crime police সংক্ষেপে Kripo এর সাথে একত্র করা হয়। এর নাম দেয়া হয় Secret police দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে Sipo ও জার্মানির অন্যান্য গোয়েন্দা এবং অপরাধ দমন বিভাগগুলোকে একত্র করে গড়া হয় Reich Main Security Office সংক্ষেপে RSHA।

আশ্চর্য ব্যাপার হল, গেস্টাপো ছিল অতি ক্ষুদ্র একটি সংগঠন। সর্বমোট কর্মচারী ছিল ৪০০০০। এতে একটি সুবিধা হয়। তাহল- এজেন্টদের জন্য সহজে জনগনের সাথে মিশে যাওয়া সম্ভব ছিল। একেকজন গেস্টাপো এজেন্টকে ঘিরে গড়ে উঠত হাজার হাজার সৌখিন গোয়েন্দা ও তথ্য সংগ্রাহকদের একটি বিশাল নেটওয়ার্ক। যে কেউ গেস্টাপোর এজেন্টদের চর হতে পারত। বাড়ির কাজের লোক থেকে শুরু করে দুধওয়ালা, মুদির দোকানদার, পেপার বয়, পরিবারের পিতা, মাতা, কন্যা, পুত্র যে কেউ। সৌখিন গোয়েন্দাদের জাল এত গভীরে ছড়িয়ে যেতো যে, অধিকাংশ সময়ে গোয়েন্দাদের পক্ষে জানাও সম্ভব হত না যে, মূল গেস্টাপো এজেন্টটি কে? এতে জনগণের মনে এক ভয়ানক ত্রাসের সৃষ্টি হয়। গেস্টাপো শুধু জার্মানিতে নয় বরং জার্মানি বাদে যুদ্ধের সময় জার্মান অধিকৃত অন্যান্য দেশেও সক্রিয় ছিল।

গেস্টাপোর ভয়ে সাধারণ মানুষ নিজেদেরকে কথাবার্তা, কাজে কর্মে সংযত করে তুলে। নাৎসি বিরোধী কোন কথা বা কাজ করলে নিশ্চিতভাবে কোন একদিন গেস্টাপো এজেন্টের সাথে আচমকা সাক্ষাত হয়ে যেত। এরপর রাতের অন্ধকারে সে ব্যক্তির বাড়িতে গেস্টাপো হেড কোয়ার্টারে দেখা করার আদেশ সম্বলিত চিঠি পৌঁছে যেত। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ফোনে আড়িপাতার ব্যাপারটি ছিল মা'মুলী ঘটনা। বার্লিনের প্রিন্স আলব্রেস্ট স্ট্রীকে গেস্টাপো হেডকোয়ার্টার ছিল। ১৯৩৩ সালের পর থেকে মানুষ এখানে আসতে ভয় পেত।

১৯৪২ সালে গেস্টাপোর কাজের ধরণ পাল্টে যায়। হিটলারের জারীকৃত এক ডিক্রি অনুসারে গেস্টাপো এজেন্টগণ Night And Fog নামক নতুন অপারেশন শুরু করে। যার ফলে প্রায়ই নাৎসি বিরোধীদের রাতের অন্ধকারে চিরকালের জন্য হারিয়ে যেতে দেখা যায়। জনগণের মনে আতংকের মাত্রা আরেক ধাপ বাড়ানোর জন্যই এমনটি করা হয়।

গেস্টাপোর অধীনে ৫টি ডিপার্টমেন্ট কাজ করত। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কর্মক্ষেত্র ছিল।

১. ডিপার্টমেন্ট A (রাষ্ট্রের শত্রু)

ক) কমিউনিস্ট

খ) কাউন্টার স্যাবোটাজ বা প্রতি অন্তর্ঘাত

গ) প্রতিক্রিয়াশীল ও উদার ব্যক্তিত্ব

ঘ) গুপ্ত হত্যা

২. ডিপার্টমেন্ট B (চার্চ ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়)

ক) ক্যাথলিক

খ) প্রোটেস্ট্যান্ট

গ) ফ্রিম্যাসন

ঘ) ইহুদী

৩. ডিপার্টমেন্ট C

প্রশাসনের ও অন্যান্য সকল কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের 'যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ'।

৪. ডিপার্টমেন্ট D

ক) রাইখের বাইরে রাষ্ট্রের শত্রু

খ) রাইখের বাইরে চার্চ ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়।

৫. ডিপার্টমেন্ট E (কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স)

ক) রাইখের অভ্যন্তরে

খ) নীতি নির্ধারক

গ) পশ্চিম ফ্রন্ট

ঘ) স্কাভেনেভিয়া

ঙ) পূর্ব ফ্রন্ট

চ) দক্ষিণে

১৯৩৩ সালে সৃষ্টি হবার পর থেকে ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হবার আগ পর্যন্ত মানুষের কাছে গেস্টাপো ছিল ভীতিজাগানিয়া এক নাম। যুদ্ধ শেষে অন্যান্য নাৎসি সংগঠনের সাথে গেস্টাপোকেও অবৈধ ঘোষণা করা হয়। জার্মানি এক ভয়ংকর গোয়েন্দা সংস্থার কবল থেকে মুক্তি পেয়ে হাফ ছেড়ে বাচে।

এন.এস.এ

NSA

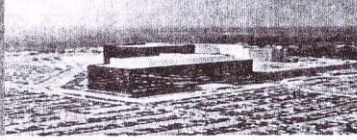
این ایس ای



লোগো



অফিসিয়াল পতাকা



সদর দপ্তর

পূর্ণনামঃ National Security Agency (NSA)

وكالة المخابرات المركزية الامريكية

প্রতিষ্ঠাঃ ৪ নভেম্বর ১৯৫২

কর্মীঃ ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজার প্রায়

বার্ষিক বাজেটঃ ১০.৮ বিলিয়ন (২০১২)

সদর দপ্তরঃ ফোর্ট মিডল মেরিল্যান্ড, ইউ.এস।

সংস্থাপ্রধানঃ পরিচালক-এডমিরাল মাইকেল এস. রোজার্জ (ইউ.এস. নেভি)

উপপরিচালক-রিচার্ড লেজেট

ইসলাম ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ❖ ১০৯

ওয়েব সাইটঃ www.nsa.gov

এফ.বি.আই

F B I

ایف بی ای



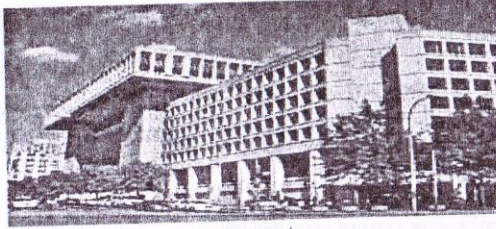
লোগো



অফিসিয়াল পতাকা



ব্যাজ



সদর দপ্তর

পূর্ণনামঃ

FEDERAL BUREAU OF INTELLIGENCE

مكتب التحقيقات الفيدرالي

প্রতিষ্ঠাঃ ২৬ শে জুলাই ১৯০৮

কর্মীঃ ৩৫,১০৪(২০১৪)

বার্ষিক বাজেটঃ ৮.৩ বিলিয়ন(২০১৪)

সদর দপ্তরঃ জে.এডগার হুভার বিল্ডিং, ওয়াশিংটন ডিসি।

নীতি বাক্যঃ আনুগত্য, নির্ভিকতা, শুদ্ধতা।

সংস্থাপ্রধানঃ পরিচালক-জেমস বি.কোমি।

উপপরিচালক-মার্ক এফ. জুলিয়ানা

ওয়েব সাইটঃ www.FBI.gov

এফ. বি. আই F B I ایف بی ای

৪৭ হাজার কর্মকর্তার গোয়েন্দা পুলিশ।

এফ.বি.আই (F.B.I) এর বিস্তারিত হল- FEDERAL BUREAU OF INTELLIGENCE. এফ.বি.আই এমন একটি গোয়েন্দা সংস্থা যা পৃথিবীজুড়ে বিখ্যাত স্বতন্ত্র অত্যাধুনিক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি। এফ.বি.আই-এর লস এঞ্জেলস, নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন ডিসির তিন ফিল্ড অফিসের বাজেট পাকিস্তানের সামরিক বাজেটের তিন গুন এবং জাতীয় বাজেটের থেকে বেশী।

৫৬ ফিল্ড অফিসের কাছে নিজস্ব উড়োজাহাজ, হেলিকপ্টার ও মটর বোট রয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এই এজেন্সি সারা বিশ্বের ফোনালাপ রেকর্ড করতে সক্ষম। চলন্ত গাড়ীর ইঞ্জিন নম্বর বলতে পারঙ্গম। কোলাহলের মধ্যে জনতার হৃদকম্পন শুনতে পারে। খেলারত বাচাদের অপরাধ প্রবণতা অনুমান করতে পারে। অপরাধীদেরকে বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে মেকআপ ও প্লাস্টিক সার্জারির মধ্যেও শনাক্ত করতে পারে। এছাড়াও ডি.এন.এ টেস্টের মাধ্যমে বলতে পারে অমুক জোড়ার কোন বাচ্চাটি সন্তানসী হবে। (এফ.বি.আই, মকবুল মোশাররফ)

এফ.বি.আই আমেরিকার গোয়েন্দা পুলিশের নাম। যা Federal Bureau of Intelligence এর সংক্ষিপ্তরূপ। এর সূচনা ১৯০৮ সালে। সে সময় অ্যাটর্নি জেনারেল বোনা পোর্ট বিচার বিভাগের তদন্ত কমিটির আঙ্গিকে স্পেশাল এজেন্ট রূপে বেনাম সেনাকর্মর্তারূপে এর আত্মপ্রকাশ ঘটায়। বিচার বিভাগ তাঁর সীমারেখার মাঝে আমেরিকার সিক্রেট সার্ভিস থেকে এজেন্টদের সম্মিলিত 'ক্রিমিনাল ল' এর বিরুদ্ধে ঘটমান সব ষড়যন্ত্রের তদন্ত করার জন্য ভাড়া নেয়। ১৯০৯ সালে জেনারেল ভিকরশ্যাম স্পেশাল এজেন্ট ফোর্সের নাম রাখেন 'ব্যুরো অব ইন্ভেস্টিগেশন'। এরপর নাম পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। অবশেষে বর্তমান নাম নির্ধারণ করা হয়। সময়ের সাথে সাথে এর কর্মপরিধি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি আইন বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠানের ন্যায় তাদের সাথে অস্ত্র রাখা এবং যে কাউকে আটক করার ক্ষমতা লাভ করে।

এফ. বি. আই এর বর্তমান দায়িত্ব হল-

আমেরিকান সম্মিলিত ফোজদারী আইনের বিরোধীতার তদন্ত করা।

আমেরিকাকে বহিঃরাষ্ট্রের গুপ্তচর ও সন্ত্রাসী তৎপরতার হাত থেকে রক্ষা করা।

মার্কিন সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সকল ফেডারেল ও লোকাল এজেন্সিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা।

এফ. বি. আইকে সংখ্যাধিক্য ও বিস্তৃত নেটওয়ার্কের ভিত্তিতে আমেরিকার সর্ববৃহত ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বলা হয়। এফ. বি. আই এর রয়েছে ৯টি ডিভিশন হেডকোয়ার্টার, ওয়াশিংটন ডিসিতে ৪টি অফিস, ৫৬টি ফিল্ড অফিস এবং প্রায় ৪০০ স্যাটেলাইট অফিস। যাকে রেডিডেন্ট এজেন্সির মত মনে করা হয়। চার স্পেশাল ফিল্ড ইন্টেলিশ্যান্স বিদেশী ২৩ কূটনৈতিককে আপন প্রোগ্রামের দিক নির্দেশনা ও সাহায্য সহযোগিতা পৌঁছিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে।

বিদেশী কূটনৈতিক অফিসে একজন লিগাল এটাচি প্রত্যেকের নেগরানী করে থাকে। যে আমেরিকা ও লোকাল অথরিটির সাথে মিলে এফ.বি.আই এর তত্ত্বাবধানে কাজ করে।

এফ.বি.আই এর প্রায় ১১ হাজার স্পেশাল কর্মকর্তা রয়েছে। ১৩ হাজার ৭শ' জন এফ.বি.আই এর হেডকোয়ার্টারের জন্য রিজার্ভ। ১৬ হাজার কর্মকর্তা ফিল্ডে কাজ করে। এর বার্ষিক বাজেট ৩ শত ১৩ কোটি ৮৭ লাখ ৮১ হাজার ডলার।

এফ.বি.আই-এর ফিল্ড অফিসগুলো সরাসরি হেডকোয়ার্টার ও ৪ শত স্যাটেলাইট অফিসের সহায়তায় আপন কাজ আঞ্জাম দেয়। প্রত্যেক ফিল্ড অফিসের আওতায় রেডিডেন্ট এজেন্সীর সংখ্যা তাদের কাজ-অনুযায়ী পরিবর্তন হতে থাকে।

এফ.বি.আই ফিল্ডেই যাবতীয় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও টেকনোলজি ব্যবহার করে থাকে। এর রয়েছে দু'টি ওরিজিনাল কম্পিউটার স্পোর্ট সেন্টার। যার একটি Pocatello Idaho তে, আরেকটি Fort Monmouth New Jersey তে অবস্থিত। দু'টি ইনফরমেশন টেকনোলজি সেন্টার (ITCS)ও কাজ করে। যার একটি Butte Montan তে, আরেকটি Georgia Savannah তে অবস্থিত। এই ইনফরমেশন টেকনোলজি সেন্টার ফিল্ড-এর কোন গোয়েন্দাবৃত্তি এবং নির্বাহি অপারেশনে সহায়তার জন্য তথ্য সরবরাহ করে।

এফ. বি. আই Gohnstown Pennsylvania তে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গোয়েন্দা সেন্টার ন্যাশনাল ডাগ ইন্টেলিজেন্স সেন্টারকেও একই সেবা প্রদান করে। আন্তর্জাতিক তদন্তে এফ.বি.আই এর অবদানকে কংগ্রেস এ কারণে বাড়িয়ে দিয়েছে যে, আন্তর্জাতিক অপরাধও বেড়ে গেছে। বহিঃবিশ্বে এফ.বি.আই তার লিগাল এটাচি প্রোগ্রামের মাধ্যমে মেজবান রাষ্ট্রের অনুমতি ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা এবং আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের সহায়তায় তদন্ত কাজ সম্পাদন করে। বিশ্বের প্রায় ২৩ টি রাষ্ট্রে আমেরিকা লিগাল এটাচি অফিস

প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। যা মূলত আমেরিকান এম্বেসী গুলোতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্পেশাল এজেন্টের আঙ্গিকে কার্য সম্পাদনকারী দায়িত্বশীলরা বিদেশে লিগাল এটাচি, ডেপুটি লিগাল এটাচি অথবা এসিস্টেন্ট লিগাল এটাচি এর পদে কাজ করে। ১৯৭৫ সালে মুক্ত তথ্য সরবরাহ আইন পাশ হওয়ার পরে এফ.বি.আই বিগত ২৫ বছরে ৩ লক্ষ মামলা খালাছ করেছে।

সর্বপ্রথম এফ.বি. আই-এর প্রধান ছিল স্টেনলে ফেঞ্জ। ১৯০৮ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত সে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিল। এরপর আলেজাণ্ডারোস, ভলিম আই এ্যালন, ভলিম জে ফ্ল্যয়েন, ভলিম জে বার্নাজ, এ্যাডগার হোব, পিটার্ক গারে, ভলিম ডি কালশিয়াস, ক্লারেন্সকেলী, ভলিম এইচ প্যালেস্টার, জা অটো, ভলিম এস সিসান, ফ্লাড আই ক্লার্ক, লোলিস জে ফারে এবং টমাস জে প্যাকরড বিভিন্ন সময়ে এর প্রধানের দায়িত্ব পালন করে।

১১ই সেপ্টেম্বরের পরে এফ.বি.আই-এর প্রধান রবার্ট এস মোলার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আফগানিস্তানের যুদ্ধে আল-কায়দার বিরুদ্ধে সংগঠিত অপারেশন সমূহে স্মরণীয় অবদান রাখে। রবার্ট এস মোলার আমেরিকার সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা সংস্থা সি.আই.এ-এর সহায়তায় এসব কাজ করে। এখনও অনেক গোপন মিশনের ক্ষেত্রে এফ.বি.আই ও সি.আই.এ সম্মিলিতভাবে কাজ করে। অথচ এর পূর্বে সর্বক্ষেত্রেই আপসে বিরোধীতায় মত্ত ছিল।

এফ. বি. আই-এর হেডকোয়ার্টার



১৯০৮ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত এফ.বি.আই-এর অফিস আইন মন্ত্রনালয়ের ভবনেই ছিল। ১৯৩৯ সালে এফ.বি.আই এর পৃথক ভবনের কথা আলোচনায় আসে। ১৯৪১ সালে আমেরিকান পাবলিক বিল্ডিং এজেন্সি এর কাজ শুরু করে। এ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যার ফলে আমেরিকার সকল ভবন নির্মাণ প্রকল্প ভেসে যায়। ১৯৬১ সালে পুনরায় কংগ্রেসে এফ.বি.আই এর জন্য স্বতন্ত্র ভবনের প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে কংগ্রেস এফ.বি.আই-এর স্বতন্ত্র অফিসের প্রস্তাবনা মনজুর করে।

জেনারেল সার্ভিসেস এডমিনিস্ট্রেশন ভবনের ডিজাইনের জন্য ১ কোটি ২২ লক্ষ ৬৫ হাজার ডলার বরাদ্দ দেয়। অথচ ভবনের নির্মাণ পরিকল্পনায় ৬ কোটি ডলার ব্যয় হয়। ১৯৬৩ সালের ২রা জানুয়ারী জেনারেল সার্ভিসেস

এডমিনিস্ট্রেশন পেনসিলভেনিয়াতে এফ.বি.আই-এর ভবনের জন্য জায়গা বরাদ্দ করে। ভবনের জন্য যে জায়গা ক্রয় করা হয় তার মূল্য ছিল প্রতি স্কয়ার ফিট ৪০.১৭ ডলার। ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে পেনসিলভেনিয়াতে এডভাইজারি কাউন্সিল এফ.বি.আই-এর বিশাল ভবন দৃষ্টির সামনে নিয়ে আসে। এফ.বি. আই-এর ভবন যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে রেখে তাতে নানান সংস্কার করা হয়।

ভবনের প্রথম বিন্টিংয়ের অনেকটা অংশ নিরাপত্তার খাতিরে বন্ধ রাখা হয়েছে। পুরা ভবনের সামষ্টিক ডিজাইন ইংরেজী অক্ষর ই (E) এর সাদৃশ্য। এ কারণে এক কেন্দ্র থেকেই অফিসের সকল জায়গার উপর নজর রাখা যায়।

এফ.বি. আই-এর গুরুত্বপূর্ণ বিভাগসমূহ

এডমিনিস্ট্রিভ সার্ভিসেস ডিভিশনঃ

এডমিনিস্ট্রিভ সার্ভিসেস ডিভিশন এফ.বি.আই-এর সকল ব্যবস্থাপনামূলক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে। এফ.বি.আই-এর কর্মকাণ্ডকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করার লক্ষ্যে যাবতীয় প্রস্তাবনা, প্রনয়নকৃত বিভিন্ন প্রোগ্রামের উপর আমল করত সে সকল অত্যাৱশ্যকীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করে যা কোন মিশনের জন্য প্রয়োজন হয়। এছাড়া এফ.বি.আই এ ভর্তি কর্মকর্তাদের প্রোগ্রামসমূহের ব্যবস্থাপনামূলক বিষয়াদির দায়িত্ব এই ডিভিশনের।

ফিন্যান্স ডিভিশনঃ

ফিন্যান্স ডিভিশন এফ.বি.আই এর সকল বিভাগের আর্থিক বিষয়, বাজেট ও অর্থনৈতিক প্লানিংয়ের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়। সকল প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন এই ডিভিশনের দায়িত্ব। এফ.বি.আই-এর চীফ ফিন্যান্সাল অফিসার এই বিভাগের প্রধান। উপরন্তু অনুমোদনের জন্য একটি বোর্ডও গঠন করা হয়।

ইনফরমেশন রিসোর্স ডিভিশনঃ

এ বিভাগের দায়িত্ব হল এফ.বি.আই-এর আভ্যন্তরিন সকল তথ্য একত্র করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে পৌঁছানো। এ সকল তথ্য ও সংবাদ বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে একত্র করা হয়। এ কথার নিশ্চিত করাও এই বিভাগের দায়িত্ব যে, অর্জিত তথ্য কোথায় ব্যবহার করা যেতে পারে? কোথায় তা উপকারী হবে?

রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনঃ

এই ডিভিশন অল্প কিছুদিন আগে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর আগে এটি ভিন্ন আঙ্গিকে ছিল। একে রি-অরগানাইজ করতে ডাইরেক্টর 'মুলার' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই ডিভিশনে অন্যতম দায়িত্ব হল সকল রেকর্ডকে আপ টু ডেট করে রাখা।

কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ডিভিশনঃ

এই ডিভিশনের দায়িত্ব হল জাতীয় নিরাপত্তার প্রতিবন্ধক সকল ষড়যন্ত্রকে চিহ্নিত করে তা নির্মূল করা। এ ডিভিশন সারা পৃথিবীর ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির অভিজ্ঞতা ও কর্মক্ষমতার তথ্য উপাত্ত একত্র করে যাচাই বাচাই করে তা মোকাবেলার পথ বের করে। এই বিভাগ বিশেষভাবে সে সকল রাষ্ট্র ও সংগঠনের প্রতি নজর রাখে যারা আমেরিকা ও তার জনগনের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে।

কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ডিভিশন আপন কর্মকাণ্ড ও ব্যবস্থাপনাকে রাষ্ট্রীয় আইনের সমান্তরালে পরিচালনা করে যাতে দেশীয় ফৌজদারী আইনের দফা নং C ৮১-এর আওতায় আভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড ও পলিসি সম্পর্কে কোন বিদেশী গোয়েন্দার অপতৎপরতাকে বাঁধাগ্রস্থ করা যায়।

এছাড়া এফ. বি আই-এর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলঃ-

- কাউন্টারিয়েটরম রাজাম ডিভিশন
- সিকিউরিটি ডিভিশন
- অফিস অব দি ইন্টেলিজেন্স
- ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন
- মাইবর ক্রাইম ডিভিশন
- ল' ইএফোরস্মেন্ট সার্ভিসেস গ্রুপ
- ক্রিমিনাল জাস্টিস ইনফরমেশন ডিভিশন
- ইনভেস্টিগেটু টেকনোলজিস ডিভিশন
- লিবারেটরী ডিভিশন
- অফিস ফর ল' ইরফোরস্মেন্ট কো অর্ডিনেশন
- অফিস অব দি ইন্টারন্যাশনাল অপারেশনস
- ট্রেনিং ডিভিশন

এসকল ডিভিশন ও বিভাগের আবার অনেক উপ-বিভাগ রয়েছে। এ সকল ডিভিশন আপন আপন কাজে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

উদ্দেশ্যঃ

আমেরিকা সম্মিলিত ফেডারেল ফৌজদারী আইন বহির্ভূত কর্মতৎপরতা তদন্ত করা। আমেরিকাকে ভিনদেশী গুপ্তচর ও সন্ত্রাসীদের অপতৎপরতা থেকে রক্ষা করা। আমেরিকা ও সংশ্লিষ্ট সকল ফেডারেল ও লোকাল এজেন্সিকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা।

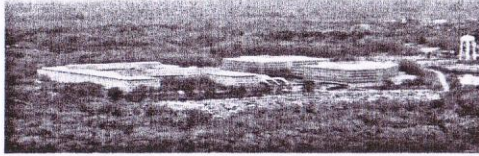
সি.আই.এ CIA السي اي ايه



লোগো



অফিসিয়াল পতাকা



সদর দপ্তর

পূর্ণনামঃ

CANTRAL INVESTIGATION AGENECY

وكالة الامن القومي الامريكية

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠাঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭

পূর্বসংস্থাঃ সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ

কর্মীঃ গোপনীয়(আনুমানিক ২১৫৭৫)

বার্ষিক বাজেটঃ ১৫বিলিয়ন (২০১৩)

সদর দপ্তরঃ জর্জবুশ সেন্টার ফর ইন্টেলিজেন্স, ল্যান্ডলি, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।

নীতি বাক্যঃ দেশের সেবায় সেন্ট্রাল ফর ইন্টেলিজেন্স

সংস্থাপ্রধানঃ পরিচালক: জন ও ব্রানান

ভারপ্রাপ্ত পরিচালক: ডেভিড এস কোহেন

জবাবদিহিতাঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট

ওয়েব সাইটঃ [www. CIA.gov](http://www.CIA.gov)

সি. আই.এ CIA السي اي ايه

আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা CANTRAL INVESTIGATION AGENCY সি.আই.এ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হল, প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তা জানার জন্য আমাদের এজেন্সিটির পটভূমির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

সি.আই.এ প্রতিষ্ঠা পটভূমি

১৯৪৬ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান কংগ্রেসের নিকট আবেদন পেশ করে-সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি এ্যাক্ট পাশ করে এমন একটি এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করা হোক যা গভর্নমেন্টের সকল গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের থেকে আগত তথ্য একত্র করে পর্যালোচনামূলক রিপোর্ট প্রস্তুত করতে পারে। যার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু জেনারেল ভলিম, ডোনোয়ান, এলাড এস এবং অন্যান্য অস্থায়ী প্রতিষ্ঠানের সামরিক কর্মকর্তাগণ একে বিভিন্ন আঙ্গিকে পরিচালনা করে। তারা এই প্রতিষ্ঠানকে এমন এক গোয়েন্দা সংস্থারূপে ব্যবহার করে যার দ্বারা বৈধ দূতাবাসের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয় এমন পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

সি.আই.এ-এর সদস্যরা পেশাজীবী গোয়েন্দা। এরা সরকারের উচপদস্থ অফিসারদের পৃষ্ঠপোষকতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এ সংস্থার সদস্যরা সরকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসা, আর্থিক, যোগাযোগ ও শ্রমিক ইউনিয়নসহ জীবনের প্রতিটি শাখায় হস্তক্ষেপ করে। দেশীয় বা বহিঃরাষ্ট্রের সকল বিষয়ে নাক গলায়। যাতে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি গোপন তৎপরতা ও দূর্নীতির মাধ্যমে অগ্রসর করা যায়। আমেরিকা বিরোধী সকল তৎপরতাকে প্রতিরোধ করা যায়। কেমন যেন গোটা দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রগুলো আমেরিকার লিডারশিপ মানার জন্য মাথা নত করে রয়েছে। কিন্তু ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে তাদের এ স্বপ্নের উত্তম কোন ব্যাখ্যা অর্জিত হয়নি। তারপরও সংস্থাটি এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় রাজনৈতিক উত্থান সত্ত্বেও স্যোশাল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে আমেরিকার কৃত্রিম মাতব্বরী প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা-তদবীর অব্যাহত রেখেছে। যদিও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে কর্মতৎপরতা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের বিরুদ্ধে কর্মতৎপরতায় কোন

কমতি নেই। আমেরিকার স্বার্থ হাসিলের জন্য যে কোন দেশে গনতন্ত্রের আওয়াজ তুলে অথবা অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাঁধা সৃষ্টি করে অথবা কোথাও স্বাধীনতা শক্তিকে রোধ করার জন্য এমন সব পস্থা অবলম্বন করে যাতে তারা সহজেই স্বার্থ হাসিল করতে সক্ষম হয়। একান্ত না পারলে মার্কিন সরকার পরিষ্কার ‘প্রতারণা’র আশ্রয় নেয়।

এ সংস্থাটি গোয়েন্দা ও ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনাকারী সন্ত্রাসীদেরকে ভর্তি করে থাকে। গোয়েন্দা বৃত্তি, প্রোপাগান্ডা, মিথ্যা-তথ্য প্রচার, গুজব রটানো, স্নায়ুযুদ্ধ, ধ্বংসযজ্ঞের মত নিন্দিত সব পস্থা অবলম্বন করে যে কোন রাষ্ট্রে নিজেদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিগ্ৰহলা, দূনীতি ও অস্থিরতা সৃষ্টিতে কোন ক্রটি করে না। নৈতিক মূল্যবোধের সকল মূলনীতিকে ভঙ্গ করতে পিছপা হয় না। বহিঃরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য লোক চক্ষুর আড়ালে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

বিদেশী অফিসারদেরকে ঘুষ, ব্লাক মেইলের মাধ্যমে নিজেদের টোপে আটকে ফেলে। এসব কিছু ‘জাতীয় নিরাপত্তা’র শিরোনামে করা হয়। যা থেকে না আমেরিকার সরকার বাধা দিতে পারে আর না আমেরিকার জনগণ। মিডিয়া যদিও স্বাধীন বলে প্রচার করা হয় তারপরও একটি সীমায় গিয়ে তা আটকে যায়।

সি.আই.এ-এর দৃষ্টিভঙ্গি হল, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কারো বাঁধা প্রদানের কোন আইনী অধিকার নেই। চাই আমেরিকার সরকার হোক বা জনগন কিংবা মিডিয়া। জাতীয় প্রয়োজন সম্পাদনের লক্ষ্যে কার্যমালা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করতে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। জাতীয় স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে যে কোন দূনীতি অথবা অবৈধ পদ্ধতি অবলম্বন করা তাদের জন্য সম্পূর্ণ বৈধ এবং তাদের অধিকার। জনগণের থেকে স্বীয় অপকর্ম ঢাকতে যত্নসব ‘অপয়া’ উপায় অবলম্বন করা দরকার সে ‘অধিকার’ তাদের ‘সংরক্ষিত’। সাথে সাথে জনগনের জবাবদিহিতার ভয়ে আমেরিকান কংগ্রেসও রাষ্ট্রপ্রধানের সহযোগীতায় নিজেদের জন্য কিছু আইনের দেয়াল প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে।

আমেরিকা নিজেদের দায়দায়িত্ব লুকানো ও সি.আই.এ-এর সদস্যদের কর্মকাণ্ড দুনিয়াবাসীদের প্রশ্ন ও আপত্তি থেকে বাঁচানোর জন্য যখন তখন মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত। অতীতে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখা গেছে।

১৯৫৪ সালে গুয়েতেমালায় সংঘটিত ঘটনায় সি.আই.এর জড়িত থাকার কথা স্পষ্ট অস্বীকার করে মিথ্যা বলেছে প্রেসিডেন্ট ডেভিড আইসেনহাওয়ার। ১৯৫৮ সালে ইন্দোনেশিয়ায় ব্যর্থ বিদ্রোহে সি.আই.এ-এর সংশ্লিষ্টতাকে অস্বীকার করা হয়।

১৯৬০ সালে ফ্রান্সে গ্রে-পাওয়ার U-Z মিশন থেকে অস্বীকৃতি জানানো হয়।

এসকল ‘দেশপ্রেমিক’ যখন আপন জালেই আটকে যায় তখন এ কথা বলে যে, এ ধরনের মিথ্যা বলা রাষ্ট্রের ‘উত্তরাধীকারী অধিকার’। কেননা এ সকল কর্মকাণ্ড বিরোধী দেশ থেকে গোপন রাখাই আবশ্যিক। তাই সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো আমাদের কর্তব্য।

বিরোধী রাষ্ট্রগুলো সি.আই.এ-এর গোয়েন্দা তৎপরতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত ছিল। যখন তারা কাজ করছিল তখন U-Z গোয়েন্দা বিমান এবং স্যাটেলাইট গাড়ী থেকে আসা ছবি ও তথ্য সম্পর্কেও রাশিয়া ও চীন অবগত ছিল।

ঘটনা হল, ১৯৫২ থেকে ১৯৬৪ মধ্যবর্তী সময়ে যখন শীতলযুদ্ধ খুবই তীব্র ছিল। রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা রাশিয়ায় অবস্থিত আমেরিকান দূতাবাস থেকে গোপন শব্দাবলির মাধ্যমে পাঠানো তথ্যসমূহ ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে জেনে ফেলে। এমনভাবে সি.আই.এ-ও রাশিয়ার শীর্ষস্থানীয় নেতাদের প্রাইভেট ফোনালাপ রেকর্ড করে ফেলে। যেহেতু উভয়েই পরস্পরের গোপন ভেদ সম্পর্কে অবগত হয়ে গেছে। তাই কারো জাতীয় নিরাপত্তায় কোন ক্ষতি হয়নি।

বাস্তবতা হল, আমেরিকায় সি.আই.এর কর্মতৎপরতার সারমর্ম হল, আমেরিকার জনগন ও কংগ্রেসকে একথা কিছুতেই জানানো যাবে না যে, মার্কিন গভর্নেন্ট কি করেছে। সি.আই.এ-এর ধারাবাহিক ব্যর্থতার পরও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ‘আশ্চর্য সব কৃত্রিম তৎপরতা’ দেখিয়ে আসছে, যার ফলে আমেরিকান জনগন তাদের সাবাশ জানিয়ে আত্মগর্বে ওয়াহ্ ওয়াহ্ করেছে। প্রকৃতপক্ষে কয়েক বছর ধরে সি.আই.এর কর্মক্ষমতা কল্ল-কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। যা অস্বীকার করার ‘জো’ কারো নেই।

সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এ্যাক্ট-১৯৪৯ এর মাধ্যমে ১৯৪৭ এর এ্যাক্টে কিছু সংশোধন আনা হয়। যার মধ্যে যুগান্তরকারী সংশোধন ছিল এই, সি.আই.এ-তথ্য সংগ্রহের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আরোপিত সকল পদক্ষেপ ও দায়িত্ব তামিল করবে।

এই ‘অস্পষ্ট বাক্য’টি সি.আই.এ-কে বহিঃরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে গোপন তৎপরতা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে স্বাধীনতা ও অধিকার প্রদান করেছে। স্বাভাবিকভাবে তা হোয়াইট হাউস-এর অনুমোদন ও ইচ্ছা অনুযায়ী তামিল করা হয়। যা কখনও কংগ্রেসের থেকে অনুমোদন হয় না। কিন্তু আমেরিকান জনগনের কোন খবর নেই যে, সি.আই.এ-র ব্যর্থতা কতখানি! সি.আই.এ-র কর্মকাণ্ড এত বেশী ভুল ও ব্যর্থতায় ভরপুর যে, বারবার আমেরিকান সরকারের

প্রকাশ্যে নিন্দিত হতে হয়েছে। এমতাবস্থায় যে কেউই একথা চিন্তা না করে পারে না যে, সি. আই.এর জন্য উত্তম ছিল, গুয়েতেমালা, কিউবা, চিলি, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া ও চীনে যদি তাদের ষড়যন্ত্রের জাল না বিছাতো তবে আমেরিকান জনগনের ভবিষ্যত অশুভ পরিণামের শিকার হত না।

সি. আই. এ-এর সরকারীভাবে অনুমোদিত সদস্য সংখ্যা ১৬৫০০। ব্যয় (কংগ্রেসকে যা বলা হয়) বার্ষিক ৭৫০ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু এর প্রকৃত সদস্য সংখ্যা ও ব্যয় অনেকগুন বেশী। ভাড়াটে সেনাউপদেষ্টা ও এজেন্টরা এ সংখ্যার বাইরে। পৃথিবীর নানা দেশে সি.আই.এ-এজেন্টদের একটি বড় সংখ্যা ঠিকাদারীর উপর কার্য সম্পাদন করে। এদেরকে গোপন রাখা হয়। বিবিধ খরচও এই হিসাবের বাহিরে রাখা হয়। অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সি.আই.এ-এর পক্ষ থেকে ধারাবাহিক বেতন বা ভাতা প্রদান করা হয়। যুদ্ধকালীন যে সকল অফিসার ও সৈন্য অস্থায়ীভাবে কাজ করে তাদেরকে Contract বা চুক্তির ভিত্তিতে রাখা হয়। বাজেটের মধ্যে অনেক খাত প্রকাশ করা হয় না। আর এই ঘাটতি ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সি এবং এয়ার আমেরিকার বাজেট থেকে পূরণ করা হয়। এ ছাড়া সি.আই.এ কে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

Spacific Corporation (স্পেসিফিক কর্পোরেশন), এয়ার এশিয়া, এয়ার আমেরিকা এর শাখা প্রতিষ্ঠান। ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট, পেন্টাগন, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, সি.আই.এ ডাইরেক্টর এর অন্তর্বর্তীকালীন ফাণ্ড। এসব প্রতিষ্ঠান সি.আই.এ কে বাৎসরিক হাজার হাজার মিলিয়ন ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এয়ার এশিয়া, এয়ার আমেরিকা মূলত সি.আই.এরই প্রতিষ্ঠান। এর আয় তাদের কাছেই পৌঁছে। এই বিমান কোম্পানির চাকুরীজীবী সদস্যদের সংখ্যা ২০ হাজার। এর বার্ষিক আয় বাৎসরিক হাজার হাজার মিলিয়ন ডলার। সি.আই.এ কখনও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সহায়তা প্রদান করে। কেননা এর মালিকানাধীন উল্লিখিত কোম্পানিসমূহের আয় যারপর নাই অতিরিক্ত।

সদস্য ও ব্যয়ের হিসাব

অফিস	সদস্য সংখ্যা	বার্ষিক ব্যয় (মিলিয়ন ডলার)
সি. আই. এ ডাইরেক্টর অফিস	৪০০	১০
গোপন সার্ভিসেস	৬০০০	৪৪০
ডাইরেক্টরিয়েট অব ইন্টেলিজেন্স	৩৫০০	৭০
ডাইরেক্টরিয়েট অব মেনেজমেন্ট		
এও সার্ভিসেস	৫৩০০	১১০
ডাইরেক্টরিয়েট অব সাইন্স		
এও কেটনোলজি	১৩০০	১২০

বাজেট ও সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ গোপন কর্মকাণ্ড, গোপন যোগাযোগ, ট্রেনিং ও সামরিক অভিযানে ব্যবহৃত হয়।

গোয়েন্দা সংখ্যা ও বাজেট

সংস্থার নাম	সদস্য সংখ্যা	বার্ষিক ব্যয়
সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি	১৬৫০০	৭৫,০০,০০,০০০ ডলার
এটমিক এনার্জি কমিশন	৩০০	২,০০,০০,০০০ ডলার
ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট	৩০০	১০০,০০,০০০ ডলার
ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি	৫০০	২০,০০,০০,০০০ ডলার
ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি	২৪,০০০	২০,০০,০০,০০০ ডলার
নিউল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি	১৫০০০	৬০,০০,০০,০০০ ডলার
আর্মি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি	৩৫,০০০	৭০,০০,০০,০০০ ডলার
এয়ার ফোর্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি	৫৬,০০০	৭০,০০,০০,০০০ ডলার
ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন	৮০০	৪,০০,০০,০০০ ডলার
স্টেট ডিপার্টমেন্ট ব্যুরো অব ইন্টেলিঃ রিসার্চ	৩৫০	৪০,০০,০০০ ডলার
সর্বমোট	১৫৩২৬০	৬২২৪০০০০০০ ডলার

সি.আই.এর কর্মকাণ্ড ও মালিকানাধীন সম্পত্তি

নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সি. আই. এ-র মালিকানাধীন সম্পত্তি। এগুলোর নিয়ন্ত্রণ সি. আই. এ-ই করে থাকে। এতে সি.আই.এর পূজি বিনিয়োগ করা হয়।

- ১) রেডিও লিবার্টি
- ২) রেডিও ফ্রি ইউরোপ
- ৩) রেডিও সোয়ান
- ৪) কেরিবিয়ান মেরিন এয়ার কর্পোরেশন
- ৫) ইন্টারন্যাশনাল আর্মমেন্ট কর্পোরেশন।
- ৬) ডবল চেক কর্পোরেশন।

কর্মতৎপরতাঃ

সি. আই. এ এমার্জেন্সি হালতে যে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করে। যে কোন দেশের অবস্থা পরিবর্তন করতে পারে। এরা কখনো নির্বাচনের সময় গোলযোগ সৃষ্টি করে।

সি.আই.এ খোদ আমেরিকার বিষয়েও হস্তক্ষেপ করে এবং সরকারের সামনে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন ওয়াটার গেট স্ক্যান্ডালে করা হয়েছিল। CIA এর কয়েকটি ব্যাখ্যাও পেশ করেছিল।

CIA এর টেকনিশিয়ানরা চীন ও রাশিয়ার গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য যন্ত্র উদভাবন করেছে।

CIA এই মূলনীতির উপর অটল থাকে যে, তাকে যাচাই করার অধিকার কারো নেই। না সাধারণ জনগনের আর না রাষ্ট্রপ্রধানের।

CIA ভিনদেশী এজেন্ট তালাশ করে এবং তার পিছনে অর্থও ব্যয় করে। কেননা যতক্ষণ কোন দেশের ভেতরের লোককে হস্তগত করা না যায় ততক্ষণ কাজিত সফলতা আসেনা। কয়েকটি রাষ্ট্রে CIA সরকার পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই CIA চীনে গেরিলা তৎপরতার জন্য এশিয়া ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিল। CIA গুয়েতেমালা ও ইরানে বামপন্থী সরকারের মসনদ উল্টানো ও বিপ্লব সৃষ্টিতে নানান তৎপরতা দেখিয়েছে এবং অর্থও ব্যয় করেছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে জার্মান ও জাপানের বিরুদ্ধে CIA গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নাৎসি সৈন্যদের মাঝে অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ চেষ্টা করেছিল।

সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (CIA)

সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, গোটা দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্পর্কে তথ্য একত্র করে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করা, বিভিন্ন অপারেশন বিন্যস্ত করা। আর এগুলির উদ্দেশ্য ছিল, 'আমেরিকার স্বার্থের' নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল, রাষ্ট্রপ্রতি ও সি.আই.এ এক প্লাটফর্মে এসে পারস্পারিক সহযোগীতার মাধ্যমে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে। প্রথমে উল্লিখিত দু'টি প্রতিষ্ঠানকে সি.আই.এ-র দেমাগ-মগজ, চোখ ও কান সদৃশ বলা হয়। এই তিন প্রতিষ্ঠানের দিকনির্দেশনার জন্য আরেকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যাকে সিনেট বলে। সিনেট প্রধানের দুই ডাইরেক্টরের অনুমোদনে সি.আই.এ-র ডাইরেক্টর ও তার নায়েব নিযুক্ত করা হয়। ডাইরেক্টর ও ডেপুটি ডাইরেক্টরের নিচে একটি জাল বিছানো যারা গোটা কাজ আঞ্জাম দেয়। এ অবস্থা শুধু আমেরিকাতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং শাখা-উপশাখায় তা সারা দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। সি.আই.এ-এর কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্থানীয় ক্ষমতাধর, প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে কোন না কোন ভাবে আয়ত্ত্ব করে রেখেছে। প্রলোভন, হুমকি, ভয়, সম্মানহানী, ব্লাক মেইলিং এগুলো সি.আই.এ-এর হাতিয়ার।

শুরুতে সি.আই.এ-এর যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, সময়ের সাথে সাথে তাতে পরিবর্তন করা হয়েছে। তাদের কাজ শুধু গোয়েন্দাগীরিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং ভবিষ্যতে গোটা পৃথিবী নিজেদের করায়ত্ত্ব করার হীন ষড়যন্ত্রে নবউদ্যমে কাজ শুরু করেছে।

আমেরিকার নিজস্ব ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ও নিষ্ঠুরতাকে টিকিয়ে রাখা এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অতিরিক্ত শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই সন্ত্রাসী সংগঠন সি.আই.এ-এর কর্মতৎপরতাকে সক্রিয় রাখে। বিভিন্ন দেশের জাতীয় স্বার্থ বিনষ্ট করে আমেরিকান স্বার্থ অর্জনে প্রতিষ্ঠানটির অনেক বদনাম রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, এর সদস্যদের কোন চারিত্রিক মূলনীতি নেই, নৈতিক মূল্যবোধের কোন রুল নেই।। সি.আই.এ-এর কিছু পাগলামী কর্মপদ্ধতির নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ-

১. অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, সাইন্স ও টেকনোলজির বিভিন্ন বিভাগ, অর্থনৈতিক উন্নতি, শিক্ষা কার্যক্রম ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর উপর গোপন নজরদারি করা।

২. প্রোপাগান্ডা, ভুল ও মিথ্যা তথ্য সরবরাহ, সন্ত্রাসী কার্যক্রম, স্নায়ুযুদ্ধ, হত্যা ও লুণ্ঠন, ব্লাক মেইলিং, ঘুষ প্রদান, ভয়ভীতি ও প্রলোভনের মত নিন্দিত সকল হাতিয়ার অবলম্বন করা।
৩. কোন রাষ্ট্রকে এমন রাজনৈতিক পরামর্শ দেওয়া যাতে তারা আমেরিকান পলিসি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।
৪. সংখ্যালঘু, ছাত্র ইউনিয়ন, শ্রমিকদলের লোকদের আয়ত্বকারী এজেন্টকে অর্থসহায়তা প্রদান।
৫. বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও স্কলারদের জন্য সেমিনার, লেকচার, ফ্লিম প্রোগ্রাম স্পঞ্জর করা। যাতে তাদের মন-মস্তিষ্কে আমেরিকান ধ্যান ধারণা সৃষ্টি হয়। নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে আমেরিকান নারী ও সুদর্শন সেবক প্রদান করে ওফাদার করে রাখা হয়।
৬. কতক তুখোড় রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও সরকারী কর্মকর্তা ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদেরকে উৎকোচ, উপটোকন ইত্যাদি প্রদান করা।
৭. কোন রাষ্ট্রের রাজনীতিকে নিজেদের মতানুযায়ী পরিচালনার জন্য নিজেদের নির্বাচিত দল অথবা রাজনিতিকদেরকে পরামর্শ ও অর্থ সহায়তা প্রদান।
৮. নিজেদের প্রতিপালিত রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন করানো এবং এই উদ্দেশ্যে হাছিলের জন্য অপরিচিত রাজনৈতিক দলকেও ভরপুর অর্থ সহায়তা প্রদান।
৯. বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, জেনারেল ও সিনিয়র উপদেষ্টাদের সি.আই.এ-এর এজেন্টে রূপান্তরিত করার হীন চেষ্টা করা।

এফ.এস.বি

FSB

ايف ايس بي



লোগো



পতাকা



সদর দপ্তর

পূর্ণনামঃ

Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti (FSB) (Federal Security Service, is active within the country and deals with national security and counter-espionage) ফেডারেলনয়া সুলঝরা বেজপাসনোস্তিরাশিকয় ফেডারটিসি,

রাশিয়া। خدمة الامن الاتحادية

প্রতিষ্ঠাঃ ১২ই এপ্রিল ১৯৯৫

পূর্বসংস্থাঃ কেজিবি (তার আগে চেকা)

কর্মীঃ ২লক্ষ থেকে ৩ লক্ষের মধ্যে

বার্ষিক বাজেটঃ গোপনীয়

সদর দপ্তরঃ লুবিয়াংকা স্কয়ার, মস্কো, রাশিয়া।

সংস্থাপ্রধানঃ মিখাইল ফার্দকভ

জবাবদিহিতাঃ প্রেসিডেন্ট রাশিয়ান ফেডারেশন

সহকারী সংস্থাঃ গ্রুফ বিভাগ : ১০টি

মূল দায়িত্বঃ বৈদেশিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স পরিচালনা, গুপ্ত হত্যা, বর্ডার সার্ভেইল্যান্স, রণাঙ্গী নিয়ন্ত্রণ, কাউন্টার টেররিজম, নিজস্ব লোক সংগ্রহ ও নেটওয়ার্ক তৈরী, বিদেশী কুটনিতিকদের উপর নজরদারী।

ওয়েব সাইটঃ www.fsb.ru

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর রাশিয়া ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসেস (এফ, এস বি) নামে গোয়েন্দা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এর কার্যক্রম প্রধানত রাশিয়ার অভ্যন্তরে বেশি রাখা হয়। এছাড়াও প্রতিগোয়েন্দাবৃত্তি সীমান্ত সন্ত্রাস দমন এ সব ক্ষেত্রে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ সংস্থার কার্যক্রম প্রথম দিকে এস.এস.কে নামে পরিচিত ছিল। রাশিয়ার পার্লামেন্টে ১৯৯৫ সালের ৩ এপ্রিল আইন পাশের মাধ্যমে এর নাম করা এফ.এস.বি। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

কে.জি.বি

KGB

الكا جي بي



লোগো

রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা কে.জি.বি দীর্ঘ সময় ধরে পৃথিবীতে আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের প্রতীক হিসাবে পরিচিত ছিল। এ কথা অনস্বীকার্য যে, যতদিন কে.জি.বি সক্রিয় ও শক্তিশালী ছিল ততদিন পৃথিবীর প্রত্যেকটি জায়গায় আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সি.আই.এ-এর যথার্থ মোকাবেলা করেছে। অধিকাংশ জায়গায় তার প্রভাব প্রতিপত্তি উল্টে দিয়েছে।

KGB রুশ ভাষার Komitet Gosuourstvennay Bezoposnest -এর সংক্ষিপ্ত রূপ। রাশিয়ান ভাষায় এর উদ্দেশ্য হল, “রাজত্ব সংরক্ষন কারী প্রতিষ্ঠান”। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির আবির্ভাবের সাথে সাথে এর প্রতিষ্ঠা হয়। যা মূলত সেনাবাহিনীর অধীনে কাজ করত। কিন্তু এর সম্পর্ক হত অধিকাংশ সময়ে সিভিলিয়ান বা বেসামরিকদের সাথে। কে.জি.বি ফুল স্টার জেনারেল এর আওতাধীন এবং সরাসরি রাশিয়ান গভর্নমেন্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিভাগ। এরা ব্যতীত অন্য কারো জবাবদাহিতার মুখাপেক্ষী নয়। মৌলিকভাবে এর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বাহিরের শত্রু থেকে দেশকে রক্ষা করা। যার পরিধি ছিল সারা বিশ্ব।

লেনিন বলেছিলেনঃ

“রাষ্ট্রের কাছে অসীম ক্ষমতা থাকা চাই। রাষ্ট্রের কোন আইন বা প্রথা যেন সেই অসীম ক্ষমতাকে সসীম করতে না পারে। রাষ্ট্রের অসীম ক্ষমতার বিরুদ্ধে

চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় অথবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন যে কোন বিষয়কে অংকুরেই খতম করে দাও”।

কে.জি.বি-র প্রতিষ্ঠাকালে লেনিন একথাগুলো বলেছিল। তার ইচ্ছানুযায়ী রাশিয়ার এই গোয়েন্দা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। যার কর্মকর্তা সংখ্যা ছিল ২৫০০০। লেনিনের ইচ্ছানুযায়ী কে.জি.বি তিন দশক থেকে বেশী সময় ধরে পরিচালিত হয়েছে। এই গোয়েন্দা সংস্থা দেশ ও জাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। বাহ্যিকভাবে একে জাতীয় সফলতা ও কামিয়ার জিন্স উৎসর্গ দেখা গেলেও কার্যক্ষেত্রে এই সংস্থাটিই রাশিয়ান জনগনের মন-মস্তিষ্কে করায়ত্ত্ব করে নিয়েছিল। কোন ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুখ খোলার অধিকার ছিলনা। নিজ দেশ ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংস্থাটি উল্লেখযোগ্য গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালিত করেছে।

এই সংস্থাটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জনসাধারণের ধ্যান ধারণা গঠন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কে.জি.বি-র চাপ বেশী না হলে জনসাধারণের কাক্ষিত ধ্যান-ধারণা গঠন করাতো দূরে থাক সরকার জনরোশে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হত।

রাশিয়ান সরকার এই গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে ধর্ম, মিডিয়া, পুলিশ ও সেনাবাহিনীসহ সকল ব্যবস্থাপনাকে নিয়ন্ত্রন করে। এটি একটি স্তম্ভের ন্যায় যার উপর ভিত্তি করে রাশিয়ার শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আর এর মাধ্যমেই রাশিয়ান সরকারের গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত থাকে।

পৃথিবীজুড়ে সংস্থাটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়ংকর অপারেশন পরিচালনা করে। সংস্থাটি নিজেদের এজেন্ট অথবা অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় আন্দোলন সৃষ্টি করে। হত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়ে পরিবেশ কুলষিত করে। রাশিয়ান দূতাবাসের ৮০ ভাগ কর্মকর্তা কে.জি.বির সদস্য হয়ে থাকে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে কে.জি.বি কিভাবে আপন নেটওয়ার্ক তৈরী করে থাকে।

প্রত্যেকটি রাশিয়ান নাগরিকের ঘরে কে.জি.বি কোন না কোনভাবে গোপনতথ্য উদ্ধারের ব্যবস্থা করে ছিল। যে সকল নাগরিক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রাখে অথবা যে সকল আমলারা রাজনৈতিক মতনৈক্য সৃষ্টি করে অথবা পূর্বের ধ্যান-ধারণা থেকে ফিরে যায় কে.জি.বির মাধ্যমে তাদেরকে প্রাণে শেষ করা হয়। এই অপরাধের সাজা হিসেবে রাশিয়ান সরকার লাখ লাখ জনগনকে হত্যা করেছে। এ কারনেই রাশিয়ায় বসবাসরত কোটি কোটি জনতা আতঙ্ক ও ত্রাসের মাঝে জীবন অতিবাহিত করে।

রাশিয়ান সরকার কে.জি.বি-র সদস্যদের থেকে রাষ্ট্রদূত নির্বাচন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেয়। তাদের গোয়েন্দা তৎপরতার কারণে এ পর্যন্ত অনেক রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত বিভিন্ন দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। ১৯৭২ সালে পল গজন্টো নামে এ তুখোড় গোয়েন্দাকে রাশিয়ান সরকার ইন্দোনেশিয়ায় দূত বানিয়ে প্রেরণ করে। তাকে ইতোপূর্বে রাশিয়ান সরকার রাষ্ট্রদূত হিসাবে ব্রিটেন পাঠিয়েছিল। ব্রিটেন তাঁর গোয়েন্দা তৎপরতা আঁচ করতে পেরে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। এই রাশিয়ান গোয়েন্দাই যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান মার্শাল টিটোর অফিসের দেয়ালে গোপন ট্রান্সমিটার স্থাপন করেছিল।

কে.জি.বির সাথে সংশ্লিষ্ট রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত নেকোলাই বিলোস আরজেনটাইনের বিরুদ্ধে হাস্লামা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে শুরু করে। যার ফলে উত্তেজিত জনতা ২০টি গাড়ী আগুনে ভস্ম করে দেয়। অবশেষে আরজেনটাইন সরকার তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়।

১৯৭২ সালে রাশিয়া পুেটর কাকটুকে মারাকেশে রাষ্ট্রদূত হিসাবে প্রেরণ করে। সে খুব ভয়ংকর গোয়েন্দা ছিল। বিভিন্ন দেশের সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে আতাত করে রাষ্ট্রের জন্য বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করেছিল।

১৯৭৩ সালে পুেটর কাকটু আফগানিস্তানে নিযুক্ত রাশিয়ার বিশেষ দূত ছিল। সে কমিউনিজম বিরোধী সাংবাদিককে হত্যা করিয়েছে। এভাবে আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত হয়।

বিভিন্ন দেশে রাশিয়ান দূতাবাসে রাশিয়ান কর্মকর্তার সংখ্যা যথেষ্ট থাকে। যার মধ্যে কে.জি.বির এজেন্টরাও আপন লক্ষ্য অর্জনে তৎপর থাকে। ১৯৭১ সালে মেক্সিকোতে রাশিয়ান দূতাবাসের কর্মকর্তা সংখ্যা ছিল ৬০ জন। অথচ রাশিয়ায় নিযুক্ত মেক্সিকোর কর্মকর্তা ছিল মাত্র ৫ জন।

কে.জি.বি এর একটি বইয়ের তথ্য হলঃ

“আমরা আমেরিকায় অন্যান্য মাধ্যম ব্যতীত শুধু বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকেও গোয়েন্দা রূপে ব্যবহার করে থাকি, এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল জাতিসংঘ ও তাঁর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান সমূহ”।

উল্লেখ্য, সে সময় জাতিসংঘে কে.জি.বি-এর এজেন্টদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হত যখন জাতিসংঘের প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে ওথান আপন দায়িত্ব পালন করত। তার পার্সোনাল সেক্রেটারী ভেকরিসোভেসকিভ কে.জি.বি-এর এজেন্ট ছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ওথানের জানা সম্ভব হল না যে তার মূল পরিচয় কি?

কে.জি.বির এজেন্টরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন লোকের সাথে পুরানো বন্ধুত্ব রাখে। যখন সে সব লোকের কেউ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কোন পদ লাভ করে তখন তার থেকে স্বার্থ হাছিল করে। ওথানের পার্সোনাল সেক্রেটারীর অবস্থা ঠিক এমন ছিল।

ওথান যখন বার্মার তথ্যমন্ত্রী ছিল তখন থেকে ভেকরিসোভেসকিভ তার সাথে বন্ধুত্ব রাখত এবং মতলব হাছিল করত। অবশেষে জাতিসংঘে তার পার্সোনাল সেক্রেটারী হয়ে গেল। ১৯৭৩ সাল থেকে জাতিসংঘের গোপন তথ্য সমূহকে কে.জি.বির কাছে পাঠাতে থাকে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে কে.জি.বির এজেন্টরা উচপদস্থ কর্মকর্তাদেরকে এজেন্ট বানিয়ে গোয়েন্দা বৃত্তিতে সহায়তা নিয়ে থাকে।

গোপন তথ্য উদ্ধারের জন্য কে.জি.বি যারপর নাই ক্ষুদ্র-যেমন ছারপোকাকার ন্যায় ট্রান্সমিটার ভবনের রুমগুলোতে অথবা দেয়ালে কিংবা কাঙ্ক্ষিত জায়গায় স্থাপন করে। কারো পক্ষে যা খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব।

এম.এস.এস MSS ایم ایس ایس
(চীনের গোয়েন্দা সংস্থা)



লোগো



সদর দপ্তর

পূর্ণনামঃ

Ministry of State Security (MSS)

এম এস এস বা গওজিয়া অ্যাংকেন বু অথবা মিনিস্ট্রি অব স্টেট সিকিউরিটি,
(গনচীন) MSS

প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৮৩

সদর দপ্তরঃ বেইজিং

কর্মীঃ গোপনীয়। ২০০৫ সালে দলত্যাগী চীনা এজেন্ট থেকে জানা গেছে
গুধু অস্ট্রেলিয়াতেই এম এস এস এর ১০০ ইনফর্মার আছে। তবে এর কর্মী
সংখ্যা পৃথিবীর অন্য সকল গোয়েন্দা সংস্থার তুলনায় সবচেয়ে বেশী বলে
ধারণা করা হয়।

বার্ষিক বাজেটঃ গোপনীয়

বিভাগঃ ১২টি ব্যুরো তে বিভক্ত।

সংস্থাপ্রধানঃ জেং হুই চ্যাং, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

জবাবদিহিতাঃ স্টেট কাউন্সিল অফ চায়না

মূল দায়িত্ব : বৈদেশিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স পরিচালনা,
গুপ্ত হত্যা, বর্ডার সার্ভেইল্যান্স, আভ্যন্তরিন নিরাপত্তা কাউন্টার টেররিজম, নিজস্ব

লোক সংগ্রহ ও নেটওয়ার্ক তৈরী করা, বিদেশী কুটনৈতিকদের উপর নজরদারী, শত্রু এজেন্টদের সন্ধান, কাউন্টার রেভ্যুশনার কার্যক্রম দমন, সাইবার ওয়ার্ফেয়ার পরিচালনা, নতুন প্রযুক্তি সংগ্রহ, বিশ্বের বড় বড় কর্পোরেশন গুলোর নীতি নির্ধারণে চেষ্টা, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পিওনাজ।

প্রধান বিচরন এলাকা: ম্যাকাও, হংকং, তাইওয়ান, নেদারল্যান্ড, পশ্চিম ইউরোপ, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান, নেপাল, শ্রীলংকা, দক্ষিণ আমেরিকা উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকা এবং সারা দুনিয়ার চাইনিজ বংশদ্ভূত জনগন।

নামকরা এজেন্ট: ল্যারি উ তাইচিন, ক্যাট্রিনা লেউং পিটার লী, চিমাক, কোসুয়েন মো। ১৯৯৬ সালে এফ-১৫, বি-৫২ সহ বহু সামরিক প্রযুক্তি পাচারের অভিযোগে ডং ফ্যাং চ্যু নামে বোয়িং কোম্পানীর এক ইঞ্জিনিয়ার ধরা পড়েন। ধারণ করা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউকে, কানাডা ইউরোপ, ভারত, জাপানে আন অফিশিয়াল কাভারে যেমন ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, খেলোয়ার, ব্যাংকার, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ হিসাবে কমপক্ষে ১২০ জন এম.এস.এস কর্মী অবস্থান করছেন।

প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি: সারা দুনিয়ার বেশিরভাগ গোয়েন্দা সংস্থা।

আই.এস.আই ISI ای ایس ای
(পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা)



লোগো

পূর্ণনামঃ

INTER SERVICES INTELLIGENCE

وكالة الاستخبارات الباكستانية

প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৪৮

পূর্বসংস্থা : নেই

কর্মীঃ ১০,০০০ আনুমানিক

বার্ষিক বাজেটঃ গোপনীয়

সদর দপ্তরঃ ইসলামাবাদ পাকিস্তান

সংস্থাপ্রধানঃ রেজওয়ান আখতার

আই এস আই ISI ای ایس ای

ISI-INTER SERVICES INTELLIGENCE এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ গোটা পৃথিবীকে চিত্তিত করে তোলে, যার গুরুত্ব সকলেরই জানা আছে। পাকিস্তানের এই গোয়েন্দা সংস্থাটির কৌশল ও কর্মদক্ষতার কারণে আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত ও ইসরাইল সহ বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থার চিন্তার কারণ কয়ে দাঁড়িয়েছে। একে ধ্বংস করার জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রগুলো একমত। একে দুর্বল করা তাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ১৯৭৯ সালের পরে নতুন আই.এস.আই-সংস্থার সূচনা হয়। সংস্থাটি সামরিক ইতিহাসে রহস্যজনক রেকর্ড স্থাপন করেছে।

১৯৭১ সালে জুলফিকার আলী ভুট্টো ক্ষমতায় আসার পূর্বে সংস্থাটি এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্থানে (বাংলাদেশ) ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' তাদের পরাজয়ের গ্লানি আশ্বাদন করায়। ১৯৭৪ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে জুলফিকার আলী ভুট্টো (সাবেক প্রধানমন্ত্রী পাকিস্থান) এই সংস্থাটিকে রাজনৈতিক ভিন্ন দল ও মতাদর্শীদের উপর নজরদারির জন্য ব্যবহার করে। ১৯৭৮ সালের জুন মাসে আই.এস.আই-এর প্রধান জেনারেল রিয়াজ ইস্তেকাল করেন। যিনি খুব মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিলেন। ইসলামী মূল্যবোধ ও শরীয়তের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ঘরের অবস্থাও এমন ছিল। তার মেয়েরা কঠোরভাবে পর্দা করত। নেককার এই জেনারেলের মৃত্যু রাষ্ট্রপ্রধানকে যথেষ্ট কষ্টে ফেলে।

১৯৭৯ সালে জুন মাসে মেজর জেনারেল আখতার আঃ রহমানকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে উন্নিত করে আই.এস.আই এর প্রধান নিযুক্ত করা যায়। রাষ্ট্রপতি জিয়াউল হক সংস্থাটিকে সর্বাধিক শক্তিশালী করার ইচ্ছা রাখতেন। তিনি জেনারেল রিয়াজের হাতেই প্রতিষ্ঠানকে নতুন আঙ্গিকে সুন্দরভাবে গঠন করার আশা রাখতেন। কিন্তু তার জীবন তাকে সঙ্গ দেয়নি। এখন দায়িত্ব আসে জেনারেল আখতার আঃ রাহমানের উপর। এ সময় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' সিন্ধুতে নিজেদের কর্মতৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। আফগানিস্থান থেকে আফগান মুহাজিরীন পাকিস্থানে আসার ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়। পাকিস্থানের উপর আফগান মুজাহিদ্দীনদেরকে সাহায্য করার দায়িত্ব আরোপ করা হয়। ইরানে আয়াতুল্লাহ খামেনীর নেতৃত্বে জনতার বিপ্লব সাধিত হয়। আফগানিস্থানে রাশিয়ান সৈন্যের উপস্থিতি পাকিস্থানের স্থায়িত্ব ও সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে চরম সংকট সৃষ্টি করে।

জেনারেল আখতার আঃ রহমান, এই প্রতিকূল পরিবেশে আই.এস.আই কে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের ইচ্ছা অনুযায়ী গঠন করতে কোমর বেঁধে লেগে যায়। পৃথিবীর গোয়েন্দা সংস্থা সমূহের বই-পত্র খুব গভীরভাবে অধ্যয়ন করে আই.এস.আই কে পৃথিবীর অন্যতম গোয়েন্দা সংস্থায় রূপান্তরিত করেন। ইরানের সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে নব্য ইরানের ভীতি দূর করেন।

এটাতো যুদ্ধকালীন ও স্বাভাবিক সময়ে আই.এস.আই-এর অবদান, যখন তারা দেশ ও জাতির শির উন্নত করেছিল। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাসের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল-আই.এস.আই এর তৎপরতা আফগানিস্থান থেকে রাশিয়ার মত সুপার পাওয়ার রাষ্ট্র পরাজিত হয়ে ভেগেছে। শুধু তাই নয় ফলশ্রুতিতে রাশিয়ার অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে। মধ্য এশিয়ায় ও অন্যান্য দেশে রাশিয়ার রাজত্ব হাতছাড়া হয়ে যায়। এ সকল কীর্তি পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক গুরুত্ব রাখে।

রাশিয়া ও আমেরিকার মাঝে দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধাভাব বিরাজ করে। ভিয়েতনাম ও কোরিয়ার মাঝে ঘটিত যুদ্ধে আমেরিকা রাশিয়াকে পরাস্ত করতে অক্ষম হয়। রাশিয়া আমেরিকার জন্য বহুত বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ও তার সহযোগীরা আফগান মুজাহিদ্দীনদেরকে সাথে নিয়ে সে সামরিক কীর্তির স্বাক্ষর রাখেন তাতে আই.এস.আই-এর অনেক অবদান ছিল।

জেনারেল জিয়াউল হক ও জেনারেল আখতার আঃ রহমান আই.এস. আই-কে পৃথিবীর অন্যতম প্রতিষ্ঠিত গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে গঠন করেন। যা দেশের অভ্যন্তরিন ও বাহিরের শত্রু থেকে পাকিস্তানের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির প্রতি নজর রাখবে। জাতীয় স্বার্থ রক্ষা এর মৌলিক দায়িত্ব। পাকিস্তানে গনতন্ত্রের নামে গঠিত সরকারের দুর্বল কর্মকাণ্ড ও জাতীয় স্বার্থের অপূর্ণাঙ্গতার প্রতি লক্ষ্য করে আই.এস.আই-সরকারের প্রতি নজর রাখে।

যখন ক্ষমতাসীন ব্যক্তির সরকারকে Security risk আখ্যা দিয়েছিল, তখনও আই.এস.আই-নিজ দায়িত্ব থেকে বেখবর ছিল না। কখনও কখনও পাকিস্তানে গনতান্ত্রিক কর্মধারায় আই.এস.আই এর নাম প্রথমে শোনা গেছে। এটা বাস্তব যে, পাকিস্তানে ‘গনতন্ত্র’র নামে সরকার গঠিত হয়েছে এবং তারা কিছু না বুঝেই বিদেশীদের শর্তসমূহ পূর্ণ করেছে। অথচ এ দেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কালিমাতুত তাওহীদ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহু”র উপর।

রাজিব গান্ধির সময়ে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কাশ্মীর সংক্রান্ত বোর্ডকে ইসলামাবাদ থেকে দূর করে দেয়া হয়, তখনও সরকারের এ অপতৎপরতা সম্পর্কে আই.এস.আই উদাসীন ছিল না। ভারতে আই.এস.আই-এর ভীতি গেড়ে বসেছে। বোম্বেতে বোমা হামলা, ট্রেনে ধামাকা, তাজ হোটেলে ধামাকার দায়-দায়িত্ব ভারত ঘটনা ঘটায় সাথে সাথেই মুখস্ত আই.এস.আই-এর উপর চাপিয়ে দেয়। এমনকি ভারতের বিহিন্সতাবাদী দলগুলোর সাথে আই.এস.আই-এর যোগসাজশ আছে বলে ভারত সরকারের রীতিমত অভিযোগ রয়েছে। কোন প্রমাণ ছাড়াই আই.এস.এর উপর এমন অভিযোগ তোলা ভারতের আদি অভ্যাস। ভারত অন্যান্য রাষ্ট্রের কর্মতৎপরতার দায়ও আই.এস.আই এ উপর চাপায়। যদি অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতীয় এজেন্সী নিজেই সন্ত্রাসী কার্মকাণ্ড চালায় তার দায়ও আই.এস.আই এর উপর চাপায়। এভাবে কয়েকবার ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’ জাহাজ হাইজ্যাক করে বিশ্বকে ঘোল খাওয়াতে এবং পাকিস্তানের উপর সন্ত্রাসবাদের অপবাদ লাগাতে আই.এস.আই-এর নাম তুলে ধরেছে।

আফগানিস্তানের যুদ্ধের সময়ে জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় আই.আস.আই এত সক্রিয় ও শক্তিশালী ছিল যে, এর সামনে কে.জি.বি, সি.আই.এ, মোসাদ. খাদ, 'র' শান্ত হয়ে বসেছিল। এই কীর্তি একমাত্র জেনারেল আখতার আঃ রহমান এর। জেনারেল হামিদ গুল ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারগন আই.এস.আই.এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

CI(সি.আই)-পাকিস্তানের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স

এর দায়িত্ব হল পাকিস্তানের শত্রুদের অশুভ তৎপরতা প্রতিরোধ করা। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিরক্ষা কর্মনীতি প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করে।

সি.আই-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. পাকিস্তানের ভিতর শত্রুর গোপন গুপ্তচর বা বহিঃরাষ্ট্র থেকে প্রেরিত গোয়েন্দাদের খুঁজে বের করা এবং রীতিমত তাদের সাথে যুদ্ধ করা।
২. বিদেশী চর ও এজেন্টদের যোগাযোগে অনুসন্ধান করা। দেশের শত্রুদের অশুভ তৎপরতা, তাদের কর্মপদ্ধতি ও লক্ষ্য বা টার্গেট খুঁজে বের করা।
৩. ধ্বংসাত্মক তৎপরতা প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই বাধা দেয়া শত্রুর গতিবিধির উপর নজর রাখা. শত্রুর এজেন্টদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা, শত্রুর মাঝে নিজেদের এজেন্ট ঢোকানো ইত্যাদি কাজ আঞ্জাম দেওয়া।
৪. রাজনীতিতে পাকিস্তানি দুশমনদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত হওয়ার প্রতি নজর রাখা শত্রুর অপবিদ্র চাল, ভুল-তথ্য ও প্রোপাগান্ডার পথ বন্ধ করে দেওয়া।
৫. কোন উচ্চপদস্থ রাজনীতিবীদের উপর আরোপিত অভিযোগকে তদন্ত করে সত্য ঘটনা উৎঘটন করা। প্রকৃতপক্ষে সে এই অভিযোগে অভিযুক্ত কি না? তার বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ উত্থাপন করা, আদালতে পাঠানো ইত্যাদি।
৬. প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন তথ্য জমা করা, তা সুক্ষ্ম অনুসন্ধান চালানো, বিশ্লেষণ করা। সময়মত রাষ্ট্রপ্রধান, দায়িত্বশীল ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছানো।
৭. গোয়েন্দা সংস্থার কর্মরত ব্যক্তিদের শিক্ষা দেয়া, পরীক্ষা করা, তাদেরকে শত্রুর এজেন্ট সম্পর্কে অবগত করা এবং তা প্রতিহত করার পদ্ধতি বলে দেয়া।
৮. শত্রুর পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বা জায়গায় স্থাপিত যন্ত্র ও উপকরণ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং তা অকেজো করে দেয়।

আই.এস. আই কেন?

আল্লামা জিয়াউর রহমান ফারুকী বলেন-

ভারতে যদি কারো হাঁচিও আসে তার দায়ভার আই.এস.আই-এর উপর চাপানো হয় কেন? পাকিস্তানের জন্য এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হতে পারে যে, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসে আই.এস.আই কে নিজেদের স্বার্থ হাছিলের জন্য ব্যবহার করেছে। পরবর্তীতে ক্ষমতাচ্যুত হলে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকে? ভারত বার্মা ভারতের গোড়া হিন্দু ও সামরিক বিশেষক এবং ভারতীয় আর্মির “ডিফেন্স জেনারেল এর এডিটর। ১৯৯৯ সালের সম্ভবত শেষের দিকে বিবিসির এক সাক্ষাৎকারে সে বড় কড়া ভাষায় এমন এক কথা বলেছিল যাতে আমরা রীতিমত হতবাক হয়েছিলাম। ভারতীয়দেরকেও আই.এস.আই এর শ্রেষ্ঠত্বকে কবুল করে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ভারত বার্মা বলেছিল- তোমরা কি বোকামী করছ? আই.এস.আই মাত্র এক থেকে দেড় শত বালক প্রস্তুত করে কাশ্মীর প্রেরণ করে তোমাদের ৫ লাখ সেনাকে ১৫ বছর ধরে বন্ধক রেখে দিয়েছে। একদৃষ্টিকোণ থেকে কথাটি আই.এস.আই এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়। বাস্তবেই কাশ্মীরে শ’ থেকে দেড় শত মুজাহিদ ভারতীয় সেনাদেরকে হারান করে তুলেছে। যারা ওদেরকে পালাক্রমে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তাদের সাথে আত্মহত্যাকারীদের কি মিল রয়েছে? ভারতীয় জোয়ান কর্তৃক অফিসারদেরকে গুলি করা, বেপরোয়াভাবে গালি গালাজ করা, আক্রমণ করা, সেনাবাহিনী থেকে পলায়ন করার সাথে পাকিস্তানি মর্দে মুজাহিদদের কি তুলনা হতে পারে!

ভারতের শঠ প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা বড়ই বেদনাদায়ক ও লজ্জাজনক। যা কোন প্রফেশনাল আর্মির ক্ষেত্রে মানায় না।

এ পর্যায়ে আমাদের একটি কথা জেনে রাখা উচিত, পাকিস্তানি আর্মি Defensive Army যারা শত্রু আক্রমণ করার পরেই সক্রিয় হয়, তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রস্তুতি ও দীক্ষা এভাবেই হয়ে থাকে। এর অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হতে পারে। যার দ্বারা কয়েকটি পৃথক পুস্তকও রচনা করা সম্ভব। কিন্তু শঠতা বিদ্যার শিক্ষার্থীদের কাছে সব সময় একটি প্রশ্ন থেকেই যাবে যে. আপনারা কেন আক্রমণাত্মক Efensive নন? অথচ সর্বদাই ভারতের পক্ষ থেকে আক্রমণ চালানো হয়ে থাকে। এর উত্তর সুস্পষ্ট, পাকিস্তানের সকল প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান Modus Aprandia পলিসির অনুগত। এজন্য আই.এস.আই একান্ত অপারগতাবশত আক্রমণাত্মক হয়ে থাকে।

আমরা পাকিস্তানের জনগন ভাল পোষাকে থাকি অথবা সাদাসিদে পোষাকে থাকি, আমরা পাকিস্তানের ভূ-সীমানা ও দৃষ্টিভঙ্গির সীমানা রক্ষা করা আমাদের সর্বপ্রথম দায়িত্ব মনে করি। যেহেতু আমরা সর্বদাই ভারতের প্রথম কাতারের শত্রু থাকব সে জন্য আমাদের কর্তব্য হল স্বদেশের বিরুদ্ধে ভারতের সবধরনের অশুভ তৎপরতা, ষড়যন্ত্রের দাত ভাঙ্গা জবাব দিব। আমরা বিগত কয়েক বছরে দেখেছি, ভারতে কিভাবে গোয়েন্দা তৎপরতা চালায়, তাদের শক্তি কতটুকু, কর্মপদ্ধতি কেমন? আমরা এও জানি, ভারত আপন উদ্দেশ্য অর্জনে নিজে কর্মকর্তা বা এজেন্টদেরকে কিভাবে ব্যবহার করে!

ভারতীয় দূতাবাস ও কনস্যুলেট সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ভারতীয় কর্মকর্তাদেরকে সম্ভাব্য সকল উপকরণের মাধ্যমে পাকিস্তান সম্পর্কে যাবতীয় উপকারী তথ্য আবিষ্কার করার দীক্ষা দেয়া হয়। কখনও কখনও সীমান্ত পাড়ি দিয়ে সন্ত্রাসী, গোয়েন্দা অথবা দূতদেরকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়। একারণে আমাদের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সকে সর্বদা ভারতের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন থাকতে হয়। পাকিস্তানে ভারতের দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম গ্রুপঃ যারা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। ভারতীয় দূতাবাস ও কনস্যুলিয়েটের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ। এরা সাংবাদিক, শহরের গন্যমান্য ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং গল্প গুজবের মাঝে এদের থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে। এদের দ্বিতীয় পছন্দনীয় সার্কেল হল রাজনীতিবিদ। বিশেষ করে যারা পুরাতন রাজনীতিবিদ-সর্বদা ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। যাদেরকে ভারতের রাজনৈতিক ও সাংবাদিক ঘরানার লোকেরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। দূতাবাসের এসকল কর্মকর্তাগণ স্বাভাবিকভাবে সামাজিক উৎসব ও বিভিন্ন পার্টির মাধ্যমে এদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা করে থাকে। এসকল পার্টিতে বাহ্যিকভাবে তারা সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনকে প্রকাশ করলেও মূলত উদ্দেশ্য থাকে আরেকটি। তা হল, নিজেদের মূল লক্ষ্য অর্জন, কর্মধারা নিরূপন, মেহমানদের স্তর হিসাবে তাদেরকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা ইত্যাদি। এসকল উৎসব ও পার্টি আয়োজনের পরে তারা সেসব লোককে বিশেষভাবে উপটোকন প্রেরণ করে যাদের ব্যপারে আশ্বস্ত হয় যে, টার্গেট অর্জনে সে আমাদের জন্য উপকারী অথবা তার থেকে মূল্যবান কোন তথ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। বাহ্যত এসকল সম্পর্ক খোলা খুলিভাবেই হয়ে থাকে। মেজবানদের সাথে মেহমানের এ সম্পর্ক কোনরূপ ক্ষতিকারক বলে ধারণা হয় না। কিন্তু মেজবানদের

কর্মদক্ষতার প্রমাণ হল, তারা প্রশিক্ষণকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে কথার ফাঁকে তথ্য সংগ্রহে সফল হয়ে যায়। এবং এক সাক্ষাতের পরে আরেক সাক্ষাতের ধারাবাহিকতা চালু হয়ে যায়।

এসকল আমন্ত্রনের ব্যবস্থা সাধারণত দূতাবাসের কর্মকর্তাদের বাসস্থানে হয়ে থাকে। মেহমানদেরকে মোমবাতির মৃদু আলো, ক্লাসিক মিউজিকে মিষ্টি মধুর তরঙ্গের মাঝে মদের পেয়ালা পরিশেন করা হয়। কিছু কিছু পাকিস্তানি ভাই একে বিরল মনে করে থাকে। এ ধরনের যাদুময়ী পরিবেশে কর্মকর্তাদের রমনীরা পরিধেয় শাড়ীর আবরণে আচ্ছাদিত সৌন্দর্য পরিবেশন করতে শুরু করে। হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় একের পর এক মেহমানদের জাদুময়ী চোখের দ্বারা আকৃষ্ট করতে থাকে। এমন পরিবেশে তাদের আলাপচারিতায় প্রেম ও ভালবাসার অমৃতরস উপক পড়তে থাকে। এ ধরনের পরিবেশ এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যে, মেহমানের জান বাঁচানোর আর কোন সুযোগ থাকে না। এরপর তারা খুব শীঘ্রই হাতিয়ার মেরে দেয়। ফলে মেহমান থেকে মেজবানের কাঙ্ক্ষিত তথ্যের ভাণ্ডার খুলতে থাকে। দূতাবাসের কর্মকর্তারা তাদেরকে রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রতিরক্ষামূলক বিভিন্ন বিষয়ে পেঁচিয়ে ধরে। এসব বিষয়ে শুধু তথ্য সংগ্রহে ক্ষান্ত হয় না বরং এর প্রতিক্রিয়া কি বা তা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা কি তাও জেনে নেয়। বিশেষ করে এসকল বিশেষ সাক্ষাতানুষ্ঠানে কখনও এমন সব রহস্যবিদ ও গোপন তথ্য সম্পর্কে অবগত ব্যক্তির সাক্ষাৎ মিলে যায় যাদের সাথে ভবিষ্যতে দৃঢ় সম্পর্ক রাখার ব্যবস্থাও হয়ে যায়। এদের মধ্যে কতককে দূতাবাস বহির্ভূত তৎপরতায় সাবধানতা নিরূপনে রীতিমত উপদেষ্টা হিসাবে চয়ন করা হয়। কিছু লোক আছে যারা একে গর্বের বিষয় মনে করে। অবশেষে উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি জালে আটকে পড়ে। কিছুটা সময় আনন্দে কাটানোর জন্য, উন্নত মদ পান করার জন্য দেশপ্রেমিক আপন ভাই-ভাবির ধোকায় আটকে যায়। কারো জন্য এটাই খুশীর কারণ হয়ে দাঁড়ায় যে, রাজনীতি, রাষ্ট্র ও স্টেনালিশমেন্ট সম্পর্কে তার মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। মনোযোগের সাথে তার কথা শোনা হচ্ছে। নিজের মেধার ফেরেস্তেশনকে জাহির করার জন্য আলাপ দীর্ঘায়িত করতে থাকে এবং সাক্ষাতের পরে নিজেকে হালকা মনে করতে থাকে।

পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাগণ অসংখ্যবার এ সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারী বিদ্বান ও গুণীদেরকে জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করেছেন যে, এ সকল আলাপচারিতায় কোন বিষয়টি সব থেকে গুরুত্ব পেয়ে থাকে? শহরের এ সকল বিদ্বান নিজেদের মৌলিক অধিকার ভুলুষ্ঠিত হওয়ার অভিযোগকে গর্ব

ভরে এসকল হিন্দু 'বন্ধু'দের নিকট বলে বেড়ায়। আরো বলে, আমাদেরকে এজেন্সির নজরদারীতে থাকতে হয়। তল্লাশি চালানো হয়। তদন্ত করা হয়। এদের মধ্যে খুব কম লোকের এই অনুভূতি থাকে যে, আপন রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তাই একজন নাগরিকের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ অনেক লোক দেশপ্রেমের জয়বা থাকতেও এসকল এজেন্সির ভরপুর সহায়তা প্রদান করতে থাকে।

দ্বিতীয় গ্রুপঃ এ গ্রুপে দূতাবাস কর্মকর্তা ও দূতাবাস বর্হিভূত কর্মকর্তারা থাকে। যাদের সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সার্ভিসেস পুলিশ, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো 'র' এর সাথে। এদেরকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছদ্মবেশে নিযুক্ত করা হয়। এদের অধিকাংশ ভিসা প্রসেসিং অফিসে কর্তব্যরত। এদের প্রতিনিধিরা অধিকাংশ সময় ভিসা গ্রহণ করতে আসা সাধারণ নাগরিককে হেস্তনেস্ত করে থাকে। এরা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী অতিশয় দক্ষ দাবাড়ু ও আত্মনির্ভরশীল। আপন ধারণা অনুযায়ী তারা পূর্ণ আশ্বস্ত যে, তারা সময় অপচয় করে না। অফিস টাইম ব্যতীত অন্যান্য সময়ও কোন না কোন মিশনে থাকে। যেমন, কোন বিশেষ সাক্ষাতের জন্য, কোন গোপন কাজ পূর্ণ করার জন্য, উপরস্থ কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহ করার জন্য অথবা তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অথবা কোন সহকর্মীকে গোয়েন্দা সংস্থার থেকে রক্ষা করার জন্য ধোকা দিতে কোন মিশনে অব্যাহত থাকে। যাতে তাদের অগোচরে এমন কোন পথ খুঁজে পায় যাতে তার সহকর্মীকে বাচার উপায় বলে দিতে পারে।

তৃতীয় গ্রুপঃ এরা কর্মকর্তাদের অধিনস্ত ব্যক্তি। যাদের কর্মপরিধি অফিস থেকে ঘর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এরা অধিকাংশ সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য স্থানীয় মার্কেট সমূহে যাতায়াত করে বলে প্রকাশ করে। এদের আয় উপরস্থ কর্মকর্তাদের থেকে অনেক কম। এজন্য তারা দোকানদারদের সাথে দরদাম করে এবং পাকিস্তানী মার্কেটে ডাল, সবজি, গোশতের দামকে ভারতের মার্কেটের মূল্যের সাথে তুলনা করতে দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ সময় এদের ক্রয়ক্ষমতা একটি বাধাকপি বা এক কেজি আলুর চেয়ে বেশী হয় না। ভারতীয় দূতাবাস কর্মকর্তাদের এসকল অধিনস্থ আমলাদের একান্ত বাধ্যবাধকতার জীবন কাটাতে হয়। এরা সাধারণত ভারতের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। এরা চেষ্টা করে, বেতনের থেকে একটি পয়সা বাঁচিয়ে রাখব, যাতে চাকরী থেকে অব্যাহতি নেয়ার পর এতটাকা জমা থাকে যে বাকী জীবন স্বাছন্দে কাটাতে পারি। ভারতে যেহেতু ভাল লবন দুস্প্রাপ্য তাই এরা ছুটির সময়ে পাকিস্তান থেকে লবন কিনে নিয়ে যায়। এরা স্থানীয় লোকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা থেকে দূরে থাকে। প্রতিবেশীদের সাথেও তাদের থেকে তেমন কোন সৌজন্যমূলক আচরন প্রকাশ পায় না।

চতুর্থ গ্রুপ: এরা দূতাবাস বা কনসুলিয়েটের কোন লোক নয়। বরং বিশেষ টার্গেট সামনে রেখে এম্বাসী স্কুল, এয়ার লাইস, অফিস ব্যাংক অথবা সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। এসব গ্রুপের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ব্যতিতও পাকিস্তানের বিশাল সীমান্ত এলাকায় দুর্বৃত্ত সন্ত্রাসী ও গোয়েন্দা এজেন্টদের অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে।

পাকিস্তানের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এর জন্য ভারতের অপতৎপরতার জবাব দেয়া একটি স্বতন্ত্র চ্যালেঞ্জ। আমরা এক্ষেত্রে পূর্ণযোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে তা মোকাবেলা করি। আমরা ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' কে তার লক্ষ্য বস্তুতে সক্ষম হতে কিছুটা সফল মনে করলেও ভারত যেমন আই.এস.আই ফোবিয়ায় আক্রান্ত 'র' এর থেকে আমরা মোটেও শংকিত নই। আই.এস.আই ভারতের জন্য বাহরামের রূপে আবির্ভূত, যার ফলে তাদের বড় মারাত্মক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। এর সব থেকে বড় প্রমাণ হলো, বোম্বে থেকে আসাম পর্যন্ত, মাদ্রাজ থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত যেখানেই স্বাধীনতার কোন আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে বা বোমা ধামাকা হয়েছে ভারতের কর্তৃপক্ষ এর পিছনে আই.এস.আই এর হাত আবিষ্কার করেছে। এখন এর অবস্থাতো, মায়েরা তাদের সন্তানকে আই.এস.আই এর ভয় দেখিয়ে কারু করে।

অসংখ্যবার ভারতের সিকিউরিটি কর্মকর্তারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের উপর নির্মমতা চালিয়েছে। এসব ঘটনা থেকে একথা সহজেই অনুমেয় যে, ভারতের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স আপন ব্যর্থতার ক্রোধকে নিরীহ রাষ্ট্রদূতদের উপর আরোপ করে। এটা সরাসরি পাকিস্তানের সফলতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতীয়দের মাঝে সৃষ্ট ফেরেস্টারেশন ও কনফিউশনের বহিঃপ্রকাশ।

ভারতে অবস্থিত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতদের বিরুদ্ধে যখন তারা কোন সঠিক তথ্য প্রমাণ না পায় তখন পাগলের মত চড়াও হয়ে যায়। ভরা বাজারে আপন জনতার সামনে গালি-গালাজ করতে থাক এবং মারপিট করা থেকেও বিরত থাকে না। পাকিস্তানি হাই কমিশনের আমলা অথবা রাষ্ট্রদূতদের বিরুদ্ধে যে সকল ঘটনা ঘটে উহা ভারতীয় এজেন্সির ব্যর্থতা ও অযোগ্যতার পরিষ্কার স্বীকারোক্তি বৈ কিছুই নয়। সাথে সাথে এসকল ঘটনা ভারতীয়দের জাতীয় ধ্যান ধারণাও কীর্তি কলাপের পরিচয় প্রদান করে। কখনও কখনও তারা নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার ক্ষেত্রে নৈতিকতার সকল সীমা অতিক্রম করে ফেলে। এ সম্বন্ধে এক এম্বেসী ফরেস্ট সেক্রেটারী মিস্টার মালিকের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন। যে নয়া দিল্লীতে উক্ত পদে নিযুক্ত ছিল।

তিনি ১৯৮১ সালের ২রা ডিসেম্বর আপন সন্তান সন্ততি নিয়ে নয়াদিল্লি পৌঁছেন। তার অবস্থান ছিল সর্দার পেটেল রোডে রচ গেস্ট হাউজে। প্রথম দিনেই যখন রাতে খাবার খেয়ে ফিরে এসেছেন তখন অনুভব করেন যে, তার অনুপস্থিতিতে কামরা তল্লাশি করা হয়েছে। তিনি খুব সতর্কতার সাথে কামরা পর্যবেক্ষণ করলেন। দেখলেন কারেন্টের সুইচ বোর্ডের পিছনে এক প্যাকেট চরস-ভাং ও আফিমের সংমিশ্রণে তৈরী এক প্রকার মাদক। সম্ভবত ভারতীয়দের পরিকল্পনা ছিল-স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের একত্রিত করে তাদের উপস্থিতিতে মিস্টার মালিকের কামরা তল্লাশি করে চরস বের করা হবে। ফলে তাকে স্মাগলার সাব্যস্ত করা যাবে। এতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হবে। মিস্টার মালিক তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্রদূতের সাথে যোগাযোগ করে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করল। নিশ্চিত হোটেলের স্টাফদের মধ্যে একজন ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট ছিল। সে মিস্টার মালিকের ফোনালাপ শুনে ফেলে এবং অফিসারদের নিকট তা পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে ভারতের এজেন্সীদের পরিকল্পনা ভেঙে গেল।

এটাতো মিস্টার মালিকের বুদ্ধিমত্তা ও সময়মত পদক্ষেপ গ্রহণের ফল। যার কারণে একজন সম্মানিত দূতাবাস কর্মকর্তা মাদক দ্রব্যের স্মাগলার হওয়ার অপবাদ থেকে বেঁচে গেল। পরবর্তী দিন তিনি ইণ্ডিয়ান ফরেন অফিসে শুধু অভিযোগই তোলেননি; বরং এক প্রেস কনফারেন্সেরও আয়োজন করেন। যাতে তিনি চরসের সেই প্যাকেটটি সাংবাদিকদের দেখান। এতে করে ‘র’ এর মাথায় চুনকালি লেপে যায়। চাণক্যের মুখে খর লেগে যায়।

আমাদের গর্বের বিষয় হল, আমরা কখনও এ ধরনের অসৌজন্য মূলক, নিকৃষ্ট কু-পরিকল্পনা করিনি। আমরা যদি কোন ভারতীয় কর্মকর্তাদের গালে কখনও থাপ্পড় দিয়েছি, তাও একেবারে অপরাগতাবশত। এর দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল-ভারতীয়দের একথার পয়গাম পৌঁছানো যে, আমাদের ভাই যদি নয়াদিল্লীতে নিরাপদ না থাকে তবে ইসলামাবাদে আমরা ইটের জবার পাথর দিয়ে দেয়ার সক্ষমতা রাশ্টি। কখনও শত্রুকে সে ভাষায় বোঝানো আবশ্যিক হয়ে পড়ে যে ভাষায় সে বুঝবে, বানর তো সেই ভাষায়-ই বোঝে।

পাকিস্তানের সাথে ভারতের দূতাবাসের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত সব সময় ধোকা ও প্রতারণা আশ্রয় নিয়েছে। চাণক্যের ফরমানকে সামনে রেখে কাজ করেছে-যে বলেছিল “তোমাদের সর্বাধিক নিকটতম প্রতিবেশী কখনও তোমাদের বন্ধু হতে পারে না।”

১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর যখন ভারত পাকিস্তান-এর দূতাবাসের সম্পর্ক স্থির হল, তখন আই.এস.আই ভারতীয় দূতাবাসে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দেয়। কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের ক্লিয়ারেন্স জেনে বুঝে মূলতবী করে রাখে। বরং আমাদের ফরেন অফিসের উপর চাপ সৃষ্টি করা শুরু করে যে, ভারতীয় কর্মকর্তাগণকে একই সময় পাঠানো হবে এবং উত্তম এটাই ছিল যে, সম্মিলিত চেক পোস্ট ওয়াগাতে উভয় রাষ্ট্রের দূতদের পারস্পরিক পরিচিত লাভ হবে।

আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় দূতদেরকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য অস্থির দেখা যাচ্ছিল। আর তারা পরিপূর্ণ চেষ্টা করেছিল যে, তাদের সুপারিশকে যেন কবুল করা হয়। এমনকি তারা ডি.জি.আই কে একথার উপর সম্মত করায় যে, ভারতীয় আমলাদের এখনই আগমনে কোন সমস্যা নেই। কিছুদিন পরেই ক্লিয়ারেন্স পেয়ে যাবেন। কিন্তু ডি.জি.আই কে পরিস্কার বলে দেয়া হয়েছিল যে, ভারত সরকার চালাকি করছে। তারা পাকিস্তানি আমলাদের ক্লিয়ারেন্সকে অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মূলতবী রাখবে। যদি তাদের আমলারা ইসলামাবাদের পৌঁছে যায় তবে আমাদের পাকিস্তানি আমলাদের ক্লিয়ারেন্সের জন্য ভারতের উপর চাপ সৃষ্টির কিছুই থাকবে না। ডি.জি.আই- সাহেব এতে একমত পোষণ করেন এবং পাকিস্তান বিষয়টি চূড়ান্ত করতে সক্ষম হয় যে, উভয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতগণ একই সময়ে ওয়াগা চেক পোস্ট অতিক্রম করবে।

বোম্বাতে পাকিস্তানি কনসুলিয়েট ও করাচীতে ভারতীয় কনসুলিয়েট খোলার সময়ও প্রায় এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তখনও একই প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। আমরা তখনই ভারতীয় আমলাদেরকে ক্লিয়ারেন্স দেব যখন উভয় পক্ষের অফিস খোলা বন্দোবস্ত শেষ হবে। কিন্তু পাকিস্তানি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুনরায় এর বিরোধিতা করে। তাদের কথা ছিল এটাতো শুধু নিয়ম মানা। ভারতীয় সরকার তো ওয়াদা করেছে জিন্নাহ হাউস খালি করে দিবে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানি আমলাদেরকে শানদার অভিবাদন জানানো হবে। এর জবাবে ফরেন অফিসকে এক চিঠিতে লেখা হয়-ভারতীয়দের মানসিকতা বুঝতে আমাদের আরেকটু অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। ওদের এ ওয়াদা কোথায় যাবে! ওয়াদা পূর্ণ করা তো দূরে থাক, বোম্বাতে কনসুলিয়েট খোলার ব্যাপারেও ওরা প্রতারণার আশ্রয় নিবে। কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুনরায় এ কথার প্রতি উদাসীন হয়। তাদের বক্তব্য ছিল, সিন্ধে বসবাসরত পাকিস্তানিদের ভারতীয় ভিসা মিলতে অনেক ঝামেলার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাদের বিষয়টি সহজ হওয়ার জন্য করাচীতে ভারতীয় কনসুলিয়েট খুব দ্রুত খুলতে দেয়া প্রয়োজন।

কিন্তু জনাব তিরমিযী সাহেব বলেন, আমিও আমার মতের উপর অটল ছিলাম। যতক্ষণ আমাদেরকে বোম্বেতে কনসুলিয়েট খোলার অনুমতি না মিলবে আমরাও করাচীতে ওদের কনসুলিয়েট খোলা অনুমতি দেব না। কিন্তু ভাগ্যের খেলা, ফরেন অফিস দ্বিতীয়বার নিজেদের আগ্রহকে নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করে।

“আপনি মনে করেন আই.এস.আইই শুধু পাকিস্তানের ওফাদার সংস্থা? ফরেন অফিসের ওফাদারীতে সন্দেহ হয়?”

অবশেষে আমাদের সুপারিশকে একেবারেই নাকচ করা হল। এক তরফাভাবে তারা করাচীতে ভারতীয় কনসুলিয়েট খোলার অনুমতি দিয়ে ছিল। ওদিকে ভারত সরকার আমাদেরকে বোম্বেতে কনসুলিয়েট খোলার ক্ষেত্রে শুধু ব্যবস্থাপনায় ও দূতাবাস সংক্রান্ত সমস্যা দাড়া করাল না। বরং জিন্নাহ হাউস ছেড়ে দেয়ার ওয়াদাও ভঙ্গ করল। করাচী পৌছেই ভারতীয় কনসুলিয়েট স্টাফ সিন্ধে শুধু নিরাপত্তাহীনতাই বৃদ্ধি করল না বরং ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে কলঙ্কিত হল। ভারত জিন্নাহ হাউস দিতে শুধু অস্বীকারই করেনি বরং দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সাথে এমনসব আচরন অব্যাহত রাখল যার ফলে পাকিস্তান বোম্বেতে কনসুলিয়েট বন্ধ করতে বাধ্য হল। যে পরিস্থিতিতে পাকিস্তানী আমলারা বোম্বে থেকে ফেরত আসতে বাধ্য হয়েছিল, তা কোন গোপন কথা নয়। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতীয়দেরকেও করাচী থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল।

এ ধরনের অনেক ঘটনাই আমাদের ইন্টেলিজেন্স ইতিহাসের অংশ। ২০০৯ এর মে মাসে লাহোরে আই.এস.আই এর অফিসে সন্ত্রাসীদের ব্যর্থ হামলা এবং এর পূর্বে সংঘটিত আই.এস.আই ও অন্যান্য সিকিউরিটি প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা এ কথা বলার জন্য যথেষ্ট যে, শুধু আই.এস.আইই কেন পাকিস্তানের শত্রুদের টার্গেটে পরিণত হয়?

‘র’

RAW

ৱ

(ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা)



লোগো

পূর্ণনামঃ

Research and Analysis Wing

প্রতিষ্ঠাঃ ২১ সেপ্টেম্বর (১৯৬৮)

কর্মীঃ গোপনীয়

বার্ষিক বাজেটঃ গোপনীয়

সদর দপ্তরঃ নয়াদিল্লি, ভারত

নীতি বাক্যঃ ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করা

সংস্থাপ্রধানঃ রজেন্দার খান্না, সেক্রেটারী

অভিভাবক সংস্থাঃ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর অফিস

‘র’ RAW ১১

ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা

চাণক্যের দর্শন যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি গঠন করে, তা হল-‘ভালবাসা ও যুদ্ধের মত গোয়েন্দাগিরীতেও সব কিছু বৈধ’। এ জন্য সে গোয়েন্দা বৃত্তিতে ধোকা, প্রতারণা, শঠতা, চতুরতা, অধিকার হরণ, নারী ও মাদকদ্রব্য, প্রাণনাশক সব সরঞ্জাম ও বিষ ব্যবহারকে বৈধ বলে।

কৌটিল্য বিদ্রোহীদের সহায়তায় হত্যা, লুণ্ঠন, বিদ্রোহ এবং রাষ্ট্রদ্রোহীতার আগুনে তেল ফেলার জন্য ধ্বংসযজ্ঞ চালানো, গুজব রটানো, প্রতারণা করার মাধ্যমে সামরিক অপারেশন সমূহে সহায়তা প্রদান, শত্রু শিবিরে ভুল তথ্য ছড়িয়ে শত্রুকে ভীত করা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে কপটতার বীজ বপন ইত্যাদি সব ঘণিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একটি বিশেষ অপারেশনাল বাহিনী গঠনের ধারণা পেশ করে। আর তার সেই দর্শনের উপরই ‘র’ এর ভিত্তি স্থাপিত।

Inside Raw এর লেখক আশোক রায়না এর বক্তব্য হল-

সনজু ও কৌটিল্যের যুগ থেকে অদ্যবধি গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন আসেনি। অন্তত ‘মৌলিক নীতিমালা’ পূর্বের গুলোই বহাল আছে। সাইন্স ও টেকনোলজির অগ্রগতিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও যোগসাজশের মধ্যে রূপের ভিন্নতা এসেছে মাত্র। যার ফলে এখন জটিল ও সুবিন্যস্ত ইন্টেলিজেন্স সংস্থার উদ্ভব হয়েছে।

ভারতের গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞরা গোপন তথ্য সুশৃঙ্খলকরণ ও এজেন্টদের পাঠানো খবরাবরকে যাচাই বাচাই করার জন্য একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করে। যেখানে একটি সুপ্রিম ইন্টেলিজেন্সও থাকবে সকল ক্ষেত্রে তাদের গৃহীত সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত মনে করা হবে। এ চিন্তাটাই ‘র’ প্রতিষ্ঠার প্রকৃত কারণ।

‘র’ প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এ হতে পারে যে, মূলত ‘র’ আই.বি.এর ব্যর্থতার পেট থেকে জন্ম নিয়েছে। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আই.বি.) ভারতের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ইন্টেলিজেন্স ছিল। ১৯৬২-এর ভারতীয় যুদ্ধের পূর্বে আই.বি.-কে সব থেকে সক্রিয় গোয়েন্দা সংস্থা বলে ধারণা করা হত। কিন্তু ১৯৬২ সালে ভারতীয়

সেনাবাহিনী চীনের হাতে দৃষ্টান্তমূলক পরাজয় বরণ করে। সমর বিশেষজ্ঞরা যখন একত্র হয়ে কারণ খুঁজে বের করেন তখন তাদের সিদ্ধান্ত ছিল এই-১৯৬২ সালের যুদ্ধে আই.বি. চীনের সামরিক শক্তি, সেনাবাহিনীর মিত্রদের গতিবিধি, অপারেশনের তথ্য, যুদ্ধ কৌশলসহ সকল ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার শিকার হয়েছিল। এতে চীনের হাতে ভারতের লাঞ্ছনাময় পারজয়ের মূলভিত্তি রচনা করেছিল আই. বি.।

তখনকার প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরুর সামনে যখন এই রিপোর্ট পেশ করা হল তখন তিনি কালক্ষেপন না করেই তৎক্ষণাৎ সামরিক তথ্য সংগ্রহের জন্য পৃথক একটি ইন্টেলিজেন্স সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত দেন।

অবশেষে ১৯৬৩ সালে ‘র’ এর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রস্তুতিপর্বে প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন মিস্টার সঞ্জিবি পিলাই। Sangivi pillai যিনি যুক্তিসঙ্গতভাবেই আরকি এ্যাক্ট অব ‘র’ এর সম্মাননা অর্জন করেন।

পিলাই ১৯৮৯ সালে আই.বি. প্রতিষ্ঠা করেছিল। ‘র’ এর সূচনাও তার হাতে হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ‘র’ কে আই.বি. এর অংশ মনে করা হত। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এমন ছিল। কিন্তু ১৯৬৮ সালের ২১ ডিসেম্বর মাসে ‘র’ কে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয়া হয়।

‘র’ বহিঃরাষ্ট্রের কর্মতৎপরতা ‘পাকিস্তান’ দিয়ে শুরু করে। সর্বপ্রথম ‘র’ রাষ্ট্রদূতের ছদ্মবেশে পাকিস্তান (বাংলাদেশ তখন পূর্ব পাকিস্তান ছিল), জার্মান ও জাপানে তাদের এজেন্ট প্রেরণ করে। চীনের তিব্বত, সিকিম, বার্মা, আফগানিস্তান শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, নেপাল ইত্যাদি রাষ্ট্রে নিজেদের অবস্থান শক্ত করে মধ্য প্রাচ্যের দিকে মনোযোগ দেয়। সেখানের প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রে নিজেদের স্টেশন বানিয়ে নেয়।

‘র’এর প্রতিষ্ঠা ও গঠন পদ্ধতি বুঝতে হলে ভারতের ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম বোঝা আবশ্যিক। এখন আমরা ভারতের ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করব।

ভারতের ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম (INTELLIGENCE SYSTEM)

কেবিনেট কমিটি ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি: Cabinet Committee for National Security

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে এ কমিটিতে রয়েছে পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও অর্থমন্ত্রী। এই কমিটি জাতীয় নিরাপত্তা ও গোপন বিষয়ে পলিসি তৈরী করে এবং যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়কে চিন্তা গবেষণা করে করণীয়

কর্মনীতি প্রনয়ণ করে।

সিনিয়র সেক্রেটারিয়েস কমিটি: (Senior Secretaries Committee)

এ কমিটি মন্ত্রী পরিষদের সহায়ক। কেবিনেট কমিটি (মন্ত্রী পরিষদের) পক্ষ থেকে প্রস্তুতকৃত ইন্টেলিজেন্স, নিরাপত্তা ও গোপন বিষয় সমূহের পলিসি তৈরী করে। এবং সকল রাজনৈতিক বিষয়ে গভীর চিন্তা ফিকির করে কর্মপদ্ধতি নিরূপণ করে।

ইন্টেলিজেন্স বোর্ড: (Intelligence Board)

দেশের ভেতর যতগুলো ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি সক্রিয় এ বোর্ড সেগুলোর কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধান করে। জাতীয় নিরাপত্তা ও ইন্টেলিজেন্স বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত। এ বোর্ডের প্রধান হল প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা। কেবিনেট সেক্রেটারিয়েটের মধ্যে এর অফিস অবস্থিত।

আভ্যন্তরীণ ও বাহিরের সম্মিলিত ইন্টেলিজেন্স কমিটি: (Joint Intelligence Committees Internal and External)

Jic আভ্যন্তরীণ আর Jic বহিঃরাষ্ট্রের দুইটি কমিটি। যার মধ্যে Jic আভ্যন্তরীণ বিষয়ে এবং Jic বহিঃরাষ্ট্র তথা আন্তর্জাতিক বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। এই দুই কমিটি সামরিক ও বেসামরিক সকল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির রিপোর্ট পরোখ করে দেখে। উভয় কমিটিই কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট এর অংশ এবং যৌথভাবে উহার ইন্টেলিজেন্স উইং এর কাজ করে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী: (Internal Intelligence Agencies Under Home Minister)

১৯৮৫ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিরাপত্তা বিষয়ক একটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা এজেন্সি নিম্নরূপ:

ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো: (Intelligence Bureau, I.B)

এই ব্যুরোর সদরদপ্তর নয়া দিল্লীতে অবস্থিত। এটি প্রতিরোধ ইন্টেলিজেন্স এর দায়িত্বশীল।

সেন্ট্রাল ব্যুরো ইনভেস্টিগেশন: (Central Bureau Investigation)

এর দায়িত্ব হল, দেশের শত্রু উপাদানকে অনুসন্ধান করা, দেশ থেকে দূর্নীতি, বিশৃংখলা, সামাজিক অপরাধ, সন্ত্রাস, ধ্বংসযজ্ঞমূলক কর্মকাণ্ডকে খতম করা।

এই সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন সরকারী দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কর্মতৎপরতা চালায়।

প্যারা মিলিটারী ফোর্স: (Pera Military Forces)

প্যারা মিলিটারী ফোর্সেজ ও অন্যান্য সকল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির গোপন তথ্যকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাঠানো হয়। এতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পলিসি এবং সি.আই.ডি এর গোপন রিপোর্ট থাকে।

পারসোনালা সিকিউরিটি গার্ড অব প্রাইমিনিস্টার: (Personnel Security Guards Of Prime Minister)

ইনস্পেক্টর জেনারেল পুলিশ অথবা তার সমমর্যাদার কোন পুলিশ অফিসারের অধীনে একটি দক্ষ ইউনিট গঠন করা হয়েছে। যাতে রয়েছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ কমান্ডো বাহিনী। এই কমান্ডো বাহিনী প্রধানমন্ত্রীর সিকিউরিটি গার্ড অব প্রাইম মিনিস্টার। এই গার্ডদের চীফ আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রীর অধীনে প্রতিরক্ষা ও অর্থমন্ত্রণালয়ে আওতায় কাজ করে।

ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স ইউনিটস্: (Defence Intelligence Units)

নেভি, ল্যান্ডফোর্স, এয়ারফোর্স এর ভিন্ন ভিন্ন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিসমূহ যাকে তার হেডকোয়ার্টার এর প্রধান নিয়ন্ত্রণ করে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ফিন্যান্স মিনিস্টারী (Finance Ministry)

অর্থ মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় ইন্টেলিজেন্স সেট আপ। যাকে ডাইরেক্টরিয়েট অব রিনিউ ইন্টেলিজেন্স সেট আপ এজেন্সি বলে। নিজস্ব দায়িত্বের পাশাপাশি ইনকাম ট্যাক্স অফিস ও কাস্টমস্ অফিসের কাজও আঞ্জাম দেয়।

বহিঃরাষ্ট্রের বিষয়াদি ও যৌথ দূতাবাস নজরদারি, নয়াদিল্লি (External Affairs Goint Diplornatic Surveilace Newe Dehli)

এটি বিভিন্ন এজেন্সির সংযোগস্থল। এর কাজ হল, ভারতে অবস্থিত নয়াদিল্লীর সকল দূতাবাস সমূহের বিরুদ্ধে কর্মধারা প্রণয়ন করে। এর দায়িত্ব বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের নজরদারী করা। প্রতিরোধের জন্য অন্যান্য এজেন্সির সহায়তা গ্রহণ করে।

রিসার্চ এণ্ড এনালাইসিস উইং'র' (Research and Andliysis Wing Raw)

এটা ভারতের সর্ববৃহৎ আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ইন্টেলিজেন্স। এটা একমাত্র গোয়েন্দা সংস্থা যা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর জবাবদিহিতায় বাধ্য। 'র' ভারতীয়

আভ্যন্তরীণ তৎপরতায় সক্রিয় থাকে। তেমনিভাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত গোপন মিশনসমূহ বাস্তবায়ন করাও এর দায়িত্ব। ‘র’ এর স্বতন্ত্র একটি উপাখ্যান রয়েছে। এর সবথেকে বেশী প্রয়োজন প্রধানমন্ত্রীর। বিগত কয়েকজন প্রধানমন্ত্রী সংস্থাটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। যদিও এর পূর্বে দেশে অন্যান্য অনেক গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করত। কিন্তু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী একে সর্বোচ্চ সক্রিয় করতে বিশেষ নজর দিয়েছেন। যার ফলে ‘র’ এর কার্যক্রমে ভিন্ন গতি এসেছে।

‘র’ এর কর্মপদ্ধতি (MODUS OPERANDI)

অপারেশনের জন্য ‘র’ সাধারণত নয়াদিল্লীর ইস্টব্লাক অব সাজ কমপ্লেক্স আর এর দ্বিতীয় ভবনের ১১তম ফ্লোর থেকে লাঞ্চার করে। শুধু অপারেশনের জন্যই ‘র’ নয়াদিল্লীতে ডজন খানেক ভবন নির্মাণ করে রেখেছে। এতে রয়েছে বিভিন্ন বিভাগের অফিস ও প্রশিক্ষণ সেন্টার। ভিসনাত বিহারের ন্যায় অভিজাত আবাসিক এলাকায় অনেক সেইফ হাউস রয়েছে যাতে সোর্স সংবাদবাহক ও এজেন্টদের সাথে সাক্ষাত করে।

এখন এ সকল ব্যবস্থাপনা ও অফিস লক্ষ-কোটি টাকার সম্পদ নয়াদিল্লীর লুধী রোডে অবস্থিত ১৩ নং ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ‘র’ এর বর্তমান হেডকোয়ার্টার নির্মাণ ১৯৭৬ সালের প্রারম্ভে শুরু হয়েছে। গোপনতথ্য সংরক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রেখে উক্ত ভবনের নির্মাণ কার্যক্রম মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসকে ঠিকা দেয়া হয়। ভবনটির অধিকাংশ কক্ষ এটম বোম প্রফ (নিউক্লিয়ার প্রফ)। মাটির নীচে সুড়ঙ্গ পথে অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিও এখানে রয়েছে।

মাটির নীচে থেকেই সাউথ ব্লাকের প্রাইম মিনিস্টার ও প্রেসিডেন্ট অফিসের সাথে সংযোগ রাখা হয়েছে। এছাড়া ডাউলা কুআন (Dhoola Kuan) ইনডার প্রাস্টা (Inderprastha) তে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সেইফ হাউস ৫ ও ৭ নং হেলি রোড (HALLEY Road) লাক্সারী ফ্ল্যাটস নং আই ৪০১-আই ৪০২ সফদর জংগ ইসপিটাল রোডের পরেই গুরি সদন এপার্টমেন্টে (Guri Sadan) অবস্থিত।

এ সকল এপার্টমেন্ট M/S Byush ও ফিন্যান্স লিমিটেড নামের আড়ালে নির্মাণ করা হয়েছে। এ ধরনের আরো অফিস রয়েছে সফদর জংগ ইনফ্লাভ (Safdar Gang Enclave) ও (Asiad Village) তে।

এছাড়া 'র' আউদে পাক ১৭৩ এবং ১৯ ডিফেন্স কলোনীতে এক বাংলো রেখে দিয়েছে। একটি ফ্লাট গোরী এগার্টমেন্ট আওরঙ্গজেব লেন, দিল্লীতেও রয়েছে।

শুধু দিল্লীতে 'র' এর ২৫টি সেইফ হাউস রয়েছে যেখান থেকে 'র' অপারেশন লাঞ্চ করে। এসকল সেইফ হাউজে 'র' এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ললনারা বিদেশি মেহমানদের সেবা করে। একবার এখানে রাত্রাপনকারী কোন দুর্বল ব্যক্তিও দ্বিতীয়বার এখানে আসার আকাংখা পোষণ করে থাকে।

ভারতের প্রত্যেকটি বড় বড় শহরে 'র' এর শাখা অফিস রয়েছে। এ সকল অফিসসমূহকে অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক কম্পিউটরাইজড ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বোম্বে, বাংলোর, মাদরাজ, কলকাতা, লাখনৌ, পাটনা ও পাকিস্তানী সীমান্তবর্তী সকল উল্লেখযোগ্য শহর ছাড়াও দক্ষিণ সীমান্তের সকল শহরে 'র' এর অফিস রয়েছে।

বাহিরে প্রেরিত গোয়েন্দা এজেন্টদের মৌলিক দুটি স্তর। প্রথমত: পুলিশ অথবা আই.বি. থেকে প্রেরিত এজেন্ট। যারা দূতের বেশে বিভিন্ন মিশনে বিদেশে যায়। দ্বিতীয়ত 'র' এর নিয়মতান্ত্রিক সদস্য। যারা প্রয়োজনের সময় বিভিন্ন দেশে বারবার প্রেরিত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের কিছু লোককে কখনও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিষয়ে রিসার্চ ডাইরেক্টরিয়েটেও পাঠানো হয়। এই ডাইরেক্টরিয়েট মন্ত্রণালয় ভবনের মধ্যেই অবস্থিত। 'র' এর এই ধরনের অফিসার ৬ মাস থেকে ২ বছরের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত বিষয়ে আপন সাথীদের সাথে খোলাখুলি ভাবে মিশে যায় এবং রেগুলার ফরেন সার্ভিস অফিসারের আঙ্গিকে নিজের ছদ্মরূপকে পারফেক্ট বানানোর চেষ্টা করে। বহিঃরাষ্ট্রের সকল ভারতীয় মিশনে কোন না কোন ভাবে 'র' এর সদস্য বিদ্যমান। সাধারণত 'র' এর সিনিয়র কোর অফিসারদেরকে ফরেষ্ট সেক্রেটারীর পদ প্রদান করা হয়। তবে ওয়াশিংটন, মস্কো, টোকিও ও লণ্ডন এর মত গুরুত্বপূর্ণ মিশনে তাদের কনসুলর বা মন্ত্রী পদ দেয়া হয়। এরা মুক্তভাবে কাজ করে এবং দিল্লী অফিসের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখে।

'র' দূতের ছদ্মবেশে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। যা নিম্নরূপ:-

১. টার্গেট রাষ্ট্রে 'র' এর কোন অফিসারকে সে রাষ্ট্রে ভারতীয় কোম্পানী, বিল্ডার্স গ্রুপ, শিল্প বা ব্যবসা কিংবা সাংস্কৃতিক প্রকল্পগুলোকে এক্সিকিউজ অথবা যোগাযোগ অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।
২. বহিঃরাষ্ট্রের সাংবাদিক বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ইনফরমেশন মিডিয়ায় কর্তব্যরত ভারতীয় নাগরিকরাও 'র' এর জন্য অনন্য মাধ্যম।

বিশেষ কিছু রাজধানীর অল ইণ্ডিয়া রেডিও-এর অনেক সাংবাদিক 'র'এর এজেন্ট।

৩. জাতিসংঘ এবং ইউনিসেফের মত অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্তব্যরত ভারতীয় নাগরিকদেরকে 'র' এর স্পেশাল এজেন্ট রূপে নিয়োগ দিয়ে রাখা হয়েছে।
৪. ইণ্ডিয়ান অথরিটি বিদেশী মিশনসমূহে তথ্য সংগ্রহে ব্যাপকতার প্রয়োজন অনুভব করে। বৃহৎ মিশন সমূহে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক পদে 'র' বা আই.বি এর তিনজন কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। বিদেশে ভারতের ফরেন ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তার উপস্থিতি এত বেশী যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে।

সূচনালগ্নে 'র' এর মধ্যে সেসব অফিসার কর্তব্যরত ছিল যাদেরকে সরাসরি ভর্তি করা হত। যারা আই.বি এর বাইরের উইংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এরপর সমমর্যাদার অনেক অফিসার পুলিশ ও অন্যান্য সার্ভিস থেকেও নেয়া হয়। যাতে হঠাৎ বিস্তৃত হওয়া অধিক প্রয়োজনকে পূরণ করা সম্ভব হয়। এরপর 'র' নিজ অফিসার নিজেই ভর্তি করা শুরু করে। ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ালেখা সমাপনকারীদের থেকে অফিসার পদে সরাসরি ভর্তি করা হত। ব্যবস্থাপনা ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেধা ও শারিরিক যোগ্যতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হত।

এদেরকে সাধারণত ২২ থেকে ২৮ বছরের মাঝে ভর্তি করা হয়। যাদেরকে শুধু তদন্ত ও বিশ্লেষণের জন্য ভর্তি করা হয় তাদের বয়সের কোন সময় সীমা নেই। ভর্তির জন্য নির্ধারিত মাপকাঠি সকল স্তর থেকেও উচ্চতর রাখা হয়।

প্রাথমিক দিকে সিনিয়র অফিসারদেরকে বিদেশে যেমন আমেরিকা ইত্যাদি দেশে প্রেরণ করা হত। যাতে তারা পৃথিবীর বড় বড় ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির অবলম্বনকৃত কর্মপদ্ধতি ও অত্যাধুনিক কৌশল সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। এরপর 'র' খুব দ্রুতই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এক বিশাল বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে যাদেরকে অন্যান্য সার্ভিস থেকে নেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন ছিল।

'র'এর সদর দপ্তর নয়াদিল্লীতে অবস্থিত। 'র' কে এই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল যে, সে পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ইন্টেলিজেন্স সমূহের মত কাজ করবে। যেমন সি.আই.এ, মোসাদ, কে.জি.বি কাজ করে থাকে। নিজেদের শক্ত অবস্থানের জন্য এসব এজেন্সি থেকেও সাহায্য নিয়েছে 'র'। 'র' একটি জালের ন্যায় ভারতের বাহিরে সারা বিশ্বে বিস্তৃত। এখন এর নিয়মতান্ত্রিক এজেন্ট সংখ্যা

১২ হাজারেরও বেশী। 'র' এর কর্মপরিধি সকল মহাদেশেই বিস্তার লাভ করেছে। জন্ম থেকেই এর সবচেয়ে বড় টার্গেট পাকিস্তান। ভারতের ভিতরে বা বাইরে সংঘটিত যে কোন ঘটনাকে আই.এস.আই এর উপর চাপিয়ে দেয়া 'র' এর 'জন্মগত স্বভাব'। শুধু পাকিস্তানের উপর অভিযোগ করার জন্য কতগুলো ভয়ংকর পরিকল্পনা করেছে এই 'র'। পাকিস্তানের উপর সন্ত্রাসের অভিযোগ তোলার জন্য 'র' নিজ হাতে শিখ ও হিন্দুদেরকে হত্যা করেছে। জাহাজ লুণ্ঠন করে পাকিস্তানের উপর দায়ভার চাপিয়ে দিয়েছে। মনে হয় 'র' ও ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের মাঝে শাড়ি আচলের সম্পর্ক। কোন একটা ঘটনা ঘটলেই তদন্ত ব্যতীত পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আই.এস.আই এর উপর চাপিয়ে দেয়। সংবাদমাধ্যমগুলো ব্যাপকভাবে তা প্রচার করে। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলো কখনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রীর নোটিশ ছাড়া কোন পরিকল্পনা করতে পারেনা। এদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড প্রধানমন্ত্রীর সহ সকল মন্ত্রীদের নোটিশেই প্রস্তুত হয়। 'র' এর কর্মকাণ্ড থেকে ভারতের নেতাদের মানসিকতা বোঝা যায়। (সংক্ষেপে এখানে মুশরিকজাতির মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরা হল। জাতীগতভাবে তাদের মন অনেক ছোট। তারা কোনকিছুকে একটু বড় দেখলেই তাকে খোদা বলতে শুরু করে। একারনেই দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। মন-মানসিকতা সংকীর্ণ হওয়ায় আপন স্রষ্টাকেও ছোট মনে করে। মনে করে, এক স্রষ্টা বা স্রষ্টার একার পক্ষে এত কাজ করা কিভাবে সম্ভব! তাই স্রষ্টার সাথে শরীক করা তাদের স্বভাবজাত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অথচ তাদের ধর্মগ্রন্থেই এক আল্লাহর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। খৃষ্টানদের জাতিগত স্বভাব হল, এরা অতিবেশী সৌন্দর্য প্রিয়। তাই এরা নারী ব্যবহার করে শত্রুকে বাগে আনার চেষ্টা করে। ইহুদিদের জাতিগত স্বভাব হল এরা অতিবেশী অর্থলোভী জীবনের মায়া খুব বেশী। তাই অর্থের প্রলোভন অথবা প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে তারা শত্রুকে কাবু করতে চায়। আল্লাহ তায়ালা ওদের অন্তরে লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা এটে দিয়েছেন। যতই সম্পদশালী হোক না কেন অন্তরে অর্থের ক্ষুধা লেগেই থাকবে। আর মুসলমানের সত্ত্বাগত স্বভাব হল, তারা আখেরাতমুখি। আখেরাতমুখি নয় অথচ সে মুসলিম দাবি করে বুঝতে হবে তার মধ্যে ঘাটতি আছে। জন্ম থেকেই বাঘ। কাপুরুষতা থাকলে সে প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না।)

যদি 'র' এর গোপন ও প্রকাশ্য পলিসি সমূহকে বিশ্লেষণ করা হয় তবে আপনি একথা মানতে বাধ্য যে, ভারত 'নিরাপত্তার সাথে বাঁচ এবং বাঁচতে দাও' এই

পলিসির উপর আমল করে। কিন্তু চানক্যের ধোকা, প্রতারণা ও শত্রুভাবাপন্ন রাজনীতির দর্শন থেকে বের হতে চায় না। এই ঘৃণিত রাজনীতির মাধ্যমেই তারা আজ বছরকে বছর কাশ্মীরের জনগণের জীবন সংকীর্ণ করে রেখেছে।

ভারত ও 'র'এর মূলনীতি এবং পলিসি

- ❖ যদি কোন অফিসার অথবা অধিনস্থ 'র'এর উপরস্থ অফিসারের হুকুম না মানে তবে তাকে কাজের অনুপযুক্ত মনে করে হত্যা করে ফেলা হয়।
- ❖ 'র' দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের বাইরেও এজেন্টের মাধ্যমে কাজ করায়।
- ❖ যদি কোন এজেন্ট 'র' এর শৃঙ্খল থেকে বের হতে চেষ্টা করে তাকেও হত্যা করা হয়।
- ❖ শিখ সেনাদের আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য 'র' অনেক শিখকে হত্যা করেছে।
- ❖ 'র' শিখ স্টুডেন্ট ফেডারেশনের গুরুত্বপূর্ণ দুই কর্মকর্তাকেও হত্যা করেছে।
- ❖ দেশের ভিতরে ও বাইরে 'র' ঘৃণিত সব পন্থা অবলম্বন করে।
- ❖ ক্ষমতাসীন সরকার 'র'কে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করে।
- ❖ 'র' অন্যান্য এজেন্সি যেমন মোসাদ, কে.জি.বিকে সহায়তা প্রদান করে।
- ❖ অর্থনৈতিক বিষয়ে 'র' কে.জি.বি, মোসাদ, সি.আই.এ, ডি-১৬, বি.এন.ডি, এম-১৬ থেকে স্বাধীন।

চানক্যের কুটিলতা

কোন এক যুগে ভারতবর্ষে চন্দ্রগুপ্ত নামে এক বাদশাহ রাজত্ব করত। চানক্য নামক তার এক দরবারী পণ্ডিত ছিল যার সাথে মাঝে মাঝে সে পরামর্শ করত। একবার বাদশাহ দরবারী লোকদের সাথে শিকারে বের হল। রাত হয়ে গেলে এক জঙ্গলে অবস্থান করল। সিপাহী তাবু ও খাবার প্রস্তুতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে চানক্য এদিক ওদিক আসা যাওয়া করছিল। হঠাৎ গুলোর একটি কাটা তার শরীরে বিঁধল। কাটা বিধতেই চানক্য রাগান্বিত হয়ে গেল। চাকরকে বলল, দ্রুত এক গ্লাস শরবত নিয়ে আস। চাকর মনে করল কাঁটার কারনে হয়ত চানক্যের অনেক কষ্ট হয়েছে। তাই দ্রুত শরবতের পেয়ালা-হাতে উপস্থিত হল। চানক্য এক ঢোক শরবত পান করল। বাকিটা গুলোর গোড়ায় ঢেলে দিল। চাকর হাতজোড় করে অনুনয় করল- মহাশয়! শরবতে কোন ক্ষতিকর কিছু আছে কি? না আমার কোন ভুল হয়েছে যে, আপনি শরবত ফেলে দিলেন? চানক্য বলল-

এর উত্তর সকালে পাবে। দেখতে দেখতে হাজার হাজার কীট-পতঙ্গ এসে গুল্লের গোড়া খেয়ে ফেলল। সকাল বেলায় চন্দ্রগুপ্ত বলল- এখানে একটি গুল্লা ছিল, তা গেল কোথায়? চানক্য হাত বেধে উত্তর দিল-মহারাজ! সে আমার সাথে শত্রুতা করেছে। তাই আমি তার এমন ব্যবস্থা করেছি যে, তার চিহ্নও বাকী নেই। এরপর সে কিভাবে তা করেছে বিস্তারিত বলল। চন্দ্রগুপ্ত তার কৌশল শুনে যারপর নাই খুশি হলো এবং তাকে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত করল।

যেহেতু হিন্দু ধর্মে কোন সহীফা বা আসমানী কিতাব নেই তাই তারা চানক্যের বর্ণিত নির্দেশনার উপর আমল করে। চানক্য আপন রচিত গ্রন্থে অর্থশাস্ত্রে হিন্দুদের জন্য রাজনৈতিক দর্শন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছে। আজও ভারতে গোটা রাজনৈতিক কাঠামো যুদ্ধ বা নিরাপত্তা বিষয়ে তার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

চানক্যের রাজনৈতিক দর্শন মিকাওয়ালী সরকার থেকে ভিন্ন নয়। সেও অনুসারীদেরকে প্রতারণা, ধূর্তমী, ইতরতা, প্রতিশোধ প্রবণতা ও সকল ঘণিত মানসিকতায় গড়ে তুলতে চায়। তার রাজনৈতিক দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি হল-“কাজের ফলাফল কাজের পদ্ধতি ও উপকরণ অবলম্বনে বৈধতা দেয়। ভারত ও চানক্যের শত্রুভাবাপন্ন মানসিকতার আলোকে নিজেদের রাজনীতিকে ঢেলে সাজিয়েছে।”

“প্রতিবেশীকে শত্রু মনে কর” এটা চানক্যের শিক্ষা। পাকিস্তান ভারতের প্রতিবেশী। তাই চানক্যের কথামত পাকিস্তান কখনও ভারতের বন্ধু হওয়ার অবকাশ নেই।

চানক্যের মূলনীতির উপর আমল

ভারত সরকার ও তার সন্ত্রাসী সংগঠন ‘র’ চানক্যের মূলনীতির উপর আমল করে চলছে। তারা এসকল মূলনীতি চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চানক্য ওরফে কোটিল্য এর বই অর্থশাস্ত্র থেকে গ্রহন করেছে। চানক্য পরমর্শ দেয় -

১. প্রতিবেশীকে কিভাবে ধ্বংস করা যায়।
২. শত্রুর বিরুদ্ধে কিভাবে গোপন তৎপরতা চালানো যায়।
৩. প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে কিভাবে নস্যাত করা যায়। যাতে দেশটি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পর্যায়ক্রমে এমন বিপদগ্রস্থ হয় যে, আর মাথা উঁচিয়ে দাড়াতে না পারে।

৪. শত্রুকে কিভাবে ধোকা দিবে। শত্রুদেশে মিথ্যা সংবাদ রটাবে, সম্ভব হলে খাদ্যদ্রব্যে বিষ মিশ্রণ করবে।

এই মূলনীতির উপর চলতে পারলে রাজা যথার্থ রাজত্ব করতে পারবে। নতুবা তার রাজত্ব মজবুত হবে না। ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবে।

এই মূলনীতির আলোকে যদি ভারত সরকার ও 'র' এর কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করা হয় তবে তাদের ক্ষেত্রেই এগুলি পরিপূর্ণ ফিট হবে।

যে রাষ্ট্র এ সকল মূলনীতির প্রতি নজর দেবে তাদের সামনে ভারত সরকারের রাজনৈতিক পলিসি স্পষ্ট ফুটে উঠবে। এবং যদি উত্তম পরিকল্পনা করতে সক্ষম হয় তবে ভারত সরকারের দাতা ভাঙ্গা জবাব দিতে পারবে।

কদাকার কোটিল্য স্বীয় যামানায় বহুত বড় জ্ঞানী, বিদ্যান ও রাজনীতিবিদ ছিল। হিন্দুদের গ্রন্থ কদাম্বারে (QADAMBER) কোটিল্যের বই অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে লেখা আছে- কোটিল্যের বই অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা শিক্ষা দেয়। যা সরকারের মন্ত্রীদেবকে ধোকা, প্রতারণা ও অবৈধ সম্পদ উপার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করত হত্যা ও লুণ্ঠনের উপর আগ্রহী করে তোলে।

৫. 'র' এর রিপোর্টের ভিত্তিতে ইন্দিরা গান্ধী অমৃতসরের দরবার সাহেবের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে এবং আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক শিখদেরকে হত্যা করে।

৬. নিজেদের কাক্ষিত উদ্দেশ্য সাধনে নাটকের মধ্যে প্রকৃত রং দেয়ার জন্য নিজেদের লোককে হত্যা করা থেকেও বিরত থাকে না।

৭. 'র' এজেন্টদেরকে প্রতিপক্ষ ও শত্রুর মাঝেও প্রবেশ করায়। ইণ্ডিয়ান পার্লামেন্ট (লোকসভা) এর উপর হামলা, শ্রীনগর পার্লামেন্টে হামলা 'র' এর যোগসাজশেই হয়েছিল।

৮. 'র' আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় নিজেদের লোক নিয়োগ দিয়ে রেখেছে। তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর এজেন্সিগুলোকে সন্ত্রাসবাদ প্রশিক্ষণ ও অর্থনৈতিক সাপোর্ট প্রদান করে।

৯. প্রতিবছর ভারত থেকে কোটি কোটি রুপীর হেরোইন কালোবাজার হয়। যাতে ভারত সরকার জড়িত। এক্ষেত্রে 'র' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সারা বিশ্বে ভারত সরকারের দূতাবাস ও কনসুলিয়েট অফিসে 'র' এর এজেন্ট বিদ্যমান। 'র' বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশে নিজেদের কেন্দ্র খুলে নিয়েছে। এগুলোকে বিজনেস অর্গানাইজেশন, আইন অধিদপ্তর, কর্পোরেশনের নামের আড়ালে প্রতিষ্ঠা করেছে।

- পাকিস্তানের জন্য দুবাইতে ।
- উত্তর আমেরিকার জন্য নিউইয়র্কে
- মধ্য প্রাচ্যের জন্য রিয়াদে
- রাশিয়ার জন্য বুলগারিয়ায়
- পূর্ব ইউরোপের জন্য ভিয়েতনামে
- মধ্য পশ্চিম ইউরোপের জন্য রোমে
- চীনের জন্য হংকংয়ে ।

‘র’ বিদেশী এজেন্সীর সাথেও সম্পর্ক স্থাপন করে । আফগানিস্তানের এজেন্সির সাথেও ‘র’ এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে । মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোতে ‘র’ শক্ত অবস্থান নিয়েছে ।

এসআইএস/এমআইসিক্স SIS/MI6

ایم ای سکس / ایس ای ایس



**SECRET
INTELLIGENCE
SERVICE MI6**

লোগো



সদর দপ্তর

পূর্ণনামঃ

SECRET INELIGENCE SERVICE

المخابرات الحربية القسم السادس

প্রতিষ্ঠাঃ ১৯০৯

পূর্বসংস্থাঃ সিক্রেট সার্ভিস ব্যুরো

কর্মীঃ ৩২০০(২০১২-১৩)

বার্ষিক বাজেটঃ ২.৩ বিলিয়ন(২০১০-১১)

নীতি বাক্যঃ সর্বদা নিরাপত্তা

সংস্থাপ্রধানঃ আলেক্স ইয়ান্সার

ওয়েব সাইটঃ www.sis.gov.uk

এম.আই.সিক্রা M-I-6 ایم ای سکس

বৃটেনের গুজব রটানো সংস্থা (Office of special plans)

বৃটেনের (Office of special plans) গুজব রটানো সংস্থার দায়িত্ব হল, বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মিথ্যা প্রোপাগান্ডা করা, ভিত্তিহীন দাবী উত্থাপন করা, গুজব রটানো। উদ্দেশ্য থাকে, জনসাধারণ ও শত্রুর মাঝে হতাশা ও আতংক ছড়িয়ে দেয়া। ইরাকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে দেশটির বিরুদ্ধে যুদ্ধের পথ সুগম করতে সংস্থাটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। আজ সকলের নিকট স্পষ্ট যে, আমেরিকা, ব্রিটেন ও অন্যান্য সম্মিলিত বাহিনী ইসরাইলের সংরক্ষণ ও খনিজতেল আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা অভিযোগ তুলে ইরাক ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে, হাজারো নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করছে। লাখে মানুষকে ঘরছাড়া করছে। বিনা অপরাধে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের উপর ইতিহাসের সবথেকে নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা চালাচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানটি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সমস্তরাল প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে।

(SECRET INELIGENCE SERVICE) বৃটেনের গোয়েন্দা সংস্থা

পৃথিবীতে নানান ধরনের ফিল্ম তৈরী হয়। লক্ষ-কোটি মানুষ তা দেখেও থাকে। কিন্তু এর মধ্যে গোয়েন্দা ফিল্ম সবথেকে বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বিশেষভাবে আমেরিকান ও বৃটেনের ফিল্মগুলো অতুলনীয় হয়ে থাকে। এতে আশ্চর্য সব ঘটনা ও হঠাৎ সংঘটিত পরিস্থিতি দর্শককে হতবাক করে। ফিল্মের কাহিনী এভাবে রচনা করা হয় যে, যেন একটি গোয়েন্দা জাল বিস্তার লাভ করেছে। উক্ত জাল থেকে নিজেকে বের করে আনা ও শত্রুকে নিজের ফাঁদে ফেলে ফেলাই গোয়েন্দার দক্ষতার পরিচয় হয়ে থাকে। ফিল্মগুলো পৃথিবীর বিখ্যাত গোয়েন্দাদের কীর্তির আলোকে প্রস্তুত করা হয়। যখন কোন গোয়েন্দা সংস্থা বা গোপন সংগঠনের তথ্য ফাঁস হয়ে যায়, মিডিয়ায় চলে আসে, তখন লেখকদের হাতে এ বিষয়ে বিভিন্ন উপাদান একত্র হয়। সি.আই.এ, মোসাদ, কে.জি.বি, আই.এস.আই, 'র', ফ্রি মিশন, চীন, জাপান, ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশগুলোর গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পৃথিবী বিখ্যাত। এর মধ্যে বৃটেনের সিক্রেট এজেন্সি এস.আই.এস অন্যতম। যাকে সাধারণত এম.সিক্রা (M-I-6) বলে। এধরনের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির খবর অধিকাংশ সময়ই লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যায়। তবে রাষ্ট্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ার আশংকা থাকে। তথ্য অনুসন্ধান বা গোপন খবর জানতে মানুষ সর্বদাই আগ্রহী। যখন কোন গোপন

তথ্য ফাঁস হয়ে যায় তখন মানুষ আগ্রহের সাথে তা পড়তে চায়। প্রত্যেক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি কর্মচারী নিয়োগের সময় ভিন্ন মাপকাঠি নির্ধারণ করে। কোন পুরুষ বা নারী যদি উক্ত মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ না হয়, তবে তাকে ভর্তি করা হয় না।

বৃটেনের গোয়েন্দা সংস্থা এম. আই. সিক্র (M-I-6) জোয়ানদের দ্বারা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধিনে কাজ করায়। ইন্টারভিউ-এর জন্য কোন যুবকের ঘরে চিঠি পাঠিয়ে লেখা হয় নিম্নোক্ত কথাগুলো গোপন রাখবে। ইন্টারভিউ-এর সময় যথেষ্ট বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। স্নায়ু প্রতিরক্ষাকে লক্ষ্য রাখা হয়। সবকিছু ঠিক ঠাক মনে হলে যখন কোন এজেন্টকে ভর্তি করা হয় তাকে সরকারী গোপন তথ্য সম্বলিত এ্যাক্ট-এর কাগজপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়। প্রার্থী ফরম-ফাইল পড়ে জানতে পারে যে, তাকে সিক্রেট সার্ভিসেস কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে অথচ সে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরীর জন্য এসেছিল। এ সময় সিক্রেট সার্ভিসেসের কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য করে যে, প্রার্থীর যখন একথা জানা হয়েছে তখন তার আত্মিক অবস্থা ও অনুভূতি কি হয়? ইন্টারভিউ এর মধ্যে ইহাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফাইলের মধ্যে বিভিন্ন তথ্য ও দিক-নির্দেশনা থাকে। সাথে সাথে এ কথাও থাকে যে, কোন অফিসারকে হত্যা করার অনুমতি নেই।

এরপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাকে বিভিন্ন লেকচারের মাধ্যমে স্বীয় দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়। কিভাবে বহিঃরাষ্ট্রের মিশন চলাকালে দূতাবাসের সহায়তা নিতে হয় তাও শিক্ষা দেয়া হয়।

ভর্তির পরে যখন প্রার্থীর কাছে চিঠি প্রেরণ করা হয় তখন তাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দস্তখত থাকে। তাকে জানানো হয়, এস.আই.এস. (SISBY) এ উজ্জল ভবিষ্যত চায় এমন প্রত্যেকেরই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। পরীক্ষা চলাকালীন লাগাতার দুই দিন প্রার্থীকে বিশেষ ইন্টেলিজেন্স ইন্টারভিউ ও প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হতে হয়। পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হয়। প্রার্থী এই রহস্যময় পৃথিবীতে আপন জিন্দেগী কাটাতে পারবে কি পারবে না?

পরীক্ষক ভালভাবেই বুঝে নেয় যে, প্রার্থীর মাঝে, গোয়েন্দা হওয়া যোগ্যতা আছে কি নেই। উল্লেখ্য যে, বৃটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্তব্যরত সকল কর্মকর্তাকেই (SISBY) এর পরীক্ষায় পাশ করতে হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতির জন্য এমনটি করা অত্যন্ত জরুরী। পরীক্ষায় কেউ বিফল হলে ফোনে জানিয়ে দেওয়া হয়।

এম. আই. সিক্রা ও এনথ্রাক্স এর প্রস্তুতি

এনথ্রাক্স এর প্রস্তুতি

১৯৪০ এর দশকে বৃটেন নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থা এম.আই.সিক্রা এর মাধ্যমে কতিপয় বিজ্ঞানীকে ইরাকে প্রেরণ করে। তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত রাসায়নিক অস্ত্রের তুলনায় আরও মারাত্মক অস্ত্র আবিষ্কার করে। জীবাণু যুদ্ধের জন্য ইরাকে আমেরিকার এক পরীক্ষাগার থেকে মূল উপাদান ইরাকের গোপন ফ্যাক্টরীতে সরবরাহ করা হত। যা মেরীল্যাণ্ডে অবস্থিত। উপাদানকে ইরাকী ফ্যাক্টরীতে আরও ডেভোলপ করা হত। এনথ্রাক্স ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক জীবাণু রোগের বিস্তার ঘটানোর জন্য আমেরিকা ইরাককে জীবাণু ক্রয় ও সংগ্রহ করার অনুমতি দিয়ে রেখেছিল।

আমেরিকা ও বৃটেন ইরাককে রাসায়নিক জীবাণু প্রস্তুত করতে এজন্য সহায়তা করত যে, ইরাক-ইরান যুদ্ধের হোতা তারাই ছিল।

এছাড়া সর্বপ্রকার অস্ত্রও সরবরাহ করত। লক্ষ-কোটি ডলার ও পাউণ্ড অর্থ সহায়তা দিত। ইরানও ইরাকের কঠোর মোকাবেলা করে। ১৯৮৩ পর্যন্ত প্রতিরোধ করে চলে। ইতোমধ্যে ইরাক জীবাণু অস্ত্র ব্যবহারে সক্ষমতা অর্জন করে ফেলে।

যে কোন মূল্যে আমেরিকা ও বৃটেন ইরানের বিরুদ্ধে ইরাকের বিজয়ের আশা পোষণ করত। যুদ্ধে ইরাক রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার শুরু করে দেয়। আট বছর দীর্ঘ এই যুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্রে ৫ লাখ ইরানী সৈন্যের মৃত্যু ঘটে। অবশেষে ইরাক বিজয়ী হয়। কিন্তু বিশ্ববাসী দেখেছে যে, উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমেরিকা ও বৃটেন এবং অন্যান্য সম্মিলিত বাহিনী জাতিসংঘের মাধ্যমে ইরাককে রাসায়নিক ও এটমী শক্তি থেকে শূন্য করার জন্য অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী মারফত সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। যাতে ইরাক ইসরাইলের জন্য হুমকী না হয়ে দাড়ায়।

ব্লাকওয়াটার **BLACKWATER** بليك واتر

ব্লাক ওয়াটার একটি প্রাইভেট মিলিটারী। এয়ারক প্রিন্স এবং আলকুর্ক ১৯৯৭ সালে ইহা প্রতিষ্ঠা করে। আমেরিকার অঙ্গরাজ্য দক্ষিণ কেরোলিনাতে এর বিশটি ক্যাম্প রয়েছে। এয়ারক প্রিন্স একজন সাবেক নেভী সীল (Navy Seal) ছিল। রিপাবলিকান পার্টির অন্যতম অর্থ সহায়ক ও এয়ারক প্রিন্স ব্লাক ওয়াটারের প্রথম চীফ অব অপারেভিং অফিসার। ২০০৯ সালের মার্চ মাসে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নেন। কিন্তু চেয়ারম্যান পদকে সামলে রাখেন।

২০০৭ সালের অক্টোবর মাসে এর নাম 'ব্লাক ওয়াটার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড' রাখা হয়। ২০০৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী পুণরায় নাম পরিবর্তন করে XE রাখা হয়। দ্বিতীয়বার নাম পরিবর্তন করার কারণ হল-ইরাকে ব্লাক ওয়াটারের অপকর্মের কারণে অনেক দুর্নাম রটে এবং খোদ আমেরিকান আদালতে এর বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা দায়ের করা হয়। XE (জি) এর প্রধান গিরী জ্যাকসনও সাবেক নেভি ছিল। ভাইস চেয়ারম্যান কোফারব্লাক সি.আই.এ কাউন্টার টেররিস্ট সেন্টারের ডাইরেক্টর হিসাবে থেকে যায়।

XE জি. এর দাবী, তারা বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রাইভেট সেনাবাহিনী। প্রতিবছর ৪০০০ সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এটা আমেরিকার তিনটি বড় কন্ট্রাক্টরের মধ্যে সব থেকে বড়। এতদিন তারা আমেরিকান সরকারের পক্ষ থেকে শত কোটি ডলার আয় করেছে। ব্লাক ওয়াটার প্রতিটি গার্ড বাবদ ১২২২ ডলার গ্রহণ করে। যা আমেরিকান সেনাদের তুলনায় ৬ গুন বেশী। এর ট্রেনিং সেন্টার উত্তর কেরোলিনার -উত্তর পূর্ব অংশে ৭০০০ একর জায়গায় অবস্থিত। যার পরিমাণ ২৪বর্গ কিলোমিটার। এখন একে ইউনাইটেড স্টেট ট্রেনিং সেন্টার (USTC) বলে। আমেরিকা কর্তৃক আফগানিস্তান দখলের পরে ২০০২ সালে ব্লাক ওয়াটার সিকিউরিটি কনসালটেন্ট BSC প্রতিষ্ঠা করা হয়। BSC প্রাইভেট সে সকল ৬০ টি প্রাইভেট কোম্পানীর ভিতর সব থেকে বড় যেগুলো ইরাকে সিকিউরিটি সেবা প্রদান করে।

এরা ইরাকে সরকারী অফিস ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহ নতুন পুলিশ ও আর্মির প্রশিক্ষণ প্রদান করে। দখলদারী বাহিনীর সহায়তাও প্রদান করে। জি (XE) উচ্চ পদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা দেয়।

জি (XE) ইরাকে মুজাহিদ্দীনদেরকে খতম করার জন্য যে আগ্রহ নিয়ে এসেছিল তাতে মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মুজাহিদ্দীন তাদেরকে অসংখ্যবার পরাস্ত করেছেন। ২০০৪ সালের ৩১ মার্চ ব্লাক ওয়াটারের চার সদস্যকে মুজাহিদ্দীন গ্রেফতার করে তাদের লাশ সেতুর উপর ঝুলিয়ে রাখে। ২০০৫ সালের এপ্রিলে মুজাহিদ্দীনে কেরাম ব্লাক ওয়াটারের একটি হেলিকপ্টার ভূপাতিত করে ৬ সদস্যকে জাহান্নামে পাঠায়। এর মধ্যে তিন বুলগেরিয়ান ও দুই ফিজী সৈন্য ছিল। ওরা বেসামরিক লোক হত্যার মাধ্যমে ব্লাক ওয়াটারের প্রতিশোধ নিয়েছিল।

২০০৯ সালের আগস্ট মাসে আমেরিকার ভার্জিনিয়ার এক আদালতে ব্লাক ওয়াটারের চেয়ারম্যান এয়ারক প্রিন্স এর বিরুদ্ধে হত্যা, অস্ত্র কালোবাজারী প্রতিপক্ষকে জবাই ও শিরচ্ছেদ করাসহ নানান অভিযোগ দায়ের করা হয়। ব্লাক ওয়াটারের বিরুদ্ধে ইরাক থেকে ভয়ংকর অপরাধীদেরকে তাড়ানোর অভিযোগও রয়েছে। এয়ারক প্রিন্স এর বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ হল, সে ব্লাক ওয়াটার সদস্যদেরকে ইরাকী শিশু অপহরণ করে বিক্রি করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। যৌন কলঙ্কারী তে কোন শেষ নেই। এসকল অভিযোগ ব্লাক ওয়াটারের উচপদস্থ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে উত্থাপিত হয়েছে। ব্লাক ওয়াটারের এক লেখক জিরিমাঈ সাখিলও লিখেছেন, এয়ারক প্রিন্সের উপর অভিযোগ রয়েছে, সে সকল প্রাক্তন কর্মকর্তাদের হত্যা পরিকল্পনা করে রেখেছিল যারা ফেডারেল ইনভেস্টিগেটসকে সহায়তা করত। অর্থাৎ আমেরিকার ভিতর ব্লাক ওয়াটারের বিরুদ্ধে তদন্ত করার কোন সুযোগ নেই।

ক্যাথলিক মিলিটারী অর্ডার মাল্টা এর সাথে ব্লাক ওয়াটারের সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়। স্মরণ রাখা উচিত, মিলিটারী অর্ডার অব মাল্টা ক্রুসেডীয় যুদ্ধের সময় গঠিত একটি সাম্প্রদায়িক সামরিক সংস্থা। ১০৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে এর প্রতিষ্ঠা, খৃষ্টানরা মিসরের শাসকের নিকট একটি চার্চ, পাদ্রীদের জন্য একটি খানকা ও একটি হাসপাতাল বানানোর অনুমতি প্রার্থনা করে। যাতে জেরুসালেমে আগত পর্যটকদের তারা সেবা করতে পারে। ১১১৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পোপ প্লানকে পোক্ত করে দেয়। অর্ডার-এর গোপন উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল, সে সব এলাকার সামরিক সংরক্ষন যা ক্রুসেডাররা মুসলমানদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। সংস্থাটির পৃষ্ঠপোষকদের জন্য আবশ্যিক ছিল তারা খৃষ্ট জগতকে সংরক্ষন করবে।

১২৯১ সালে খৃষ্টানদের সর্বশেষ ঘাটি যখন হাতছাড়া হয়ে গেল তখন অর্ডার প্রথম কুবরুস পরে ১৩১০ সালে রেহোডাস দ্বীপে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে একটি শক্তিশালী নৌ সেনা গঠন করে। তারা খৃষ্টান জগতের জন্য অসাধারণ যুদ্ধ পরিচালনা করে। কিন্তু ১৫১৩ সালে সুলাইমানের সামনে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। ১৫৩০ সাল পর্যন্ত অর্ডারের সমর্থকেরা ক্ষমতা বিচ্যুত থাকে। ১৫৩০ সালে পোপ ক্রিমেন্ট VII এর পৃষ্ঠপোষকতায় শাহেনশাহ চার্লস পঞ্চম মাল্টা দ্বীপকে অর্ডারের কাছে উপটৌকন স্বরূপ প্রদান করে। এ সময় থেকেই সংস্থাটি অর্ডার অব মাল্টা নামে পরিচিত লাভ করে। এদের একটি মূলনীতি হল, সংস্থাটি খৃষ্টানদের আপষের মাঝে যুদ্ধে কোন তৎপরতা দেখবে না। ১৭৯৮ সালে রোমে হেডকোয়ার্টার প্রতিষ্ঠান করে। বর্তমানে মাল্টা সরকারের সাথে এক

চুক্তিতে অর্ডার ফোর্ট সিনেট ইঞ্জিলো ৯৯ বছর মেয়াদে লাভ করেছে। অর্ডারের ইংরেজী পূর্ণ নাম Sovereign Military Hospitaller Order of Jerusalem Of And Of Malta Rhodes অর্ডারের বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার উদ্দেশ্য হল, পাঠক যেন বুঝতে পারে ব্লাক ওয়াটারের উদ্দেশ্য কি? ব্লাক ওয়াটারের সম্পর্ক অর্ডার অব মাল্টার সাথে। যা একটি খৃষ্টান সেনা প্রতিষ্ঠান থেকে খৃষ্টান মিলিশিয়াও বলে। এরা অন্যান্য লাভজনক পরিকল্পনা নিয়েও কাজ করে যাতে আপন লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়।

ভার্জিনিয়া আদালতে ব্লাক ওয়াটারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সমূহের মধ্যে ব্লাক ওয়াটারের সাথে এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্রও রয়েছে। সে আমেরিকান মেরিনেও কাজ করেছে। এয়ারক প্রিন্সের ব্যাপারে তার বক্তব্য হল-

“সে নিজেকে এমন খ্রিস্টিয়ান ক্রসেডর মনে করে যে, মুসলমান ও ইসলামী চেতনাকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিষিদ্ধ করেছে। “মিস্টার প্রিন্স জেনে বুঝেই ইরাকে সে সকল লোক পাঠিয়েছে যারা খ্রিস্টিয়ান সুপারমেন্সী বিশ্বাসে ঐক্যমত পোষণ করে। যাদের ব্যাপারে সে জানত, এরা ইরাকী জনগনকে হত্যা করার সুযোগ হাতছাড়া করবে না। এ সকল লোক Call signs based on the Knights of the Templar ব্যবহার করেছে।

জেরিমী স্কাহিল (Jeremy Scahill) স্বীয় গ্রন্থে ব্লাক ওয়াটার সম্পর্ক লেখেন-

ব্লাক ওয়াটারের কমান্ড খ্রিস্টিয়ান এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করে থাকে। যাকে কটরপন্থী ধর্মীয় জেনেভা গঠন করেছে। জেরেমীর ধারণানুযায়ী এয়ারক প্রিন্স রয়েট উইং ক্যাথলিক গ্রুপের সাথে সম্পর্ক রাখে। আমেরিকান পররাষ্ট্র নীতিতে ব্লাক ওয়াটারের অবদান অনস্বীকার্য।

পাকিস্তানের ব্লাক ওয়াটার

আমেরিকান সরকারের তত্ত্বাবধানে কর্মরত সবথেকে বড় আমেরিকান সন্ত্রাসী সংস্থা ব্লাক ওয়াটার ইরাকের পর এখন পাকিস্তানেও আগুন ও রক্তের খেলা শুরু করে দিয়েছে। পেশাওয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত এমন কোন শহর নেই যা ব্লাক ওয়াটারের কাল থাবা থেকে রক্ষা পেয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্য হল- পাকিস্তানে ব্লাক ওয়াটারের কোন অস্তিত্ব নেই। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে তবে আমি দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দেব। নিম্নে পাকিস্তানী সংবাদ মাধ্যমে ও পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু রিপোর্ট উল্লেখ করা হল। যার দ্বারা পাঠক বুঝতে পারবেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্য কতটুকু সঠিক।

২০০৯ সালের ১৫ই আগস্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আব্দুল বাসেত করাচীর প্রেস ক্লাবে বলেন-ইসলামাবাদে আমেরিকান মিশনে সহায়তা করার জন্য ১০০০ আমেরিকান (ব্লাকওয়াটার) সৈন্য আসবে।

২০ আগস্ট নিউইয়র্ক টাইমস্ লেখে-আমেরিকান সিকিউরিটি কোম্পানি ব্লাক ওয়াটার পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২৪ শে আগস্ট বেসরকারী এক টিভি চ্যানেলে বিশ্লেষক শিরী মাযারী বলেন, ব্লাক ওয়াটার চার্টার্ড ফ্লাইটে পাকিস্তানে আসে। এক চ্যানেলে পেশাওয়ারের সংবাদ বিশ্লেষক আকীল ইউসুফ জাই বলেন, প্রথমে পেশাওয়ারে ব্লাক ওয়াটারের অফিস হায়াদারাবাদে ছিল। পরবর্তীতে প্রিন্স কন্টিনেন্টাল হোটেলের তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু হোটেলের উপর হামলার পর সেখান থেকেও চলে গেছে। এখন তাদের অফিস ইউনিভার্সিটি টাউনে। এখন পেশাওয়ারে ১৮ ও তাবরীলাতে ৪০ জন সদস্য বিদ্যমান।

কফকজ সেন্টার যা গোয়েন্দা সংস্থা সমূহকে কাজের মনিটরিং রিপোর্টও প্রদান করে। রিপোর্টে দুবাই ও আমেরিকান সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানায়-সি.আই.এ এর সাবেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা স্টিভেন কেশ পেশাওয়ারে আমেরিকান টেররিস্ট ইউনিট ব্লাক ওয়াটারের ইনচার্জ। ব্লাক ওয়াটারের সুপার ওয়াইজ টিমে জেমস বিল ভেলিম কপার, স্টুকেশ, রডারিক, ক্যাবাস্টোফার এবং আলিশ ক্যাম্বেলও রয়েছে।

পাকিস্তানী গভর্নেন্ট অফিসার্স ও রিটার্ড আর্মি অফিসারদেরকে কাজের ধরণ অনুযায়ী দৈনিক ২০০০ ডলার প্রদান করা হয়। সাংবাদিকদের মাধ্যমে পাকিস্তানী জনমত তালেবানের বিরুদ্ধে চালানোর জন্য তৎপরতা চালানো হয়। সাংবাদিকদেরকে তালেবানের বিরুদ্ধে মিথ্যা ঘটনা বানিয়ে প্রচার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রতিটি মিথ্যা ঘটনা এক হাজার ডলারে বিক্রি হয়। পেশাওয়ার মার্কেট ও শপিং এলাকাগুলোতে ধামাকায় ব্লাক ওয়াটারের সংযুক্ত ছিল কিন্তু ডলারের বিনিময়ে তার দায়ভার তালেবানের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়।

৪ঠা নভেম্বর নাওয়ায়ে ওয়াক্ত পত্রিকায় প্রথম পাতায় খবর প্রকাশিত হয়-পি.আই.এ-এর ফ্লাইটে ব্লাক ওয়াটারের ২০২ সদস্য ইসলামাবাদে এসে পৌঁছেছে। এবং তাদেরকে রাষ্ট্রীয় কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। ২৪শে নভেম্বরের খবর ছিল ব্লাক ওয়াটারকে আটককারী পুলিশ অফিসার ইসলামাবাদে হত্যা করা হয়েছে।

২রা ডিসেম্বর দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্ত এর প্রথম পাতায় প্রকাশিত সংবাদ - ২,৭৬,০০০ ডলার গ্রহন করে নিষিদ্ধ ব্রাণ্ডের ১৩৮ লাইসেন্স ইন্টাররিসককে

প্রদান করা হয়েছে। ইন্টাররিসক ব্লাক ওয়াটারের সদস্য ভর্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে। অবসর প্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আলী জা'ফর জায়দী ইন্টাররিসকের সত্ত্বাধিকারী ছিল। ১৯ সেপ্টেম্বর যখন ইসলামাবাদে পুলিশ ইন্টাররিসকের অফিসে তল্লাশি চালায় তখন বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করে। ক্যাপ্টেন জায়দী আর্মি থেকে বিশেষ করে SSG এস.এস.জি এর অবসর প্রাপ্ত ২০০ এর অধিক সদস্যকে ব্লাক ওয়াটারে ভর্তি করেছিল। ইন্টাররিসক এর উপর এখন নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। হারেস এন্টারপ্রাইজের সাথে নতুন চুক্তি হয়েছে। তারা ইসলামাবাদের চক শাহজাদ এলাকার অজপাড়া গ্রামে নিজেদের ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছে।

৪ঠা ডিসেম্বর দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্ত ও ১০ই ডিসেম্বর দৈনিক জং আমেরিকান পত্রিকা ভেন্টফায়ার এর সূত্রে তথ্য প্রকাশ করে- ব্লাক ওয়াটারের চীফ এক্সিকিউটিভ এয়ারক প্রিন্স যে মিস্টার ফ্যাক্স এ্যাট নামে প্রসিদ্ধ বলেছে, তার কোম্পানী ও আ: কাদির খানকে নজরদারী করার আগে হত্যার মিশনে নেমেছিল।

ম্যাগাজিন রিপোর্ট অনুযায়ী ড. আ: কাদির খান তাদের হিট লিস্টে ছিল। সি.আই.এ ব্লাক ওয়াটারকে তিন ধরনের দায়িত্ব দিয়েছিল।

১. উসামা বিন লাদিন ও আল কায়দার অন্যান্য নেতাদেরকে খুঁজে বের করা।

২. আটক করা

৩. হত্যা করা

এদের মধ্যে ড. আ: কাদির খান এর আটকাদেশও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ড. আ: কাদির খান এখনও ব্লাক ওয়াটারের হিট লিস্টে রয়েছেন। তথ্য মতে, ব্লাক ওয়াটারের সদস্যরা ড. আ: কাদির খানের বাসার পাশ্ববর্তী ঘর ভাড়া নিয়েছে। ১৪ই ডিসেম্বর আজাদী কোর্টে রাওয়ালপিণ্ডি বেঞ্চের প্রমাণপত্র দাখিল করতে গিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওকীল আহমার বেলাল সূফী বলেন, ড. আ: কাদির খান ব্লাক ওয়াটারের হিট লিস্টে রয়েছেন। তার নিরাপত্তাহীনতা চরমে পৌঁছেছে।

৫ ডিসেম্বর দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্তের প্রথম পাতায় খবর প্রকাশিত হয়-সাহালা পুলিশ স্টেশনে আমেরিকান সৈন্যদের উপস্থিতি নিরাপত্তার জন্য চরম হুমকি। সাহালা কলেজের বড় একটি অংশ আমেরিকানদের দখলে। সেখানে অনেক বড় বড় গুদাম রয়েছে যা চেক করার শক্তি কারো নেই। ইসলামাবাদ পুলিশ বারবার বলেছে যে, ক্যাম্পটিকে অন্য কোথায় স্থানান্তারিত করা হোক। ১১ ডিসেম্বর একই পত্রিকায় বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। যাতে বলা হয়েছে-সাহালাতে

আমেরিকানদের ক্যাম্প ও তাতে বিদ্যমান বিস্ফোরক-দ্রব্য এটমি প্লান্টের জন্য চরম ঝুঁকি পূর্ণ।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়- বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলো স্থানীয় লোকদেরকে নিজেদের এজেন্ট বানিয়ে চলছে। আরও জানা যায়, সাহালা এলাকায় আমেরিকানরা অত্যাধুনিক গোপন ও সুক্ষ্ম প্রযুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তানের পরমানু স্থাপনা গুলোকে মনিটরিং করে। সে সময় আমেরিকান সংবাদপত্র নিউইয়র্ক টাইমস এক রিপোর্টে প্রকাশ করে- সি. আই.এর ও ব্লাক ওয়াটারের মাঝে সম্পর্ক রয়েছে এবং ব্লাক ওয়াটার স্পর্শকাতর গোপন বিষয়ে কাজ করছে।

২১ ডিসেম্বর দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াজের প্রথম পাতায় প্রকাশিত খবর হল- ডি.এস.বি জামিন হাসেমী এস পি বোনা তাহের আইয়ুবকে এক রিপোর্টে বলেন- সাহালা পুলিশ কলেজে আমেরিকান ক্যাম্প নিরাপত্তার জন্য চরম হুমকি। এজন্য একে অন্য কোথাও স্থানান্তর করা হোক।

সাবেক আর্মি চীফ মির্জা আসলাম বেগ কয়েকবার স্বীয় বক্তব্যে বলেছেন- রফীক হারীরির ন্যায় বেনজীর ভূট্টোকেও ব্লাক ওয়াটার হত্যা করেছে। ১৮ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের মানবাধিকার সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি আমেরিকান মিলিটারী কন্ট্রাস্ট (ব্লাক ওয়াটার এর মধ্যে সব থেকে বড় কম্পানী) কোম্পানীগুলোর ভিসা বাতিল করে দেশ থেকে বের করে দেয়ার সুপারিশ করে। কমিটিতে বলা হয়- ব্লাক ওয়াটার সন্তান সুলভ আযাদীতে কাজ করছে যার কারনে পরিস্থিতি নাজুক থেকে নজুকতর হচ্ছে।

জাভেদ হাশেমী বলেন- তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী পাকিস্তানের ব্লাক ওয়াটারের কর্মতৎপরতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ২৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন এক কর্মকর্তা একথা স্বীকার করে। আমেরিকান পত্রিকা ন্যাশন খবর প্রকাশ করেছে যে, পাকিস্তানে ব্লাক ওয়াটার আস্তানা গেড়ে নিয়েছে এবং করাচীতে অভিযান পরিচালনা করছে। সমুদ্রবর্তী শহর করাচী ব্লাক ওয়াটারের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন বীচ যা মূলত বাগরাম এয়ারবীচ থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এক রিপোর্ট অনুযায়ী করাচীতে আমেরিকান কনস্যুলেট অফিসে মার্কিন স্পেশাল ও ব্লাক ওয়াটারের যৌথ দপ্তর রয়েছে। সংবাদ পত্রে এসেছে- পাকিস্তানের ৩৯তম পুলিশ সদস্য পালিয়ে ব্লাক ওয়াটারে ভর্তি হয়েছে। এরা পুলিশের উচ পদস্থ কর্মকর্তাদের থেকে গোপনতথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

সাপ্তাহিক এশিয়া (সংখ্যা ১১-১৬ ডিসেম্বর) নিজস্ব এক প্রতিবেদনে লিখেছে- সিন্ধের অভ্যন্তরে বিদেশীদের গোপন তৎপরতা ভয়ংকরভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৭ অক্টোবর পোর্ট কাসেম থেকে ৯টি ট্রলারে ঘোটকি গেছে ৮ অক্টোবর ২০ টি

টলার হালা'র দিকে গেছে। বিদেশীরা চালচলনে পুরো স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং তাদের বড় একটি অংশ সশস্ত্র থাকে। তথ্য মতে বন্দর এলাকায় স্থানীয়দের নামে ব্লাক ওয়াটারের জন্য ২০০ একর জমি সংগ্রহ করা হয়েছে।

ফ্রাইডে স্পেশাল (সংখ্যা ১১-১৭ ডিসেম্বর) এর রিপোর্ট অনুযায়ী ইসলামাবাদ ও পেশাওয়ারে ব্লাক ওয়াটারের ৭০০ সদস্য বিদ্যমান। যাদের জন্য ২০০ এর অধিক ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে। করাচীর বিভিন্ন এলাকায় ৫০০ এর অধিক মার্কিন বসবাস রয়েছে এবং সেখানে ব্লাক ওয়াটারের সব থেকে বড় অফিস রয়েছে। নেদায়ে মিল্লাতের রিপোর্ট অনুযায়ী (সংখ্যা ৩-৯ ডিসেম্বর) ইসলামাবাদ ও পেশাওয়ারে ব্লাক ওয়াটারের এক হাজারের অধিক সদস্য রয়েছে যাদের বেতন মার্কিন সৈন্যদের থেকেও বেশী।

একজন কর্মকর্তা বার্ষিক ৪ লাখ ডলার বেতন লাভ করে।

১৩ ডিসেম্বর দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্তের এক রিপোর্ট মোতাবেক বিগত কয়েকমাস আগত মার্কিন সেনারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে ভয়ংকর তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে। মিডিয়ার তথ্য মতে এতদিনে হাজারের অধিক মার্কিন পাকিস্তানে প্রবেশ করে গোটা দেশে ছড়িয়ে গেছে। প্রাথমিক দিকে তারা শুধু ইসলামাবাদে আস্তানা গাড়ে এবং সেখানে ঘর ভাড়া নেয়া শুরু করে। পরবর্তীতে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। মিডিয়ার বক্তব্য হল, লাহোরে ৩০০ এর অধিক মার্কিন গোপন তৎপরতায় সক্রিয় রয়েছে। তারা ডিফেন্স হাউজিং স্কিম ও মালরোডে অবস্থিত যামান পার্ক ও শহরের অভিজাত এলাকাগুলোতে ঘর ভাড়া নিয়ে রেখেছে। অধিকাংশ রাতেই এসব এলাকার মেশিনগুলো উক্ত ঘরসমূহ থেকে গোপনতথ্য আদান প্রদানের বিষয় অনুভব করে।

মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তা বা ব্লাক ওয়াটারের সদস্যরা পাকিস্তানের শহর সমূহে পাকিস্তানি আইন কানুনকে কিভাবে টুকরা টুকরা করছে সে বিষয়ে কিছু তথ্য লক্ষ করুন।

একবার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রসহ ৪ মার্কিনের একটি কালো কাচের জীপ ইসলামাবাদের এক রোডে থামানো হয়। তারা নিজেদেরকে ব্লাক ওয়াটারের সদস্য বলে পরিচয় দেয়। যখন তাদেরকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন মার্কিন দূতাবাস থেকে থানায় লোক পৌঁছে যায়। যার সাথে সেনাবাহিনীর এক ক্যাপ্টেন ও পুলিশের এক এস.পি.ও ছিল। এরা পুলিশদের ধমকি দিয়ে তাদের নিয়ে চলে যায়।

(ফ্রাইডে স্পেশাল-১১-১৭ ডিসেম্বর)

৪ ডিসেম্বর লাহোর শের পাওপলের নিকটে সন্দেহভাজন গাড়ী থেকে মার্কিন ব্লাক ওয়াটারের চার সদস্যকে অত্যাধুনিক অস্ত্রসহ আটক করা হয়। পুলিশ তল্লাশি চালাতে চাইলে তারা অস্বীকৃতি জানায়। পুলিশ গোয়েন্দা তলব করে। মডেল টাউনে কেন্দ্র এর এস.পি.ও উপস্থিত হয়। দেড় ঘণ্টা যাবত জিজ্ঞাসাবাদ চলে। কিন্তু ব্লাক ওয়াটারের সদস্যরা গাড়ী থেকে নামেওনি। তল্লাশিও চালাতে দেয়নি। এরপর মার্কিন কনসুলেটের একটি গাড়ী এসে তাদের সাথে করে নিয়ে যায়। (নাওয়ায়ে ওয়াক্ত-৯ ডিসেম্বর)

১২ ডিসেম্বর দৈনিক জং এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১১ ডিসেম্বর লাহোরে শের পাওপলে কালো গ্রাসের একটি আমেরিকান গাড়ী থামিয়ে দেয়া হয়। তাতে আরোহী এক মার্কিন নারী ভিডিও ফিল্ম বানাতে ছিল। তাতে আরো ৪জন সদস্য ছিল। গাড়ীর নাম্বার প্লেট ছিল জাল। রেজিট্রেশন কাগজপত্রও ছিল না। উক্ত গাড়ীটিকেও মামলা না করে ছেড়ে দেয়া হয়।

১২ ডিসেম্বর এজার্টিন রোডে পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা একটি সন্দেহভাজন গাড়ী থামায়। গাড়ীর ভেতর থেকে আরোহীগন পুলিশকে হুমকি-ধমকি দিতে থাকে। যদি তাদেরকে যেতে দেয়া না হয় অথবা জোর পূর্বক তল্লাশি চালানো হয় তবে গুলি করব, বলতে থাকে। আমরা মার্কিন নাগরিক। বিশ্বের কোন আইন আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়, বলতে থাকে। আধা ঘণ্টা জেরা করার পর পুলিশ হার মানতে বাধ্য হয়। গাড়ীর প্লেট নাম্বার উল্টো লাগানো ছিল। শের পাওপলেও কালো গ্রাসের গাড়ী থামালে মার্কিনরা এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরী করে এবং পুলিশ তল্লাশি না করেই ছেড়ে দেয়। (নাওয়ায়ে ওয়াক্ত জং-১৩ ডিসেম্বর)

১৬ ডিসেম্বর এজার্টিন রোডে কালো গ্রাসের গাড়ী থামালে আরোহী নারী সহ ৪ মার্কিন পুলিশের সাথে অসৌজন্য মূলক আচরন করে। গালি গালাজ করে। এই গাড়ীটিও তল্লাশি ছাড়া চলে যায়। (নাওয়ায়ে ওয়াক্ত-১৭ ডিসেম্বর)

২৪ ডিসেম্বর শের পাওপলে পুলিশ ল্যাণ্ডক্রুজার গাড়ী থামিয়ে তল্লাশি নিতে চাইলে মার্কিনরা অস্বীকৃতি জানায় এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ফোনের কারণে বারবারের মতই ছেড়ে দেয়।

এ সকল রিপোর্টের ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি হল- দূতাবাস কর্মকর্তাদের এরূপ কর্মকাণ্ড করার অধিকার জেনেভা কনভেনশনের আওতায় সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু আইন বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য হল, কোন দূতাবাসের জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আইন নিজেদের হাতে নেয়ার কোন অধিকার নেই। ৯/১১ এর ইউটানের পরে যখন ক্ষমতাসীনরা দেশটিকে মার্কিনীদের চারণভূমিতে পরিণত করে তখন থেকে মার্কিনীদের যা ইচ্ছা তাই করছে। 'গোলামদের' তাতে বাধা দেয়ার কোন

অধিকার নেই। গোলামদের ভাগ্যে শুধু ধমকি ও গালি গালাজই জোটে। আর আমেরিকা তাই দিচ্ছে।

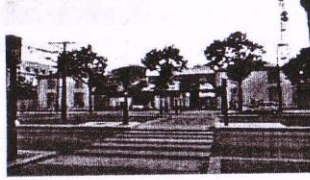
ইরাকে ব্লাক ওয়াটারের কর্মকাণ্ড ও উপরোক্ত তথ্যগুলো জানার পর কারো কি এ কথা অস্পষ্ট যে, পাকিস্তানে পাবলিক স্টেশনে ধামাকায় ব্লাক ওয়াটারই জড়িত। তারা ইরাকের জনসাধারণকে মুজাহিদ্দীনদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। শিআ-সুন্নি বিভেদ বাড়িয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানেও ব্লাক ওয়াটারের একই উদ্দেশ্য। সোয়াতে এক পীরকে হত্যা, লাশ, ঝুলিয়ে দেয়া, পেশাওয়ারে এক কবরস্থানকে টার্গেট করার পরে ফিরক্বা পূজারীদেরকে মুজাহিদ্দের বিরুদ্ধে সক্রিয় করে তুলেছে।

যদি পাকিস্তান বাঁচাতে চাও তবে ডলার পূজারীদেরকে আরব সাগরে ডুবিয়ে মার পরিস্থিতির উপর যদি একবার সুক্ষ্ম দৃষ্টি দেয়া হয়। তবে দেখা যাবে, যখনই পাকিস্তানের জনমত মুজাহিদ্দীনদের পক্ষে যেতে শুরু করে, মিডিয়াতে প্রচার হতে থাকে তখনই পাবলিক স্টেশনগুলোতে ধামাকা শুরু হয়ে যায়। ফিরক্বা পূজারী, ডলারের দাস, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও তার গোলামরা কালক্ষেপন না করেই অভিযোগ তালেবানের উপর চাপিয়ে দেয়। আল-কায়দা ও তালেবান নিয়মতান্ত্রিকভাবে পাবলিক স্টেশনে হামলা করা থেকে বারবারই অস্বীকৃতি জানিয়েছে। কিন্তু ডলার পূজারী, ফেরক্বা পুরুষত মিডিয়া কখনও তা গ্রাহ্য করে না। বরং দাবী করে, কাজটি তালেবানই করেছে। তালেবানের আমীর মোল্লা মুহাম্মাদ উমর মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, নিরস্ত্র লোকদেরকে টার্গেট বানাবে না। আর কোন তালেবানের পক্ষ থেকে একথা অমান্য করার কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং তালেবানের নামে যারা ধামাকা দিয়ে চলছে তারা ব্লাক ওয়াটারের এজেন্ট অথবা পাকিস্তানে তৎপর মার্কিন গোয়েন্দা, তালেবান নয়। কখনই তালেবান নয়। ধোকাবাজ মিডিয়ার যাদুময়ী অপপ্রচার থেকে বাইরে এসে প্রত্যেকটি নাগরিকের জানা উচিত- তালেবান ইসলাম সম্পর্কে সম্যক অবগত। অনৈসলামী অমানবিক কোন কর্মকাণ্ড তারা করে না। যা কিছু শোনা যায় তা আমেরিকা ও তার থেকে ডলার সংগ্রহকারীদের কাজ। ডলার পূজারীগণ পাকিস্তানকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে ঠেকিয়েছে। পাকিস্তানকে রক্ষা করতেই হয় তবে ডলার পূজারীদেরকে আরব সাগরে ডুবিয়ে মারতে হবে। (বাংলাদেশেও বিদেশীদের তৎপরতা সচেতন ব্যক্তিদেরকে ভাবিয়ে তোলে।)

ডাইরেকশন জেনারেল ডিলা সিক্রেতে এক্সটেরিয়র, ফ্রান্স



লোগো



সদরদপ্তর

পূর্ণ নামঃ

Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE)

(General Directorate of External Security)

গঠন: ২ এপ্রিল ১৯৮২।

পূর্বের সংস্থা: দ্য ইডিসিই এস

সদর দপ্তর: ১৪১ বুলভার্ড মট্যেয়ার, ২০তম প্যারিস, ফ্রান্স

জবাবদাহিতা: প্রতিরক্ষামন্ত্রী

সংস্থা প্রধান: এরাড কবিন হি ম্যাগাউকা

সহকারী সংস্থা: ডি সি আর আই

যোগাযোগ: www.defense.gov.fr/english/dgse

মূল দায়িত্ব: বৈদেশিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স পরিচালনা, বন্ধু ভাবাপন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, কাউন্টার টেররিজম, ক্লাউস্টাইন অপারেশন, নিজস্ব লোক সংগ্রহ ও নেটওয়ার্ক তৈরী, আভ্যন্তরিন সকল গোয়েন্দা সংস্থা নিয়ন্ত্রণ।

নামকরা এজেন্ট: মার্ক ওব্রেইরে, ডেনিস অ্যালেক্সা, হার্ভ হাউবার্ট, পেরি মার্টিনেট, জেরার্ড রয়েল। প্রধান বিচরন এলাকা। আফ্রিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ, পূর্ব এশিয়া।

বি এন ডি BND



Bundesnachrichtendienst



লোগো

সদরদপ্তর ১

সদরদপ্তর ২

পূর্ণনামঃ

Bundesnachrichtendienst (BND) (Federal Intelligence Service)

دائرة الاستخبارات الاتحادية

বুন্ডেসনাচরিস্টেন্স

প্রতিষ্ঠাঃ ১ এপ্রিল ১৯৫৬

কর্মীঃ ৬৫০০(২০১২)

সদর দপ্তরঃ /// ও বার্লিনে (২০১৪) শুরু হয়েছে।

বার্ষিক বাজেটঃ ৬১৫.৬ মিলিয়ন(২০১৫)

সংস্থাপ্রধানঃ রাষ্ট্রপতি

জবাবদিহিতা: জার্মান চ্যান্সেলর

ওয়েব সাইটঃ www.bnd.de

মূল দায়িত্বঃ বৈদেশিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স পরিচালনা, কাউন্টার টেররিজম, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নজরদারি, অবৈধ ভাবে প্রযুক্তি আদান প্রদানে বাধাদান, ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার, সামরিক তথ্য সংগ্রহ চাইল্ড আমস ড্রাগস ট্রাফিকিং বন্ধ করা।

ডি.জি.এফ.আই, বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা



লোগো



পতাকা

পূর্ণনামঃ

Directorate General of Forces Intelligence (DGFI) -

ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স

প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৭৭

কর্মীঃ ১২০০০ আনুমানিক

বার্ষিক বাজেটঃ গোপনীয়

সদর দপ্তরঃ ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা

নীতি বাক্যঃ watch and listen for the nation to protect
national security

সংস্থা প্রধানঃ মেজর জেনারেল এম.ডি আকবার হোসেন

অভিভাবক সংস্থাঃ বাংলাদেশ সরকার

ডি.জি.এফ.আই হল বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা। এন এস আই ও স্পেশাল ব্রাঞ্চেজের সাথে এই সংস্থা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা কার্যক্রম চালাতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ইতিহাস

১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ প্রেসিডেন্ট লে. জেনারেল জিয়াউর রহমান ডি. জি. এফ. আই প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এই সংস্থার নাম ডিরেক্টর অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স

(ডিএফআই) থাকলেও পরবর্তীতে পরিবর্তন করে ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স ডি.জি.এফ. আই) করা হয়। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ক্যাপ্টেন কে এম আমিনুল ইসলাম খান ছিলেন ডি.জি.এফ.আই এর প্রথম ডিরেক্টর বা পরিচালক।

১৯৯৪ সালের ৮ই মার্চ সংস্থার নতুন অগ্রানোগ্রাম করা হয়।

কাঠামো: নিজস্ব অবকাঠামোতে সংস্থাটি গঠিত হয়েছে। মহাপরিচালক হিসেবে রয়েছেন একজন মেজর জেনারেল। তিনি ৭ জন পরিচালক নিয়ে সংস্থা পরিচালনা করেন। তারা প্রত্যেকেই ব্রিগিডিয়ার জেনারেল কিংবা সমপদের অধিকারী হয়ে থাকেন।

প্রধান কার্যালয়:

ডি জি এফ আই এর প্রধান কার্যালয় ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত। ট্রেনিং:

ডি.জি.এফ.আই এর কর্মকর্তাগণ মূলত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর তিন শাখা আর্মি, বিমান ও নৌ বাহিনী থেকে বাচাইকৃত। তারা নিজেরাই স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে ট্রেনিং করে থাকে। তবে সি.আই.এ, এম.আই.সিক্স, নিউজিল্যান্ডের জি.সি.এস.বি, ভারতের র" এবং আই.এস.আই-এর সাথেও এর সম্পর্ক রয়েছে। কুমিল্লা,কক্সবাজার ও সিলেটে এর প্রশিক্ষণ ক্যাম্প অবস্থিত।

এন.এস.আই, বাংলাদেশ জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা



লোগো

পূর্ণনামঃ

National Security Intelligence (NSI) -

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা

প্রতিষ্ঠাঃ ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭২

কর্মীঃ গোপনীয়

বার্ষিক বাজেটঃ গোপনীয়

সদর দপ্তরঃ ঢাকা, বাংলাদেশ

নীতি বাক্যঃ জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য দেখা ও শুনা

সংস্থাপ্রধানঃ মেজর জেনারেল শামসুল হক

অভিভাবক সংস্থাঃ স্বাধীন

এন এস আই ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স-জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা ।

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা National Security Intelligence সংক্ষেপে এন এস আই (NSI) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা । এই সংস্থার প্রধান কার্যালয় ঢাকাতে অবস্থিত । এন.এস.আই বাংলাদেশের অভ্যন্তরিন নিরাপত্তা, কাউন্টার টেররিজম, প্রতি গোয়েন্দাবৃত্তি ও বৈদেশিক গোয়েন্দাবৃত্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান সংস্থা । এন.এস.আই এর পাশাপাশি বাংলাদেশে আরো কয়েকটি ছোট পরিসরে এবং সল্প ক্ষমতার গোয়েন্দা সংস্থা রয়েছে । যেমন, ডি জি এফ আই.(DGFI), বাংলাদেশের পুলিশের বিশেষ শাখা এস.বি (SB),সি আই ডি (CID), পি বি আই (PBI), র‍্যাব (RAB) ইত্যাদি ।

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা NSI স্বাধীন এবং বিশ্ব মানের গোয়েন্দা সংস্থা.

হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং এর কর্মপরিধিও ব্যাপক। বিশ্ব জুড়ে ১৯ দেশে ৩৭টি শাখা অফিসের মাধ্যমে বৈদেশিক গোয়েন্দাবৃত্তির মাধ্যমে দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করনের কার্যক্রম চলছে। এছাড়া খুব দ্রুতই অন্যান্য দেশে এর অফিস স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা এবং কিছু কিছু উপজেলায় কার্যালয় বা অফিস স্থাপনের মাধ্যমে দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করনের কার্যক্রম চলছে। এ কার্যালয় সমূহের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য যুগ্ম পরিচালক (উপসচিব/ উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব) সহকারী পরিচালক-সহকারী সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ নিয়োজিত আছেন।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়, সর্বোচ্চ এবং একমাত্র স্বাধীন গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করনে এই সংস্থার প্রধান কাজ হল, দেশি বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা, বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠি, পলিটিক্যাল পার্টি, ধর্মীয়, সামাজিক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠি এবং সন্ত্রাসী সংগঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক গোয়েন্দা প্রতিবেদন তৈরী এবং সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ প্রদান ও দেশের জন্য প্রতি গোয়েন্দা Counter Intelligence against foreign Intelligence agencies কার্যক্রম গ্রহণ করা।

এন.এস.আই সরাসরি বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। তাই অন্য কোন সরকারী সংস্থা এর কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এর কার্যক্রম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারনে সরকার বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক দিকনির্দেশনা পেয়ে তার সাফল্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই তার নেতৃত্বে এন.এস.আই গঠিত হয়।

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের অধিন একটি অধিদপ্তর হলেও এ সংস্থার মহাপরিচালক Director General (DG) এর পদমর্যাদা বাংলাদেশ সরকারের সচিব সমমান।

মহাপরিচালক এন.এস.আই প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মেজিস্ট্রেসী ক্ষমতাসহ গ্রেফতারী (পুলিশ) ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তিনি এ ক্ষমতা লিখিত আদেশের মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রদান করতে পারেন।

এন.এস.আই প্রায় পুরিপুরি সিভিলিয়ান জনবলের মাধ্যমে গঠিত। কিছু কিছু পদে সল্প সময়ের জন্য কিছু দক্ষ জনবল ডেপুটেশনের মাধ্যমে এ সংস্থায় পদায়ন করা হয়ে থাকে।

সাংগঠনিক কাঠামো:

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দার সাংগঠনিক কাঠামো ব্যাপক ও বিশাল। বর্তমানে সংস্থাটি আটটি উইং বা স্তরের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

- **বহিঃ উইং Directorate of External**

বৈদেশিক গোয়েন্দাবৃত্তি এবং প্রতি-গোয়েন্দাবৃত্তি কার্যক্রম।

- **সীমান্ত উইং Directorate of Border**

বাংলাদেশের সীমান্ত ভিত্তিক গোয়েন্দাবৃত্তি এবং প্রতি-গোয়েন্দা কার্যক্রম।

- **অভ্যঃ উইং Directorate of Internal**

বাংলাদেশের ভিতরে গোয়েন্দাবৃত্তি এবং প্রতি-গোয়েন্দাবৃত্তি কার্যক্রম। দেশের আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দার সবচেয়ে বড় ও বিস্তৃত উইং এটি। এর কার্যপরিধি ব্যাপক ও বিশাল।

- **নিরাপত্তা উইং Directorate of Security**

বাংলাদেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সরকার ঘোষিত ভি.ভি.আই.পি-দের নিরাপত্তা প্রদান।

- **প্রশাসন উইং Directorate of Administration**

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দার জনগণ ব্যবস্থাপনা এবং গোয়েন্দাবৃত্তি কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান।

- **প্রশিক্ষণ উইং Directorate of Training**

জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দার জনবলের সঠিক প্রশিক্ষণ প্রদান, মানোন্নয়ন এবং সরকারী বিভিন্ন সংস্থাকে গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করন।

- **নগর অভ্যঃ উইং Directorate of City Internal**

বাংলাদেশের মহানগরসমূহে গোয়েন্দাবৃত্তি ও প্রতি গোয়েন্দা কার্যক্রম। আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

- **কাউন্টার টেরোরিজম উইং Directorate of Counter Terrorism**

টেরোরিস্টদের কার্যক্রম প্রতিরোধের মাধ্যমে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা।

ইসলাম ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ❖ ১৭৬

বিভিন্ন উইংয়ের অধিনে আবার একাধিক শাখা রয়েছে। তারা বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের সাথে জড়িত যেমন, টেকনিক্যাল শাখা সকল ধরনের প্রযুক্তিগত সাপোর্ট প্রদান করে থাকে এবং প্রশাসন শাখা সকল ধরনের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করে থাকে।

পদক্রমঃ

মহাপরিচালক (DG)(সচিব সমমান)
পরিচালক(অতিরিক্ত সচিব)
অতিরিক্ত পরিচালক(ADD)(যুগ্ম সচিব)
যুগ্ম পরিচালক(JD)(উপসচিব)
উপপরিচালক(DD)(সিনিয়র সহকারী সচিব)
সহকারী পরিচালক(AD)(প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার)
ফিল্ড অফিসার (FO)(দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার)
জুনিয়র ফিল্ড অফিসার JFO
ওয়াচার কনস্টেবল WC
আর্মড কনস্টেবল AC
অন্যান্য কর্মকর্তা

প্রশিক্ষণঃ

এন.এস.আই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিশেষ বাহিনী সহযোগীতায় নিজস্ব ট্রেনিং একাডেমির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থা সি. আই. ব্রিটেনের এম.আই.সিক্স এর মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এন.এস.আই এর অফিসার/কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

গোয়েন্দা নজরদারিতে আপনিও



আপনি জানেনকি, নিজের অজান্তেই আপনি গোয়েন্দা নজরদারিতে রয়েছেন। সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোনটি আপনার ওপর গোয়েন্দাগিরি করছে। আপনি যেখানে যাচ্ছেন আপনার সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোনটি সংশ্লিষ্ট কোম্পানির নেটওয়ার্কের আওতায় থাকে। ওই এলাকায় অবস্থানকালে আপনি কার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, কী বিষয়ে কথা বললেন, কত সময় কথা বললেন সব কিছুই সংশ্লিষ্ট মোবাইল কোম্পানির কাছে সংরক্ষিত থাকে। তাই মোবাইল ফোন ব্যবহারে আপনাকে সচেতন হতে হবে। মোবাইল ফোনে এমন কোন কথা বলা উচিত নয়, যার জন্য আপনাকে আইনি ঝামেলায় পড়তে হয়।

ধরুন, আপনি এখন রাজধানীর মতিঝিল এলাকায় শাপলা চত্বরে অবস্থান করছেন। এ সময় ঘনিষ্ঠ বন্ধু দুষ্টমি করে বললেন, বন্ধু, একজনকে মারতে এখানে এসেছি। ঠিক তার কিছুক্ষণ পর সেখানে দুর্বৃত্তদের হাতে একজন প্রাণ হারালেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা প্রকৃত অপরাধীদের হাতেনাতে ধরতে পারলেন না। তখন তারা ঘটনার সময় ওই স্থানে অবস্থান করা ব্যক্তিদের মোবাইল ফোন নম্বর সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ফোন কোম্পানির কাছে আবেদন করলো। ঘটনাস্থলের কাছাকাছি মোবাইল ফোন টাওয়ারের অধীনে থাকা ওই সময়ের ভয়েস কল যাচাই-বাছাই করবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আর এই কল যাচাইয়ে বিপদে পড়ে যেতে পারেন আপনি। কোন অপরাধ না করলেও বন্ধুর কাছে দুষ্টমি করে বলা কথাটার কারণেই আপনি আইনি ঝামেলায় পড়তে পারেন।

বর্তমান সময়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন না এমন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। আর মোবাইল ফোন একদিকে মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ করে দিয়েছে, অন্যদিকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে মানুষ বিভিন্ন অপরাধ করছে। মোবাইল ফোনে অপরাধ করার পর সেই সিমটি ফেলে দেওয়া হচ্ছে বা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে অপরাধীদের ধরতে আইনশৃঙ্খলা

রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বেগ পেতে হচ্ছে। তারপরও পার পাচ্ছে না অপরাধীরা। মোবাইল ফোন ট্রাক করে তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। মোবাইল ফোনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপরাধী শনাক্ত করা এখন খুব কঠিন কাজ নয়। যে এলাকায় অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে নির্ধারিত সে এলাকায় মোবাইল টাওয়ারের মাধ্যমেই ঘটনা সংগ্রহ করে তাদের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করা হয়। এসব নম্বর থেকে সন্দেহভাজন মোবাইল নম্বরগুলো চিহ্নিত করে চলে তদন্তের কাজ।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজধানীতে ঘটে যাওয়া চাঞ্চল্যকর প্রায় সব ক'টি ঘটনারই কু উদ্ঘাটন হয়েছে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে। এর মধ্যে মোবাইল ফোন অন্যতম। খুন, ডাকাতি, অপহরণ, ছিনতাই, চুরিসহ গুরতর ও শনাক্ত ক্ষেত্রে তদন্তকাজে প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। এ সব মামলার আসামিদের গ্রেফতার ও শনাক্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে মোবাইল ফোন ট্রাকার। সন্দেহভাজন আসামি ও তার ঘনিষ্ঠজনদের মোবাইল ফোন শনাক্ত করার পর কথোপকথন রেকর্ড করা হয়। তদন্তের এক পর্যায়ে সন্দেহ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হলে ওই সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়ে থাকে। কেউ মোবাইল ফোন থেকে সিম পরিবর্তন করলেও ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট (আই এম ই আই) নাম্বার দিয়ে সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করা সম্ভব। দীর্ঘদিন সন্দেহভাজন মোবাইল ফোনটি ব্যবহার বন্ধ থাকলে অপরাধীকে খুঁজে পেতে সময়ের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তির নিকটাত্মীয় কিংবা বন্ধুদের মোবাইল ফোনের ওপর নজরদারী চলে। দীর্ঘদিন পরে হলেও সন্দেহভাজন ব্যক্তি নিকটাত্মীয় কিংবা বন্ধুদের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা মাত্রই তাকে শনাক্ত করা হয়। এরপরই চলে সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তির অবস্থান শনাক্ত করার কাজ। ভাইবার, লাইন, স্কাইপসহ মোবাইল ফোনের অ্যাপস আর নির্বাঞ্ছাট, নিরুপদ্রব নেই। ইন্টারনেট ফোন ছাড়াও রেজিস্ট্রেশনবিহীন মোবাইল ফোন গ্রহকদের কথোপকথনও রেকর্ড করা হচ্ছে নিয়ামিতভাবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পুরো টেলিকম সেক্টরেই এখন গোয়েন্দাদের পদচারণা। এতদিন ধারণা ছিল, টেলিফোন গ্রাহকের ভয়েস ও ডাটা রেকর্ড করা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ইন্টারনেট ফোনের কথোপকথনও সহজেই রেকর্ড করে নিচ্ছেন গোয়েন্দারা।

আই.আর.ও. আই.আই.এম

(ইরানের গোয়েন্দা সংস্থা)



وزارت اطلاعات
جمهوری اسلامی ایران

পূর্ণনামঃ Ministry Of Intelligence (MOIS)

وزارة الاستخبارات و الامن الوطني الايراني

প্রতিষ্ঠাঃ ২৯ আগস্ট

পূর্বসংস্থাঃ প্রাইম মিনিষ্টারী ইন্টেলিজেন্স অফিস

কর্মীঃ ৩০,০০০ প্রায়

বার্ষিক বাজেটঃ

নীতি বাক্যঃ

সংস্থাপ্রধানঃ আহমদ আলাবী

ওয়েব সাইটঃ [www.http://iivaja.ir/public/home](http://www.iivaja.ir/public/home)

মিনিস্ট্রি অব ইন্টেলিজেন্স অ্যাণ্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি (ইরান)

মধ্য প্রাচ্যের প্রায় প্রতিটি দেশেই প্রকাশ্য অথবা গোপন কাজ করে মিনিস্ট্রি অব ইন্টেলিজেন্স অ্যাণ্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি। ১৯৮৪ সালের ১৮ আগস্ট এই সংস্থাটির জন্ম হলেও এর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল আরো আগেই। মূলত সংস্থাটির বর্তমান নাম ধারণ করার আগের নাম ছিল সাভামা, শাহের শাসনামলে যদিও এই সংস্থার নাম ছিল সাভাক। অনেক ছোট খাটোর গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বয়ে তৈরী করা হয়েছিল। এই সাভাককে যদিও ইরানী বিপ্লব পরবর্তী সময়ে প্রতিটি স্তরই ঢেলে সাজানো হয় তবে এ সংস্থাকে পুরানো আদলেই রাখা হয়। তবে এর ক্ষমতা কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। মূলত পৃথক পৃথক পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনে চলে সংস্থাটি। তবে সংস্থাটি ‘মূল’ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন দেশটির প্রধান ধর্মগুরু ও রাষ্ট্র প্রধান। ইরাকের বার্তা পাঠির অভ্যন্তরে বামপন্থী শক্তি হিসেবে গোপনে কাজ করত সংস্থাটি। শুধু তাই নয়- সিরিয়া, লেবানন, তুরস্ক, মিসর, সহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশেই সংস্থাটির কাজ আছে। ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে প্রায় দুই মাসের ব্যবধানে ইরানে তিনজন ভিন্ন মতালম্বী লেখককে হত্যা করা হয়। কিন্তু কারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা

প্রথম দিকে জানা যায়নি। তবে অনেক অনুসন্ধান ও আন্তর্জাতিক চাপে শেষমেষ স্বাধীন তদন্ত কমিশন করতে রাজি হয় ইরান। সেই তদন্তে বের আসে মিনিস্ট্রি অব ইন্টেলিজেন্স অ্যাণ্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটির নাম। তদন্ত কর্মকর্তা সায়্যিদ ইনআমি প্রকাশ করে দেন, লেখক হত্যাকাণ্ড সংস্থাটির জোগসাজশেই হয়েছে। যদিও পরবর্তী সময়ে সায়্যিদ ইনামিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কারাগারে মৃত অবস্থায় তাকে পাওয়া যায়। ১২ জন সদস্যকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। অবশ্য মাত্র দু'বছর পরই ইরানের সুপ্রিম কোর্ট অভিযুক্তদের মুক্ত করে দেন। বিপ্লবের পর দেশের অভ্যন্তরে বহিঃদেশের গোয়েন্দা কার্যক্রম, ভিন্ন মতালম্বী ব্যক্তি ও পার্টির সন্ধান ঘড়যন্ত্র উদঘাটন করতেই সংস্থাটি বেশী তৎপর। তবে সংস্থাটির চিরশত্রু হিসেবে বিবেচিত হয় মুজাহিদ্দীনে খালক নামের সশস্ত্র সংগঠনটি, ইরান তার গোয়েন্দা সংস্থাকে দিয়ে বহুবার এই সংগঠনকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য অভিযান চালিয়েছে। কিন্তু কোনবারই পুরোপুরি ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। ধারণা করা যায়, মুজাহিদ্দীনে খালক নামক সংস্থাটির পিছনে মদদ দাতা হিসেবে কাজ করে মিনিস্ট্রি অব ইন্টেলিজেন্স অ্যাণ্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটিই।

মধ্যপ্রাচ্যের 'বিষফোড়া' যদি হয় ইসরাইল তবে ইরান হল 'কুড়িফোড়া'। এদুটো দেশ ইসলামের বিরোধীতায় সমান্তরালে কাজ করে। শিয়ারা লালিত পালিত হয়েছে ইহুদির কোলে। এরা আলী রা. কে নবী মানে। এমনকি কেউ কেউ প্রভু হিসেবে বিশ্বাস করে। বর্তমান কুরআনকে তারা অসম্পূর্ণ মনে করে। তাদের বিশ্বাস হল কুরআন মোট নব্বই পারা। এই একটা কারনই তাদের কাফের হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এছাড়া তারা হযরত আয়েশা রা. কে ব্যাভিচারী বলে। নাউয়ুবিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা হযরত আয়েশা রা. এর পবিত্রতা সম্বলিত দশ-দশটি আয়াত সূরা নূরের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। অথচ তারা তাকে গালাগাল করতে একটুও পিছুপা হয়না। হযরত আবু বকর ও উমার রা. কে কাফের বলে। এধরনের নানানসব উদ্ভট কুফুরি বিশ্বাস রয়েছে তাদের। এরা মুসলিম জাতির ঘরের শত্রু। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে ইরান এতটা তৎপর যতটা কোন কাফের রাষ্ট্রের প্রতিও নয়। সিরিয়ার খিনযির বাশ্শার আলআসাদ নুসাইরি শিয়া একত্ববাদী মুসলিম জনগনকে কীভাবে মারছে তা সকলের নিকট স্পষ্ট। আর এর আধ্যাত্মিক ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক হল ইরান। এক রিপোর্ট অনুযায়ী, আসাদবাহিনী লা ইলাহা ইল্লা বাশ্শার না বলার কারনে যুবকদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করেছে। তার জুলুমের আলোচনা কোন স্বাভাবিক হৃদয়ের মানুষ বর্ণনা করতে পারেনা। লা'নাতুল্লাহি আলাইহি।

দ্বিতীয় পর্ব

শরয়ী দৃষ্টি ভঙ্গি:

পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। তেমনি গোয়েন্দা-বৃত্তি সম্পর্কেও ইসলামের দিক নির্দেশনা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে প্রতিটি কাজের দু'টি দিক থাকে। সেহেতু গোয়েন্দাবৃত্তিরও দুটি দিক রয়েছে। একটি ভাল, আরেকটি মন্দ। একটি জায়েয। অন্যটি নাজায়েয। ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় কোন ব্যক্তিকে বা গোষ্ঠিকে খুঁজে বের করা, ইসলামী রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে অথবা নাগরিকদের নিরাপত্তা হুমকিতে পড়ে এমন কর্ম সম্পাদনকারীদেরকে অনুসন্ধান করে তাদের অশুভ পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করা, তাদের হীন চক্রান্ত সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করা নিঃসন্দেহে জায়েয এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তামূলক কাজ করা এক প্রকার জিহাদও বটে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের স্বাভাবিক জীবনাচারের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান, মানুষের এমন ভেদ খুঁজে বের করা করা যাতে রাষ্ট্রের কোন সমস্যা নেই অথবা কোন মানুষের অধিকার নষ্ট করা হচ্ছে না এবং বাস্তব অবস্থাকে গোলমাল করে বর্ণনা করা এগুলি নাজায়েয।

গোয়েন্দা বৃত্তির নাজায়েয দিক

সর্বপ্রথম আমরা নাজায়েয হওয়ার দিককে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করব।

মুসলমানদের জীবনাচারের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করা, বাস্তব অবস্থাকে গোলমাল করে বর্ণনা করাকে শরীয়তে গোনাহে কবীরা সাব্যস্ত করেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

অনুবাদ: হে মুমিনগণ! অনেক রকম অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কোন কোন অনুমান গোনাহ। তোমরা কারও গোপন ক্রটির অনুসন্ধান পড়বে না এবং একে অন্যের গীবত করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত বক্ষণ করাকে পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণা করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।

(সূরা হুজরাত ১২)

মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- অন্যের ত্রুটি, দুর্বলতা ও গোপনভেদ জানার চেষ্টা করবে না, তবে প্রয়োজনে কারো কথা শোনা, ঘুমের ভান করে অন্যের আলাপ শুনে নেওয়া সবই গোয়েন্দাবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। যদি কারো ক্ষতির আশংকা হয় কিংবা কোন মুসলমানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় হয় তবে তার ক্ষতিকর চক্রান্ত ও পরিকল্পনাকে গোপনভাবে জেনে নেয় বৈধ।

হযরত বারা'ইবনে আযেব রা. বর্ণনা করেন-

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ فِي بُيُوتِهِنَّ ، أَوْ قَالَ فِي خُدُورِهِنَّ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي حَوْفِ بَيْتِهِ .

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ আমাদের উদ্দেশে খুৎবা দিলেন। এমনটি মহিলাদেরকে পর্দার ভিতরে শুনিতে দিলেন। তিনি উচ্চস্বরে এরশাদ করেন- হে ঐ সকল লোক যারা মুখে ঈমান এনেছ, অন্তর পর্যন্ত ঈমান পৌঁছেনি-তোমরা মুসলমানদের গীবত করবে না। তাদের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবে না। (মনোযোগ দিয়ে শোন) যে স্বীয় ভাইয়ের দোষ-ত্রুটির পিছে পড়বে আল্লাহ তায়ালা তার পিছে পড়বে। আর আল্লাহ তায়ালা যার পিছে পড়বে তাকে তার ঘরের ভিতরেই লাঞ্চিত করবেন।

এই হাদীস থেকে জানা যায়-মুনাফিকরা মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি তালাশ করত। মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাবৃত্তি করত এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালা কুরআনের কারীমে বর্ণনা করেছেন। মোনাফেকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করে কাফেরদের নিকট তথ্য পৌঁছাতো।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٤٧)

অনুবাদ: যদি তোমাদের সাথে তারা যুদ্ধে বের হত তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করত না, আর অশ্ব ছুটাতো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য।

আর তোমাদের মধ্যে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। বস্তুত আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে ভালভাবেই জানেন।

(সূরা তাওবা: ৪৭)

রাসূল ^{সাদ্বাহ্বাহু} ^{আলাইহিস} ^{সালাম} এরশাদ করেন-

من استمع إلى حديث قوم وهم يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة

অনুবাদ: কেয়ামতের দিন যে কোন মুসলিমদের গোপন কথা শুনে নেয় অথচ তারা তা অপছন্দ করে তার কানে সীসা ঢেলে দেয়া হবে।

(সুনানে তিরমিজী, কিতাবুল লিবাস ১/৩০১)

আজকাল কতক লোক এমন দেখা যায় যারা নিজেদের ধারণায় কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করে। কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাবৃত্তি করে। একে সাওয়াবের কাজ মনে করে। অথচ এটা মুনাফিকদের কাজ ছিল। মুসলমানদের এই নিকৃষ্টতম কাজ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। যাতে তাদের অজ্ঞতাবশত কবীরা গোনাহের কারনে আমল বরবাদ না হয়।

গোয়েন্দাবৃত্তির জায়েয দিক

শত্রুর অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্যে সচেতন ও চৌকান্য থাকা, তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের প্রতিরোধের জন্য গোয়েন্দা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা জায়েয। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীসটি লক্ষ্য করুন-

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ

অনুবাদ: হজরত জাবের বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাহ্বাহু} ^{আলাইহিস} ^{সালাম} গয়ওয়ায়ে আহযাবের দিন এরশাদ করেন- কে আমার নিকট শত্রুর খবরাখবর নিয়ে আসবে? হজরত যুবায়ের বললেন-আমি। রাসূলে আরাবি ^{সাদ্বাহ্বাহু} ^{আলাইহিস} ^{সালাম} বললেন- কে আমার নিকট শত্রুর খবরাখবর নিয়ে আসবে? হজরত যুবায়ের বললেন-আমি। রাসূল ^{সাদ্বাহ্বাহু} ^{আলাইহিস} ^{সালাম} পূনরায় বললেন- কে আমার নিকট শত্রুর খবরাখবর নিয়ে আসবে? হজরত যুবায়ের বললেন-আমি। নবীজী ^{সাদ্বাহ্বাহু} ^{আলাইহিস} ^{সালাম} বললেন- প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী থাকে। আমার হওয়ারী-যুবায়ের ইবনুল আওয়াম। (সহীহ বুখারী, বাবু ফাযলুত্ ত্বালিয়াহ হাদিস নং-২৮৪৭) (হাওয়ারী অর্থ বিশেষ সহায়ক।)

বুখারী শরীফের এক বর্ণনা থেকে জানা যায়-রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাহ্বাহু} ^{আলাইহিস} ^{সালাম} যুদ্ধের বিষয়ে “তাওরীয়া” করতেন। অর্থাৎ যুদ্ধের পরিকল্পনা স্পষ্ট শব্দে বলা থেকে একাধিক

অর্থবোধক শব্দে বলতেন, যাতে বিষয়টি গোপন থাকে। বিশেষ করে মক্কা বিজয় অভিযানে বিষয়টি অত্যন্ত কঠোরভাবে গোপন রাখেন। যখন এক সাহাবী থেকে সামান্য ভুল হয়ে গেল, তিনি মক্কাবাসীদেরকে অভিযান সম্পর্কে অবগত করার চেষ্টা করলেন তখনই নবীজী তা বানচাল করে দেন। এই বৃহৎপ্রস্তুতিকে তিনি এত বেশী গোপন রেখেছিলেন যে, মক্কার মুশরিকরা জাররে আরান নামক স্থানে পৌঁছার পর জানতে পারে। যখন তাদের কোন উপায় ছিল না। সবথেকে বড় ফায়েদা হয়েছিল-রক্তপাতহীনভাবে মক্কা মুকাররমা বিজিত হয়। দু'এক জায়গা অবশ্য মোকাবেলা করতে হয়েছে। এটা অনেক বড় যুদ্ধ কৌশল ছিল। রাসূল ই'লায়ে কালিমা তুল্লাহ-আল্লাহর দ্বীনের বুলন্দির জন্য সর্বদা শত্রু সম্পর্কে সজাগ থাকতেন। শত্রুর প্রত্যেকটি তৎপরতার প্রতি কড়া নজর রাখতেন। তিনি জানতেন-শত্রু সর্বদা ওৎপেতে আছে। সেহেতু নবীজী যুদ্ধ পরিকল্পনা ও শত্রুর উপর কড়া নজর রাখার সুবাদে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘটতে যাওয়া অনেক বড় বড় ফেতনাকে অঙ্গুরেই খতম করে দিয়েছেন। এর ধারাবাহিকতায় খালেদ বিন সুফয়ান হুজালি, কা'ব ইবনে আশরাফ ও মসজিদে যিরার উল্লেখযোগ্য।

খালেদ বিন সুফয়ান হুজালি নবীজীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রস্তুত করছিল। নবীজী এক সাহাবীকে প্রেরণ করে তাকে খতম করে দেন।

মসজিদে যিরার আহলে কিতাব ও মুনাফিকদের একটি চক্রান্ত ছিল। যা পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই নির্মূল করে দেয়া হয়।

যুদ্ধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি কৌশল হল, শত্রু সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকা। যার জন্য নবীজী উক্ত এরশাদ করেন এবং যুবায়ের প্রস্তুত হয়ে যান। প্রতিদান স্বরূপ দরবারে নবুওয়াত থেকে তিনি হাওয়ারী-বিশেষ সহচর উপাধিতে ভূষিত হন। প্রথম পর্বে নবীজীর গোয়েন্দা কার্যক্রম সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়া হয়েছে।

ইসলামী মূলনীতির আলোকে গোয়েন্দাবৃত্তি সওয়াব অর্জনের মাধ্যম

প্রিয়নবী সাহাবীদেরকে এই মূলনীতি বর্ণনা করেছেন-الحرب خدعة যুদ্ধ তো কৌশলের নাম।

তাই শত্রুর বিরুদ্ধে গোয়েন্দা প্রস্তুত করা, পাঠানো, শত্রুর খবরাখবর জানা, শত্রুর মাঝে হতাশা ছড়িয়ে দেয়া, ছদ্মবেশ ধারণ করে উদ্দেশ্য পূর্ণ করা-ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য, ইসলামের বুলন্দির জন্য শুধু জায়েযই নয় বরং সাওয়াবের কারণ। গয়ওয়ায়ে খন্দক দেখুন সেখানে এসব বিষয় রয়েছে।

এই গয়ওয়া ৫ম হিজরীতে শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। মুশরিকরা সম্মিলিতভাবে মদীনা মুনাওয়ারার উপর আক্রমণ করে। আবু সুফয়ানের নেতৃত্বে

কুরাইশ এবং উয়াইনা ইবনে হিসনের নেতৃত্বে গাতফানের মুশরিক, বনু ফাযারা বনু মুররাহ ও আশজা গোত্র সমূহ সম্মিলিতভাবে ১০হাজারেরও অধিক লোক মদীনা মুনাওয়ারার উপর আক্রমণ করে। নবীজী তিন হাজার মুসলমানকে প্রস্তুত করেন। এবং পরামর্শ করে মদীনার বাইরে পরিখা খনন করেন।

মুশরিকদের সৈন্যদল পরিখা পর্যন্ত এসে থেমে যায়। পরিখার অপর পাশে মুসলিম সৈন্যরা অবস্থান করছিল। বিশদিনের বেশী সময় ধরে উভয় দল সামনাসামনি অবস্থান করল। তীর ও পাথর বিনিময় হল। মুশরিকদের মধ্যে থেকে উমার ইবনে আব্দুদ পরিখা পার হয়ে গেলে হজরত আলী এর হাতে নিহত হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানরা তীব্র শীত, ক্ষুধা ও ভয়ের সম্মুখীন হন। হজরত নু'আঈম ইবনে মাসউদ আশজায়ী নবীজীর নিকট হাজির হয়ে আরজ করলেন-ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি নিজের কণ্ঠকে না জানিয়ে মুসলমান হয়ে গেছি। এখন আপনি যা ইচ্ছা আমাকে আদেশ দিন। নবীজী ^{পাশ্চাত্যের} বললেন, ^{অলাহাকি} তুমি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তুমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে কৌশল অবলম্বন কর। ^{অমসাদার} কেননা যুদ্ধ কৌশলের নাম।

হযরত নু'আঈম ইবনে মাসউদ রা. ইহুদী গোত্র বনু কুরাইযার নিকট গেলেন। জাহিলিয়াতের যুগে তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। প্রথমে তিনি 'সম্পর্কের' আলোচনা করেন। এরপর তাদের একথা বোঝান-কুরাইশ ও গাতফান বহিরাগত লোক, অথচ তোমরা মদীনার স্থায়ী বাসিন্দা। আজ তারা মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে। তোমরা বিনা শর্তে তাদেরকে সহায়তা করছ। অথচ বাস্তবতা হল, যদি কুরাইশ বিজয়ী হয় তবে তারা নিজেদের ভিটে বাড়ীতে চলে যাবে। আর তোমরা একাকী মুসলমানদের সামনে এখানে পড়ে থাকবে। এরপর কি হবে তা তোমরা ভাল করেই জান। এজন্য আমার উপদেশ হল- তোমরা কুরাইশ ও গাতফানকে ততক্ষণ সহায়তা করার ওয়াদা করবে না যতক্ষণ তারা তাদের বিশেষ কিছু লোককে তোমাদের কাছে বন্ধক না রাখে। ইহুদীরা বলল- এটা তো খুবই ভাল পরামর্শ। আমরা সে মোতাবেক কাজ করব।

হজরত নু'আঈম ইবনে মাসউদ কুরাইশের নিকট আসলেন। 'বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের' আলোচনা করলেন-কুরাইশরা তা স্বীকার করল। এরপর তিনি বললেন- আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনেছি। তোমাদেরকে তা বলতে চাই। যাতে তোমরা প্রতারণার শিকার না হও। তবে আমি এই শর্তে বলতে পারি যে, তোমরা কাউকে আমার নাম বলবে না। কুরাইশ সম্মত হল। হজরত নু'আঈম বললেন-ইহুদীরা মুহাম্মাদ এর সাথে সন্ধি করেছে। তারা পূর্বের অনুশোচনা ও মুহাম্মাদ এর অসম্ভব দূর করার জন্য ওয়াদা করেছে যে, তারা কুরাইশ ও

গাতফানের নেতৃত্বস্থানীয় লোকদেরকে মুহাম্মাদ এর হাতে সোপর্দ করবে। যাতে তিনি তাদেরকে হত্যা করতে পারেন। এরপর ইহুদীরা মুহাম্মাদ এর সাথে একত্র হয়ে অন্যান্য কুরাইশ ও গাতফানকে খতম করে দিবে। এজন্য ইহুদীরা যদি তোমাদের সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে বন্ধক হিসাবে নিতে চায় তবে কিছুতেই দিবে না। এরপর হজরত নুআঈম গাতফানের নিকট গেলেন এবং কুরাইশকে যা বলেছেন তা বললেন, ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসের শনিবার আল্লাহর কুদরত প্রকাশ পেল। আবু সুফিয়ান ও গাতফানের নেতারা বনু কুরাইজার নিকট একটি প্রতিনিধি দল পাঠায়। তাদের বক্তব্য ছিল-আমরা এভাবে পড়ে থেকে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি, তোমরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। যাতে আমরা আগামীকাল ভোরে হামলা করে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি। ইহুদীরা উত্তর দিল- আজ শনিবার। এদিনে সীমালংঘন করার কারণে আমাদের উপর আযাব এসেছিল। দ্বিতীয় কথা হল- যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের কিছু সম্মানিত লোককে আমাদের কাছে বন্ধক না রাখবে ততক্ষণ আমরা যুদ্ধে বের হব না। মুশরিকদের কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছল তখন তারা বলল, বাস্তবেই নুআঈম ইবনে মাসউদের কথা সত্য। এরপর তারা ইহুদীদেরকে জবাব দিল- আমরা তোমাদের কাছে কাউকে বন্ধক রাখব না। যদি তোমরা যুদ্ধে বের না হও তাহলে আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোন চুক্তি নেই। ইহুদীরা যখন এই সংবাদ শুনলো তখন তারা বলল-নিশ্চয়ই নুআঈম ইবনে মাসউদ সত্য কথা বলেছে। এভাবে তাদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তায়ালা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেন। যার ফলে শত্রু শিবির উল্টে পড়ে থাকে।

রাসূল ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} যখন তাদের মাঝে বিশৃংখলার সংবাদ শুনলেন তখন হজরত হুজাইফা রা. কে অবস্থা পর্যবেক্ষনের জন্য প্রেরণ করলেন। তার জন্য হেফাজতের দুআ করলেন। হজরত হুজাইফা শত্রু শিবিরে ঢুকে পড়লেন। এ সময় আবু সুফিয়ান ঘোষণা করল-প্রত্যেকেই পাশের লোকের পরিচয় নাও। (যাতে কোন গুপ্তচর আমাদের মাঝে প্রবেশ করতে না পারে) হজরত হুজাইফা রা. বলেন, আমি শুনা মাত্রই পাশের লোকের হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কে? সে তার নাম বলল। (আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করলনা) এরপর আবু সুফিয়ান বলল- হে কুরাইশ! এখন স্থির থাকার সময় নেই। আমাদের পশু মারা গেছে, বনু কুরাইজা আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেছে, ঝড়ও মারাত্মক কষ্টের সম্মুখীন করেছে, এমনকি হাটাচলা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তাই তোমরা ফিরে চল, আমি চলছি। এই বলে সে তার উটের উপর সওয়ার হল। হজরত হুজাইফা রা. বলেন-তখন আমার মনে খেয়াল হল তীর মেরে আবু সুফিয়ানকে খতম করে দিই। কিন্তু নবীজীর কথা মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন- হুজাইফা! নতুন

কিছু করবে না। এরপর তিনি ফিরে আসলেন। নবীজী <sup>সাওয়াহুহু
আলাহুইহি
ওয়ালাতাহি</sup> নামাজ পড়তে ছিলেন। হজরত হুজাইফা রা. বলেন-আমি নবীজীকে সুসংবাদ শোনালাম, নবীজী <sup>সাওয়াহুহু
আলাহুইহি
ওয়ালাতাহি</sup> আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করলেন। যখন গাতফান কুরাইশদের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ শুনল তখন তারাও ফিরে গেল।

হজরত ইদ্রীস কান্দলবী র. তাফসীরে মা'রিফুল কুরআনে হজরত মুজাহিদের কথা বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেন- গুপ্তচরবৃত্তিতে জায়েয নেই তবে কোন ক্ষতি থেকে বাচার জন্য অথবা কোন মুসলমানকে বিপদ থেকে বাঁচাতে শত্রুর পরিকল্পনা অনুসন্ধান করা জায়েয। (মাআরিফুল কুরআন তাকমিলা-পৃ:৫০১ খ:৭) আসুন! আমরা ইসলামী রাষ্ট্রের আধুনিক ইন্টেলিজেন্সকে ইসলামী মূলনীতির আলোকে পর্যালোচনা করি।

ইন্টেলিজেন্স-এর ইসলামী কাঠামো।

ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সেহেতু কুরআনে কারীমে জীবনের প্রতিটি শাখার মৌলিক ধারণা বর্ণনা দিয়েছে। যেহেতু ইসলাম নির্দিষ্ট কোন এলাকা বা যুগে সীমাবদ্ধ নয় সে জন্য নির্দেশিত মূলনীতির সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা কর্মধারা ব্যাখ্যা করেনি। এটা ইসলামের সার্বজনীনতা যে, সর্বদা মুসলমানদেরকে এই স্বাধীনতা দেয়, তারা যুগের প্রয়োজনের আঙ্গিকে জীবনের প্রত্যেকটি শাখা সুশৃংখল করতে পারবে। ইন্টেলিজেন্স-এর ইসলামী ভিত্তি নবীজী <sup>সাওয়াহুহু
আলাহুইহি
ওয়ালাতাহি</sup> এই হাদীসের উপর-যাতে তিনি এরশাদ করেন, নাখলা পর্যন্ত যাও। ওখানে পৌছে গোপনে কুরাইশদের অবস্থা সম্পর্কে জেনে আমাদেরকে জানাবে।

নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সাহাবীর নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি গোয়েন্দা কাফেলা গঠন করে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জায়গা নাখলার দিকে রওয়ানা করেন। এরশাদ করেন-নিজেকে নিজে প্রকাশ করবে না। এর উদ্দেশ্য হল-গুপ্তচরবৃত্তির জন্য ইসলাম ছদ্মরূপ অথবা ছদ্মঘটনা রচনার অবকাশ রয়েছে। তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা যাবে না।

রাসূল <sup>সাওয়াহুহু
আলাহুইহি
ওয়ালাতাহি</sup> মদীনা মুনাওয়ারাতে আগমনের পর মদীনার আশপাশে কুদরতি জলপথ, কুরাইশদের সামরিক, ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক তৎপরতা, মদিনায় বসবাসরত ইহুদীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। পূর্বে নাখলার ঘটনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এ বিষয়ের দ্বিতীয় ঘটনা খন্দকের যুদ্ধে ঘটেছে তাও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসূল হজরত হুজাইফা ইবনে যামান রা. কে বলেন- যাও খবর নাও, কাফেরদের কি অবস্থা! কিন্তু দেখো কারো উপর আক্রমণ করবে না। দ্বিতীয় এই

বাক্যটি বলে নবীজী তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ আক্রমণ না করে নিজেকে গোপন রাখ। আধুনিক ইন্টেলিজেন্স ব্যবস্থায় “কোর” পদ্ধতি এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যখন হুয়াইফা রা. ফিরে এলেন তখন শীতে কাঁপছিলেন। নবীজী ^{সাদাআহু আলহাদি হুয়াইফা} তাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে নিলেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। এই রেওয়ায়েত দ্বারা ইসলামী গোয়েন্দাবৃত্তির গুরুত্ব খুব ভালভাবেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আরও জানা যায়-ইন্টেলিজেন্স কোন অপছন্দনীয় কাজ নয়। স্বয়ং রসূলুল্লাহ ^{সাদাআহু আলহাদি হুয়াইফা} এই কাজ সম্পাদনকারীকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তাহলে কত মূল্যবান কাজ এটি!

ইন্টেলিজেন্স এর আধুনিক মানকে উন্নত করার জন্য আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি। বদর যুদ্ধে যখন রসূলুল্লাহ এর সামনে শত্রুদের দুইবন্দীকে উপস্থিত করা হল, নবীজী তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন-প্রতিদিন কয়টি উট জবেহ হয়? নবীজী উটের সংখ্যা শুনে লোকসংখ্যা বুঝে নিলেন। এই বর্ণনায় যুদ্ধবন্দীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তেমনি অপ্রয়োজনীয় বিষয় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতিতে জানা যায়।

তারীখে ত্ববারীতে রয়েছে-রাসূল ^{সাদাআহু আলহাদি হুয়াইফা} হজরত যায়েদ ইবনে সাবেত কে হিব্রু ভাষা শিক্ষা করার আদেশ দিয়েছিলেন। যাতে তিনি ইহুদীদের অবস্থা জানতে পারেন। ইতিহাসে প্রমাণিত হজরত আব্বাস রা. খায়বার বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রকাশ করেননি; বরং মক্কা থেকে মুশরিকদের খবরাখবর লিখে নবীজীর কাছে পাঠাতেন।

শত্রুর বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করা বিষয়ক ইসলামী ইতিহাসের প্রাথমিক কিছু ঘটনার প্রতি স্বাভাবিকভাবে দৃষ্টি দেওয়ার পর আমরা এখন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এর প্রতি এসেছি কেননা বর্তমান নায়ুক পরিস্থিতিতে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সকে যথার্থ মূল্যায়ন না করা বাড়াবাড়ির শামিল।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ (৬৭)

অর্থ: তোমাদের মধ্যে তাদের গুপ্তচর রয়েছে।

উক্ত আয়াতের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা শত্রুর গুপ্তচর-ফেৎনাবাজদেরকে মুসলমানদের জন্য চিহ্নিত করে দিয়েছেন। এর থেকে আমরা শিক্ষা পাই-পারস্পারিক কথাবার্তার ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যাতে আমাদের গোপন তথ্য শত্রুর কাছে না পৌঁছে।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ

অর্থ: নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না।
(গোপন বিষয় জানিও না।) আল ইমরান-১১৮

এ পর্যায়ে “নিজেদের” বলতে কি বুঝায় তা আলোচনা করব। এখানে নিজেদের বলতে উদ্দেশ্য সেসব লোক যারা স্বীয় দায়িত্ব পালনার্থে গোপন তথ্য সম্পর্কে অবগত হয়। নিজেদের লোক বলতে আদৌ তারা উদ্দেশ্য নয়, যারা তার নিকটবর্তী বা আত্মীয়স্বজন। গোপন তথ্য উম্মাহর আমানত। তাই সকলের উচিত ভুলেও যেন তা প্রকাশ না পায়। আপন ভাই-বন্ধু অথবা আত্মীয় স্বজন কিংবা পরিচিত লোকদের সাথে কথাবার্তার মাঝেও যেন কোন গোপন তথ্য প্রকাশ না পায়। বর্ণিত আছে- যে তার ইচ্ছাকে গোপন করে সে সফল হয়।

উল্লিখিত সকল মৌলিক নীতিমালার উপর নবীজী ^{পাঠ্যসাহিত্য আলমহিবি উম্মাহর আমানত} আমল করে দেখিয়েছেন যেমনটি আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদেরকে অভ্যন্তরিন ও বাহিরের শত্রুদের যথেষ্ট মোকাবেলা করতে হয়েছে। মদীনায়ে হিজরতের পরে মদীনার ইহুদী বসতির সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের ষড়যন্ত্রের জাল নস্যাৎ করার জন্য তথ্য সংগ্রহের বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। হজরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. কে হিব্রু ভাষা শিক্ষার আদেশ এ বিষয়ের প্রতি কড়া নজরদারির প্রমাণ। একই পদ্ধতি নবীজী ^{পাঠ্যসাহিত্য আলমহিবি উম্মাহর আমানত} মুনাফিকদের বিরুদ্ধেও অবলম্বন করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের একটি ঘটনা কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এর ইসলামী কাঠামো বুঝতে সহায়ক হবে।

হজরত হাতেব ইবনে আবী বালতা'আ রা. এর ঘটনা

ঐতিহাসিক ইসহাক রহ. বলেন-মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর উরওয়া ইবনে যুবায়ের ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণনা করেন-নবীজী ^{পাঠ্যসাহিত্য আলমহিবি উম্মাহর আমানত} মক্কার দিকে রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করেছেন। হজরত হাতেব রা. এক চিঠি মারফত কুরাইশদের এ তথ্য পাঠালেন। বিনিময় দিয়ে বনী আব্দুল মুত্তালিবের সারা নামী এক মহিলাকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দেন। মহিলা চুলের খোপায় করে মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়। নবীজীও ওহীর মাধ্যমে ঘটনা জানতে পারেন। তিনি হজরত আলী ও যুবায়ের কে পাঠিয়ে দিলেন তাকে আটক করার জন্য। বললেন, তার সাথে হাতেবের একটি চিঠি রয়েছে।

তারা রওয়ানা হলেন। খলীফা বনী আবী আহমাদ নামক স্থানে মহিলাকে আটক করেন। তল্লাশি চালিয়ে কিছুই পেলেন না। হজরত আলী রা. কসম খেয়ে

বললেন-নবীজী মিথ্যা বলেননি। চিঠি বের করে দিবে নতুবা তোমাকে বস্ত্রহীন করে দিব। মহিলা হজরত আলী রা.এর দৃঢ়প্রত্যয় দেখে বলল-তোমরা আমার থেকে কিছুক্ষন সরে দাড়াও। তারা সরে দাড়ালে সে খোপা থেকে চিঠি বের করে দেয়। তারা রাসূলুল্লাহ ^{সাদাতাহাজ আলহাইরী হাসানতাহার} কে চিঠিটি প্রদান করেন। নবীজী ^{সাদাতাহাজ আলহাইরী হাসানতাহার} হাতেব রা. ডেকে জিজ্ঞেস করেন-তুমি কেন এই চিঠি লিখেছ?

সে বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি আমার পরিপূর্ণ ঈমান রয়েছে। আমি বদলে যাইনি। ধর্মও পাল্টাইনি। কিন্তু বিষয়টি হল, আমি যেহেতু কুরাইশি নই এবং তাদের সাথে কোন আত্মীয়তা সম্পর্কও নেই। আমার বিবি-বাচ্চা তাদের কাছে থাকে। এই দৃষ্টিকোন থেকে আমি তাদের উপর এহসান করেছি। একথা শুনে হজরত উমর রা. বলেন- অনুমতি দিন। এই মুনফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। নবীজী ^{সাদাতাহাজ আলহাইরী হাসানতাহার} বললেন-উমার! তুমি কি জান আল্লাহ তায়ালা বদরের দিন সাহাবীদের প্রতি খুশি হয়ে ঘোষণা করেছেন, ‘তোমরা যা ইচ্ছা আমল কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম’।

আল্লাহ তায়ালা হজরত হাতেব রা. এর শানে নাযিল করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

অনুবাদ: “হে মুমিনগণ! আমার এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।

(সূরা মুমতাহিনা:১)

যুদ্ধ কালীন সময়ে স্থায় সৈন্যবাহিনীর গোপন তথ্য প্রকাশ করা কিংবা আক্রমণের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে শত্রুকে জানিয়ে দেয়া মারাত্মক ক্ষতিকর ছিল। কিন্তু প্রিয় নবীজী ^{সাদাতাহাজ আলহাইরী হাসানতাহার} সময় মত অবগত হন। কেউ কেউ বলেছেন, নবীজী ^{সাদাতাহাজ আলহাইরী হাসানতাহার} আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ থেকে অবগত হয়েছিলেন। আবার কেউ বলেছেন, তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত সাহাবীদের মাধ্যমেই তিনি জানতে পেরেছিলেন।

যাই হোক, এ ঘটনা থেকে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এর গুরুত্ব স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। উপযুক্ত সময়ে তথ্য পেয়ে যাওয়া প্রমাণ করে নবীজীর গোয়েন্দা মদীনায়ও সদা তৎপর ছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের উপরও কড়া নজর রাখতেন। উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা পাই শত্রুর তথ্য প্রেরণের পথ কিভাবে বন্ধ করতে হয় এবং নিজেদের গোপন বিষয় কিভাবে সংরক্ষন করতে হয়।

তদন্তের আদেশ

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

অনুবাদ: হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই কর। এমন যেন না হয় যে তোমরা না জেনে কোন কওমকে ক্ষতির সম্মুখীন করবে অতপর স্বীয় কর্মের উপর লজ্জিত হবে। (সূরা হুজুরাত ৬)

এই আয়াতে খবর যাচাই করাকে অত্যাবশ্যিক সাব্যস্ত করা হয়েছে। উক্ত বাণী বর্তমান ইন্টেলিজেন্স এর মূলনীতির সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ। আজকাল ইন্টেলিজেন্স সমূহ নিজেদের কর্মীদের সংগৃহীত তথ্য যাচাই বাছাই করার পরমর্শ দিয়ে থাকে। এজন্যই রিপোর্টের গ্রেডিং করা হয়। যাতে ভুল-ত্রুটির শিকার না হতে হয়।

শিক্ষা

উক্ত আয়াত থেকে আমাদের অনেক শিক্ষা অর্জন হয়।

প্রথমত: সংবাদ বা রিপোর্টকে যাচাই করা, তদন্ত করা, যাতে কোন নিরাপরাধ ব্যক্তি ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। কেননা, ইসলাম কোন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে ক্ষতি করা বা সমস্যায় ফেলার অনুমতি দেয় না।

দ্বিতীয়ত: আমাদের মধ্যেই কেউ জ্ঞানস্বল্পতা বা অনভিজ্ঞতার কারনে কোন ঘটনাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে নাও পারে। সেহেতু তথ্য প্রেরকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে রিপোর্টের গ্রেডিং হওয়া উচিত এবং সেই ভিত্তিতেই একই ধরনের কয়েকটি রিপোর্টের মাঝে প্রাধান্য দেয়া উচিত।

মুসলিম ইন্টেলিজেন্স এর দায়িত্ব।

মুসলিম ইন্টেলিজেন্স অন্যান্য দেশের ইন্টেলিজেন্স এর ন্যায় দু'ধরনের কাজ করে। প্রথমত: শত্রু অথবা সম্ভাব্য শত্রুর অশুভ পরিকল্পনা, অপতৎপরতা, যুদ্ধের প্রস্তুতি ইত্যাদি সম্পর্কে উলুল আমরকে অবগত করা।

দ্বিতীয়ত: অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলাপ্রিয় শত্রুর এজেন্ট, জাতি বা ভাষাগত বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ, গুপ্তচর, সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সম্পর্কে উলুল আমরকে অবগত করে। যাতে উলুল আমর উপযুক্ত সময়েই তা নির্মূল করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে উলুল আমরকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য যে উপাদান প্রয়োজন তা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিই সরবরাহ করে থাকে। হজরত হাতেব ইবনে আবী বালতাআ রা. ঘটনা সাক্ষী, এ ধরনের গোপন তৎপরতা রাষ্ট্রের জন্য কত প্রয়োজন। রবং প্রত্যক্ষভাবে ইসলামের খেদমতও বটে।

ফলাফল:

এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা থেকে আমরা যা শিখতে পারি তা হল-

- ইন্টেলিজেন্স কখনই অনৈসলামী কিংবা অনৈতিক কাজ নয়।

- কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে কখনও মিথ্যা বা অসত্য পছন্দ বের হয় না। এতে কোন দেশপ্রেমিক ব্যক্তি কিংবা দল উদ্দেশ্য হয় না। মূল উদ্দেশ্য হয় সামষ্টিক স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা।
- ইন্টেলিজেন্স সদস্যদের জন্য আবশ্যিক হল রিপোর্ট যাচাই করা। যাতে নিরাপরাধ ব্যক্তি আক্রান্ত না হয়।
- যারা উম্মতের জন্য নিরলসভাবে নিষ্ঠতার সাথে ইন্টেলিজেন্স কাজ করে তারা জাতির মূল্যবান সম্পদ। তারা ইসলামের খেদমতে লিপ্ত। এর প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই দান করবেন। যেমন, রাসূল হুয়াইফা রা. কে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

পরিশেষে আরজ করব মুসলমানদের জন্য ইন্টেলিজেন্স অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কেননা এর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের সংরক্ষণ হয়, ইসলামের হেফাজত হয়। নিজেদের চেতনার সীমানা শত্রুমুক্ত থাকে। এজন্য আমাদেরকে সোচ্চার থাকা চাই।

একটি ফিক্বহী মাসআলা

গোয়েন্দাদের জন্য অনেক সময় ভিন্ন ধর্মালম্বীদের বেশ ধরতে হয়। কখন ধুতি, কখনও পৈতা, কখনও ত্রুশ পরিধান করতে হয়। শরীয়তে দৃষ্টিতে ইহার কী হুকুম? প্রথমত: যথা সম্ভব এর থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। দ্বিতীয়ত: ভিন্ন ধর্মালম্বীদের বেশ ধারণ করার দু'টি স্তর।

১. তাদের জাতীয় সংস্কৃতির সাদৃশ্যতা যেমন ধুতি পরা।
২. ধর্মীয় শা'আয়ের বা প্রতীকের সাথে সাদৃশ্যতা। যেমন সিঁদুর মাখা, পৈতা বুলানো। শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রথম প্রকার তুলনামূলক হালকা। দ্বিতীয় প্রকার মারাত্মক ব্যাপার। কুফুর বা কুফুরীর কাছাকাছি। চেষ্টা করতে হবে প্রথম প্রকারের মাধ্যমেই কাজ সম্পাদন করতে। একান্ত অপারগতায় দ্বিতীয় স্তর অবলম্বন করা যেতে পারে। উভয় স্তরই অস্থায়ী ও সাময়িকভাবে অনুমেয়। স্থায়ীভাবে এটা কর্মপদ্ধতি হতে পারে না।

ويكفر بوضع قلنسوة المجوسي على رأسه على الصحيح إلا لضرورة دفع الحر أو البرد وبشد الزنار في وسطه إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب وطلية للمسلمين

অনুবাদ: মাথায় মুশরিকদের টুপি ব্যবহারের কারণে কাফের সাব্যস্ত করা হবে, এটাই সঠিক। তবে যদি প্রয়োজন থাকে যেমন, গরম অথবা ঠাণ্ডা থেকে বাচার জন্য (তবে ভিন্ন কথা)। তেমনিভাবে মাজায় বাধলে তাকেও কাফের সাব্যস্ত

করা হবে। তবে যদি মুসলমানদের জন্য গুপ্তচরবৃত্তি অথবা যুদ্ধের কৌশল হিসাবে করে (তবে ভিন্ন কথা)।

(আল্ বাহরুর রায়েক বাবুল মুরতাদ্দীন ৫/১২৩, (জাদীদ ফেকুহী মাসায়েল ১/৪০১)
মুসলমান কাফেরদের সহযোগী হিসাবে
মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করতে পারে?

কুরআন, হাদীস ও ফিকুহ থেকে প্রমাণিত অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা, উৎকোচ দিয়ে তাদের সহযোগীতা নেয়া, তাদের সম্মাননা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা, তাদেরকে নিজের এলাকায় জায়গা দেয়া, তাদের সাথে এমন আচরণ করা যা দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধন হয়, এ সকল বিষয় অনৈসলামী ও শরীয়ত পরিপন্থি। এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি অমুসলিমের সম্মানদানে অংশগ্রহণ করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। রদুল মুহতারের বরাতে জানা যায়- কোন অমুসলিম নিরাপত্তা নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করে যদি অমুসলিমদের সাথে মিলে গুপ্তচরবৃত্তি শুরু করে দেয় তবে তার জানের নিরাপত্তা শেষ হয়ে যায়।

অমুসলিমদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে আদুররুল মুখতারে বলা হয়েছে-অমুসলিমকে সম্মান করা মুসলমানের জন্য হারাম। তাকে সালাম দেয়া হারাম। তাকে পথের মাঝ দিয়ে হাটতে দেবে না। বরং রাস্তার কিনারা দিয়ে চলতে বাধ্য করবে কেননা তাকে সম্মান জানানো মূলত কুফুরিকে সম্মান জানানোর নামাস্তর। সুতরাং অমুসলিমদের সাথে ওঠা বসা করা, তাদেরকে সহায়তা করা হারাম। গুপ্তচরবৃত্তিতে যেহেতু মুসলমানদের বিরুদ্ধেই সহযোগীতা হয়, যুদ্ধে অমুসলিমদেরকে সহায়তা করা হয় তাই নিশ্চিতভাবে তাও হারাম।

হজরত মাও. মুফতী শফী সাহেব র. মাআরিফুল কুরআনে নিম্নোক্ত কথাগুলো উল্লেখ করেছেন-

ইবনে কাসীর ত্ববারানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-নবীজী ^{সালামাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন জালেমকে সহযোগীতা করার জন্য চলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। এজন্য সালাফে সালাহীন কোন জালেম বাদশাহর চাকুরী বা কোন পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতেন। কেননা আশংকা আছে, এতে তাদের সাহায্য হয়ে যেতে পারে। তাফসীরে রুহুল মাআনীতে **فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ** আয়াতের ব্যাখ্যায় এই হাদীস বর্ণনা করেন- কেয়ামতের দিন ঘোষণা করা হবে- কোথায় জালেম ও তার সাহায্যকারীরা? এমনকি যারা জালেমকে দোয়াত কলম ঠিক করে দিয়েছে। তাদের সকলকে একটি লোহার বাস্ত্রে ভরে জাহান্নাম নিক্ষেপ করা হবে।

(মাআরিফুল কুরআন ৩/২৫)

গুপ্তচরের বিধান

গুপ্তচর কয়েক প্রকার। যেমন হারবী কাফের, মুআহাদ, জিম্মী, মুস্তামিন, মুসলমান।

আল্লামা নববী রহ. বলেন, হারবী কাফের গুপ্তচরকে হত্যা করা সর্বসম্মতক্রমে জায়েয। মুআহাদ কাফের ও জিম্মী যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করে তবে তাতে তাদের অঙ্গীকার খতম হয় না। কিন্তু ইমাম আওয়ামী র. বলেন এতে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ হয়ে যায়। তাদেরকে হত্যা করা জায়েয। আল্লামা সারখসী র. বলেন মুস্তামিনের সাথে যদি অঙ্গীকারের সময় এ শর্ত করা হয় যে, সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করতে পারবে না। তার পরেও যদি সে করে তাহলে তাকে হত্যা করতে কোন সমস্যা নেই। বরং উত্তম হল তাকে হত্যা করে ফেলা যাতে অন্যের জন্য দৃষ্টান্ত হয়।

মুসলিম গুপ্তচর যে অমুসলিমদেরকে সাহায্য করে, নিজেদের গোপন তথ্য কাফেরদের নিকট পৌঁছে দেয়। মুসলমানদের ভেতরের সংবাদ কাফেরদেরকে জানিয়ে দেয় শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকে মুনাফিক বলে। এজন্য তার শাস্তির ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য হল-সর্বপ্রথম তাকে বুঝাবে। প্রথমবার গুপ্তচরবৃত্তি প্রমাণিত হলে তাকে আটক করা হবে। যাবৎ না তওবা করে। যদি এই শাস্তি কার্যকর না হয়; বরং সে গুপ্তচরবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তবে ফুকাহায়ে কেরামের ভাষ্য অনুযায়ী তাকে তা'যীর করতে হবে। তা'যীরের বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। যেমন পাহাড় থেকে ফেলে দেয়া, আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া, প্রস্তর নিক্ষেপ করা, জবাই করা ইত্যাদি। মুছলা-বিকৃতিসাধন জায়েয নেই। এক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য হল, তা'যীরের মধ্যে কোনটি অবলম্বন করবে সে ক্ষেত্রে আমীরের ইচ্ছাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত। আমীর যে পন্থা উপযুক্ত মনে করবে তা অবলম্বন করবে।

ইদানিং প্রগতিবাদীদের প্রশ্ন হল- গুপ্তচরকে জবাই করা অমানবিক। তাদের খেদমতে আরজ হল-শরীয়ত এধরনের অর্থর্ব গুপ্তচরদেরকে সমাজ থেকে বিছিন্ন করার পদ্ধতি আমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় শিখিয়েছে। তোমাদের থেকে আমাদের মানবিকতা শেখার কোন প্রয়োজন নেই। মানুষ সৃষ্টি করেছেন যিনি তিনিই বলে দিয়েছেন এ পদ্ধতি। তুমি আবার কে? তাদেরকে আটক করে তওবা করতে সুযোগ দিবে অথবা তার অশুভ জীবনকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে অনুপস্থিত করে দিবে এবং তার পদ্ধতিও বলে দিয়েছে। আমীর সমাজ সংশোধনের উদ্দেশ্যে যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারে চাই জবাই করেই হোক না কেন।

(বদরের দিন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আবু জাহলের শিরচ্ছেদ করেন। আবু জাহল তখন জীবিত ছিল। হতভাগা বলেছিল, মাথাটি একটু একটু বড় করে কাটবে যাতে বোঝা যায় 'এটা সর্দারের মাথা'।

উত্তম হল হত্যার সব থেকে সহজ পস্থা অবলম্বন করবে। যেমন তলোয়ার দিয়ে শিরচ্ছেদ করা, গুলি করা ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জবাইও করা যেতে পারে। এজন্যই আহকামুল কুরআন কতল এর সংজ্ঞা এভাবে করা হয়েছে।

جواز قتلهم بأي وجه كان إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلة

আমীর যদি গুপ্তচরকে জবাই করার আদেশ দেন তবে তা সঠিক। কেননা তাফসীর ও ফিক্বহের কিতাব এ সকল প্রমাণে ভরপুর।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ
وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

অনুবাদ: যখন সম্মানিত মাসসমূহ অতিক্রম করবে তখন মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর, আটক কর, অবরোধ কর এবং প্রত্যেকটি ঘাটিতে বসে থাক।
(সূরা তাওবা-৫)

অনত্র এরশাদ করেন—

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ
الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না ভূপৃষ্ঠে ধরাশায়ী করবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর আর আল্লাহ তায়ালা চান আখেরাত। আর আল্লাহ হলেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আনফাল-৬৭)

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَإِمَّا تَثْقَفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ

অনুবাদ: যদি তোমরা তাদেরকে যুদ্ধে পাও তবে তাদের এমন শাস্তি দাও যেন তাদের উত্তরসূরীরা তা দেখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, তাদেরও যেন শিক্ষা হয়।

(আনফাল-৫৭)

তাফসীরে কুরতুবীতে এসেছে

واعلم أن مطلق قوله : {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} يقتضي جواز قتلهم بأي وجه كان ، إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلة. ومع هذا فيجوز أن يكون الصديق رضي الله عنه حين قتل أهل الردة بالإحراق بالنار ، وبالحجارة وبالرمي من رؤوس الجبال والتكيس في

الآبار ، تعلق بعموم الآية. وكذلك إحراق علي رضي الله عنه قوما من أهل الردة يجوز أن يكون ميلا إلى هذا المذهب ، واعتمادا على عموم اللفظ. والله أعلم

الثالثة : قوله تعالى : { حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ } عام في كل موضع. وخص أبو حنيفة رضي الله عنه المسجد الحرام ، كما سبق في سورة البقرة ثم اختلفوا ، فقال الحسين بن الفضل : نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء. وقال الضحاك والسدي وعطاء : هي منسوخة بقوله : { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } [محمد : ٤]. وأنه لا يقتل أسير صبرا ، إما أن يمن عليه وإما أن يفادي. وقال مجاهد وقتادة : بل هي ناسخة لقوله تعالى : { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } وأنه لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل. وقال ابن زيد : الآيتان محكمتان. وهو الصحيح ، لأن المن والقتل والفداء لم يزل من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من أول حرب حارهم ، وهو يوم بدر كما سبق. وقوله : { وَخُذُوهُمْ } يدل عليه. والأخذ هو الأسر. والأسر إنما يكون للقتل أو الفداء أو المن على ما يراه الإمام. ومعنى : { أَحْضَرُوهُمْ } يريد عن التصرف إلى بلادكم والدخول إليكم ، إلا أن تأذنوا لهم فيدخلوا إليكم بأمان.

আরো এসেছে

قوله تعالى : { فَإِمَّا تَثَقَّفَتْهُمْ فِي الْحَرْبِ } شرط وجوابه. ودخلت النون توكيدا لما دخلت ما ، هذا قول البصريين. وقال الكوفيون : تدخل النون الثقيلة والخفيفة مع { إِمَّا } في المجازاة للفرق بين المجازاة والتخيير. ومعنى { تَثَقَّفَتْهُمْ } تأسرهم وتجعلهم في ثقاف ، أو تلقاهم بحال ضعف ، تقدر عليهم فيها وتغلبهم. وهذا لازم من اللفظ قوله تعالى : { فَشَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ } قال سعيد بن جبير : المعنى أنذر بهم من خلفهم

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الرِّتَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

তাফসীরে কুরতুবীর ভাষ্য-

{ فَضَرْبَ الرِّقَابِ } ولم يقل فاقتلوهم ، لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل ، لما فيه من تصوير القتل بأشنع صوره ، وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه.

الثانية : قوله تعالى : { حَتَّىٰ إِذَا أَنُحِثْتُمْوَهُمْ } أي أكثرتم القتل { وَإِمَّا فِدَاءٌ } . ولم يذكر القتل ها هنا اكتفاء بما تقدم من القتل في صدر الكلام ،

সহীহ বুখারীতে এসেছে

بَاب قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ

٣٩٦١ - حَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا قَيْسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَهْلٍ وَبِهِ رَمَقٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ

উমদাতুল কারীতে এসেছে-

وقال الداودي الجاسوس يقتل وإنما نفى القتل عن حاطب لما علم النبي منه ولكن مذهب الشافعي وطائفة أن الجاسوس المسلم يعزر ولا يجوز قتله وإن كان ذا هيئة عفي عنه لهذا الحديث وعن أبي حنيفة والأوزاعي يوجع عقوبة ويطال حبسه وقال ابن وهب من المالكية يقتل إلا أن يتوب وعن بعضهم أنه يقتل إذا كانت عادته ذلك وبه قال ابن الماجشون وقال ابن القاسم يضرب عنقه لأنه لا تعرف توبته وبه قال سحنون ومن قال بقتله فقد خالف الحديث وأقوال المتقدمين وقال الأوزاعي فإن كان كافرا يكون ناقضا للعهد وقال أصبغ الجاسوس الحربي يقتل والمسلم والذمي

জামিউল কুরআনে এসেছে

فإن كان الجاسوس كافرا فقال الأوزاعي : يكون نقضا لعهد. وقال أصبغ : الجاسوس الحربي يقتل ، والجاسوس المسلم والذمي يعاقبان إلا إن تظاهرا على الإسلام فيقتلان

উমদাতুল কারীতে এসেছে

وكذلك تقدم في كتاب الجهاد في: باب من لم يخمس الاسلاب أن معاذ بن عمر و هو الذي قطع رجل أبي جهل بن هشام وصرعه وقال وضرب ابنه عكرمة بن أبي جهل يد معاذ فطرحها ثم ضربه معوذ بن عفراء حتى أثبتته وتركه وبه رمق ثم وقف عليه عبد الله بن مسعود واحتز رأسه حين أمره رسول الله أن يلتصمه في القتلى

আদদুররুল মুখতারে এসেছে

(فرعان: الاول) لا بأس بحمل رأس المشرك لو فيه غيظهم وفيه فراغ قلبنا، وقد حمل ابن مسعود يوم بدر رأس أبي جهل وألقاها بين يديه عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، هذا فرعوني وفرعون أمتي، كان شره علي وعلى أمتي أعظم من شر فرعون على موسى وأمته ظهيرية.

في فتاوي كاملية

ومنهم من أجا للمسلمين و صار يقاتل العدو و معهم و هو مع ذلك يعين العدو و خيفية يعلمه بأحوال العساكر المسلمين و يطلعه علي عوراتهم و يتربص بهم الدوائر و اطلع لهم كتب كتبها في ذلك الوقت كثير من المشائخهم المعروفين بالاجواد الي أن قال : و حكم أولئك حكم الذنادقة ان اطلع عليهم قتلوا ان لامرهم الي الله (كتاب الجنائيات ٢٥١)

كذا في جامع القرآن

فان كان جاسوس كافرا فقال الاوزاعي يكون نقضا لعهد و قال اصبغ : الجاسوس الحربي يقتل و الجاسوس المسلم الذمي يعاقبان الا ان تظاهرا علي الاسلام فيقتلان . (سورة ممتحنة ، ص ٥٣ . ١٨)

গোয়েন্দাফোবিয়া বা গোয়েন্দাভীতি রোগ



গোয়েন্দা। স্পর্শকাতর শব্দ। কী যেন কী হয়। আতংক! ভয়। সন্দেহ। অবিশ্বাস। কাজে কর্মে অদৃশ্য চাপ। হার্টের স্পন্দন বৃদ্ধি পায়। সব মিলে অনেককে দেখা যায়, গোয়েন্দা ফোবিয়ায় ভোগে। গোয়েন্দাভীতি মানসিক রোগ হিসাবে দেখা দেয়। গোয়েন্দা যেন আজরাইল আ.। মূলত এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করাও গোয়েন্দাদের অন্যতম একটি কাজ। প্রতিপক্ষকে সজ্জন্ত্র রাখার জন্য নিজেদের সফলতার গান, শক্তি-দাপট ও প্রভাবের কথা একটু বাড়িয়েই বলে তারা। যার ফলে সাধারণ মানুষ আরেক রক্ত মাংসের মানুষকেই দেও মনে করতে থাকে। ফলে দেখা দেয় আতংক রোগ।

কুফুর ও তাগুতী শক্তিগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বদা একমত।

রাসূল সা. ইরশাদ করেন, **الكفر ملة واحدة** ইসলাম ও মুসলিমদের মন থেকে ইসলামী বসন্তের স্বপ্ন বা লালসা দূর করার জন্য সর্বদা নিজেদের কীর্তিকলাপ আপন গৃহপালিত মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করাতে থাকে। “প্রচারই শক্তি” এই নীতিতে সাধারণ মুসলিম তাগুতী শক্তির দাপট দেখে ইসলামকে সেকেলে মনে করতে শুরু করে। ইসলামী বিধি বিধানের উপর থেকে আস্থা উঠে যায়। নিজেকে হীন ও তুচ্ছ মনে করতে থাকে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার যথার্থ দায়িত্ব পালন করতে পিছিয়ে পড়ে। এগুলো সব ওদের প্রচারনার ফল। কাফির, মুশরিক, মুনাফিকদের চরিত্র চৌদ্দশ বছর আগ থেকে এমনই চলে আসছে যেমন আল্লাহ তায়াল! পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।-

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

অর্থঃ তাদের কাছে যখন কোন সংবাদ আসে, তা শান্তির হোক বা ভীতির, তারা তা (যাচাই না করেই) প্রচার শুরু করে দেয়। তারা যদি তা রাসূল বা যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের কাছে নিয়ে যেত, তবে তাদের মধ্যে যারা তার তথ্য অনুসন্ধানী তারা তার বাস্তবতা জেনে নিত। (সূরা নিসা-৮৩)

মুমিনের ভরসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তিনি ব্যতীত আর কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি মুমিনের অভিভাবক। ওরা যতই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আসুক না কেন মুমিন কারো চোখ রাঙ্গানির ভয় পায় না। ওদের স্বভাবই হল নানান-কিছুর ভয় দেখিয়ে মুমিনকে আপন কর্তব্য থেকে বিরত রাখা। কিন্তু মুমিন কখনও কোন অপশক্তিকে ভয় পায় না। কৌশল অবলম্বন করে আপন কর্তব্যে অতিবেশি তৎপর হয়ে উঠে। আল্লাহ তায়ালা ইমানের মাপকাঠি সাহাবাদের প্রশংসা করে বলেন,

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

অর্থঃ যাদেরকে লোকে বলেছিল, (মক্কার কাফির) লোকেরা তোমাদের (সাথে যুদ্ধ করার) জন্য (পুনরায়) একত্র হয়েছে, সুতরাং তাদেরকে ভয় করো। তখন এটা (এই সংবাদ) তাদের ঈমানের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং তারা বলে ওঠে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধারক।

(সূরা আলে ইমরান-১৭৩)

মুমিন ওদের গুজবে কান না দিয়ে আপন রবের ওয়াদার উপর পূর্ণ ইয়াকিন রাখে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

হে মুসলিমগণ! তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না। তোমরা প্রকৃত মুমিন হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।

(সূরা আলে-ইমরান-১৩৯)

শত্রু কখন কি দেখে ফেলে, কোথায় যেন ক্যামেরা স্থাপন করে রেখেছে, কাকে যেন এজেন্ট বানিয়ে গেছে। এই যে স্যাটেলাইট আমার ছবি তুলে নিল-কেউ যদি এই ভয়ে আপন কর্তব্য থেকে বিরত থাকে তবে তার জেনে রাখা দরকার, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা শক্তির কোন কুল কিনারা নেই। তার হুকুম পালন না করলে ক্যামেরা, স্যাটেলাইট ছাড়াই সবকর্ম চব্বিশ ঘণ্টা রেকর্ড হচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অর্থঃ মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে, যে (লেখার জন্য) সদা প্রস্তুত।

(সূরা ক্বাফ-১৮)

আরো এরশাদ করেন-

وَأَنْ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ (১০) كِرَامًا كَاتِبِينَ (১১) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (১২)

অর্থঃ অথচ তোমাদের জন্য কিছু তত্ত্বাবধায়ক (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে। যারা সম্মানিত লেখক। তোমরা যা কর তারা তা জানেন। (ইনফিতার-১০,১১,১২)

আরো এরশাদ করেন,

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ

অর্থঃ এবং (গোনাহ করার সময়) তোমরা তো তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের কান, চোখ ও চামড়ার সাক্ষদান থেকে আত্মগোপন করতে সক্ষম ছিলে না। বরং তোমাদের ধারণা ছিল আল্লাহ তোমাদের কর্মের বহু কিছুই জানেন না। (হামিম সিজদা-২২) আল্লাহ তায়ালা এসকল মাধ্যমেরও মুখাপেক্ষী নন। তিনি সব কিছু জানেন। এরশাদ হচ্ছে-

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

অর্থঃ গাছের একটি পাতাও তার জ্ঞানের বাইরে পড়েনা। (সূরা আনফাল-৫৯)
আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

অর্থঃ তিনি তো অন্তর্যামী (সূরা মুলক-১৩)

সুতরাং তার আদিষ্ট কাজ আঞ্জাম দেয়াই প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

মুমিন সাদাসিদে হয় ঠিকই, তবে চালাক হয়। মুমিন কখনও একগর্তে দু'বার দংশিত হয় না। রাসূল পাছাতাহার
আলাহিকি
উম্মাহাদান এরশাদ করেন-

لا يلدغ المؤمن في جحر واحد مرتين

অর্থঃ মুমিন একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না।

আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে আদেশ করেছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা (শত্রুর সাথে লড়াই কালে) নিজেদের আত্মরক্ষার উপকরণ সঙ্গে রাখ। অতঃপর পৃথক পৃথক বাহিনীরূপে (জিহাদের জন্য) বের হও কিংবা সকলে একই সঙ্গে বের হও। (নিসা-৭১)

মুমিনের ভয়ের কোন কারন নেই। কেননা সে এমন এক দলের সদস্য যার অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ

অর্থঃ আর এটা এই জন্য যে, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক আর কাফেরদের কোন অভিভাবক নেই। (সূরা মুহাম্মদ-১১)

এ দলে কখনো সংখ্যা-স্বল্পতা দেখা দেয় না কেননা আল্লাহর দলের সদস্যের কোন অভাব নেই- আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

অর্থঃ তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানে না।

(সূরা মুদাস্‌সির-৩১)

এদের কখনও রসদ ঘাটতি দেখা দেয় না। কেননা খাজানা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালায় হাতে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

অর্থঃ এবং এমন কোন (প্রয়োজনীয়) বস্তু নেই, যার ভাগুর আমার কাছে নেই, কিন্তু আমি তা অবতীর্ণ করি সুনির্দিষ্ট পরিমাণে।

(সূরা হিজর-২১)

এ দলের বাজেটের কোন সীমা নেই। আল্লাহ তায়ালায় ওয়াদার বলেই মুমিন সামনে অগ্রসর হয়। আর আল্লাহ কখনই ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ

অর্থঃ এটা আল্লাহর ওয়াদা, আল্লাহ কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

(সূরা জুমার-২০)

আল্লাহ তায়ালা মুমিনের জন্যই বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كَتَبَ اللَّهُ لِلَّهِ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

অর্থঃ আল্লাহ লিখে দিয়েছেন, আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই জয়যুক্ত হব। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ অতি শক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

(সূরা মুজাদালা-২১)

আল্লাহ তায়ালা আরো এরশাদ করেন,

أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থঃ তারা আল্লাহর দল। স্মরণ রেখ, আল্লাহর দলই কৃতকার্য হয়।

(সূরা মুজাদালা-২২)

অন্যত্র বলেন,

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থঃ আর মুমিনদেরকে সাহায্য করার দায়িত্ব আমি নিজের উপর রেখেছি।

(সূরা রুম-৪৭)

অন্যত্র বলেন,

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (১৭১) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ

(১৭২) وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْعَالِيُونَ (১৭৩)

অর্থঃ আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে পূর্বেই একথা স্থির করে রেখেছি- যে নিশ্চিতভাবেই তাদের সাহায্য করা হবে। সত্যি কথা হল, আমার বাহিনীই হবে জয়যুক্ত। (সূরা সফফাত-১৭১-১৭২-১৭৩)

অন্যত্র এরশাদ করেন-

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থঃ নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, আমি আমার রাসূলগণকে এবং মুমিনদেরকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করি এবং সেই দিনও যে দিন সাক্ষীগণ দাঁড়িয়ে যাবে।

(সূরা মুমিন-৫১)

মুমিনের কাজ শুধু রবের আদেশ পালন করা। সহজ হোক বা সষ্টকর হোক। সম্পদ, প্রাণ বিসর্জন দিয়েই হোক না কেন। তবেই আসবে সেই কাঙ্ক্ষিত বিজয়। নতুন সকাল। শান্তির পরিবেশ।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

অর্থঃ হে মুমিনগণ তোমরা যদি আল্লাহ (তায়ালায়র দ্বীন)-এর সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন।

(সূরা মুহাম্মদ-৭)

অন্যত্র এরশাদ করেন,

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

অর্থঃ আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তার (দ্বীনের) সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরক্রমশালী। (সূরা হজ্ব-৪০)

মুমিন শত্রুর প্রস্তুতির দিকে লক্ষ্য রেখে সাধ্যমত চেষ্টা করে-রবের উপর তাওয়াক্কুল করে কাজ করে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

অর্থঃ (হে মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-ছাউনি প্রস্তুত কর, যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও নিজেদের (বর্তমান) শত্রুদেরকে সন্ত্রস্ত করে রাখবে। (সূরা আনফালা-৬০)

অন্যত্র এরশাদ করেন,

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

অর্থঃ অতপর যখন তুমি কোন বিষয়ে মতস্থির করে সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করো। (আলে ইমরান-১৫৯)

রাসূল ^{পাশায্যাক্} ^{আলাহিকি} ^{ইমদাদ} এরশাদ করেন- اعقلها ثم توكل

প্রথমে উটের রশি বাধ। এরপর আল্লাহর উপর ভরসা কর।

মুমিন উম্মাহর প্রথমাংশের অনুসরণ করে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা, এরশাদ করেন,

ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : « مَنْ كَانَ مُسْتَتًّا ، فَلَيْسَتْ بِن قَد مَاتَ ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ ، أَوْلَتْكَ أَصْحَابُ مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّة : أَبْرَهَا قُلُوبًا ، وَأَعَمَّقَهَا عِلْمًا ، وَأَقْلَهَا تَكَلُّفًا ، اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لَصَحْبَةِ نَبِيِّهِ ، وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ ، فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ ، وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ ، وَتَعَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيرِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ » .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন- তোমাদের যে কেউ কোন পথ অবলম্বন করতে চায় সে যেন মৃত ব্যক্তিদের অনুসরণ করে। কেননা জীবিতদের উপর ফেৎনার আশংকামুক্ত থাকা যায় না। তারা হলেন, মুহাম্মাদ ^{পাশায্যাক্} ^{আলাহিকি} ^{ইমদাদ} এর সাহাবীগণ। তারা এ উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ, অন্তরের দিক দিয়ে সর্বাধিক পবিত্র, সুগভীর ইলমের অধিকারী, একেবারে লৌকিকতা মুক্ত। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তার নবীর সাহচর্যের জন্য নির্বাচন করেছেন। সুতরাং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব জান, তাদের পদাংক অনুসরণ কর, যথাসাধ্য তাদের চরিত্র ও জীবনাদর্শ আকড়ে ধর। কেননা তারা ছিলেন স্পষ্ট হেদায়েতের উপর। (জামিউল উসূল)

শত্রুদের নজরদারি এড়াতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব শেখানো সকাল-সন্ধ্যা দোয়া পাঠ করে।

মুমিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যেমন, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি নিজ দ্বীন থেকে ফিরে যায়, তবে আল্লাহ এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালবাসবে। তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে, মুমিনদের প্রতি

হবে সদয়। তারা আল্লাহর রাস্তায় কিতাল করবে, আর কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রশস্ততার অধিকারী সর্বজ্ঞানী। (সূরা মায়দা-৫৪)

মুমিনের লক্ষ্য

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

অর্থঃ তিনিই তো নিজ রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, তাকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য, তা মুশরিকদের জন্য যতই অপ্রীতিকর হোক। (সূরা সাফ্যাত-৯)

রাসূল ^{সাদাতাছ আল্লাহিহি ওহাসাদান} এরশাদ করেন-

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

যে আল্লাহর বাণী সমুচ্চ করার জন্য কিতাল করে সে আল্লাহর রাস্তায়।
হযরত রিবঈ রা. বলেন-

الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها،
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে তিনি চান তাকে বের করে আনার জন্য মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহ ইবাদাতের দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে, সকল ধর্মের জুলুম থেকে ইসলামের ইনসাফের দিকে। (বিদায়া-নিহায়া)

আল্লাহ তায়ালা আরো এরশাদ করেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

অর্থঃ (হে মুসলিমগণ) তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাক, যাবৎ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়।

(সূরা আনফাল-৩৯)

রাসূল ^{সাদাতাছ আল্লাহিহি ওহাসাদান} এরশাদ করেন,

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل

পৃথিবীতে তোমরা অপরিচিত অথবা মুসাফিরের ন্যায় বসবাস কর।

كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا

তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়োনা।

মুমিন সর্বাত্মক দায়িত্ব পালনে তৎপর হয়ে রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে-

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (১৭) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

অর্থঃ তারা রাতে কমই ঘুমাত এবং তারা সাহরীর সময় ইস্তিগফার করত।

(সূরা যারিয়াত-১৭-১৮)

মুমিনেরা দুনিয়ার রক্ষক হয় আখেরাতের ভোগ করতে চায়। মুমিনের পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দিবেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। (সূরা নূর-৫৫)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

অর্থঃ যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (সূরা ফাতহ-২৯)

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থঃ এটাই সেই জান্নাত তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মের বিনিময়ে। (যুখরুফ-৭২)

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম র. বলেন আফগান যুবকরা আমাদের শিখিয়েছে অনেক কিছু। তার মধ্যে অন্যতম হল গোয়েন্দাভীতি কিভাবে দূর করতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে কাজে লেগে থাকা সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়। অযথা বেকার বসে থাকলে শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। নবীজী এরশাদ করেন-

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم

অর্থঃ তোমরা জিহাদকে আকড়ে ধর, কেননা তা জান্নাতের দরজা সমূহ হতে একটি দরজা। আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা দুশ্চিন্তা ও ভয় দূর করেন। (মুসতাদরাকে হাকেম-২৪০৪)

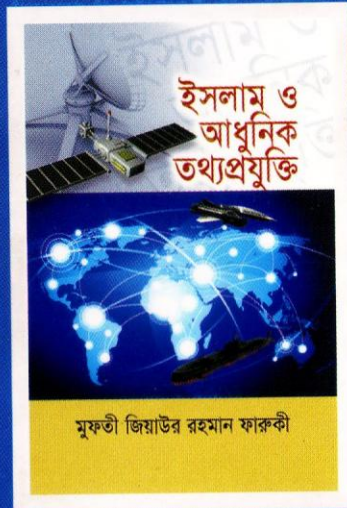
তথ্যপঞ্জী

আল-কুরআনুল কারীম
সহীহ বুখারী
সহীহ মুসলিম
জামে তিরমিজী
সুনানে আবু দাউদ
মাআরিফুল কুরআন (মুফতী শফী র.)
মাআরিফুল কুরআন (ইদরীস কান্ধলবী র.)
জামিউল কুরআন
আহকামুল কুরআন
বয়ানুল কুরআন
তাফসীরে মৌলবী দরয়াবাদী
উমদাতুল কারী
কাশফুল বারী
মুসনাদে আবী ইয়ালা
মুসনাদে আহমাদ
শামী
আল বাহরুর রায়েক
ফাতওয়ায়ে কামিলিয়া
মাজমুআতুল ফাতওয়া
আহসানুল ফাতওয়া
ফাতওয়ায়ে হক্কানীয়া
তারীখে তবারী
মুনাফিকিন কা কেরদার
তারীখে ইবনে কাসীর
তাবাকাতে ইবনে সা'দ
ফাজায়েলে জিহাদ
দাজ্জাল কে, কখন ও কোথায় আসবে
বারমুডা ট্রায়ঙ্গল ও দাজ্জাল
দায়েরা মাআরেফে ইসলামিয়া
আল মুজহির

আল-মাওরিদুল ওয়াসী
মুজামু লুগাতিল ফুকাহা
ফিরোজুল লুগাত
আল-কামুসুল জাদীদ
জাসুস কেইসে বনতে হে
খফিয়্যা এজেসু কি খফিয়্যা জংগে
হাসসাস এদারে
খফিয়্যা এজেসু কি দেহাশত গারদে
'র'
এফ. বি. আই
ব্লাক ওয়াটার
সি আই. এ
সাপ্তাহি এশিয়া
দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্ত
ফ্রাইডে স্পেশাল
মাসিক জিয়ায়ে আফাক
দৈনিক নেদায়ে মিল্লাত
দৈনিক ডন
লস এঞ্জেলস টাইমস
নিউইয়র্ক টাইমস
দি ন্যাশন
এছাড়া বিভিন্ন ওয়েবসাইট, বয়ান, দৈনিক পত্রিকা, টেলিভিশন ও রেডিও
চ্যানেলের সাক্ষাৎকারের থেকে চয়নকৃত বিষয়াদি

বইটিতে যা পাবেন

সর্বশেষ তথ্য
পর্দার আড়ালে কারা
সচেতনতার খোরাক
আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক চিন্তা
বিশ্বাস, শক্তি ও প্রতিষ্ঠার উপাদান



design : print media
shawon tower 6th fl., 2/c purana paltan, dhaka
01712523497, 01711958389